মরণজয়ী
মুজাহিদ
আফগান
জিহাদ ভিত্তিক
একমাত্র
উপন্যাস
মল্লিক আহমাদ সরওয়ার

মরণজয়ী মুজাহিদ

উৎসর্গ

ইতিহাসের অহংকার, শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সন্তান, যাঁরা আমাদের রাহবার আমরা যাঁদের উত্তরসূরী, আফগান জিহাদে শাহাদাত বরণকারী সেই বাংলাদেশী আটাশজন মর্দে মুজাহিদের রক্তাক্ত স্মৃতির স্মরণে।

–অভিন্ন পথের যাত্রী

মরণজয়ী মুজাহিদ

মল্লিক আহমাদ সরওয়ার

অনুবাদ

শহীদুল ইসলাম

ও

শহীদ মনজুর হাসান (রাহঃ)

সম্পাদনা

মনযূর আহমাদ

দু'টি কথা

১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। হঠাৎ করে খবর হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছে। অধিকাংশ পাকিস্তানী সাধারণ মানুষের মতো আমিও ঘটনাটি প্রচার মাধ্যমের অতিরঞ্জন বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই যখন খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম, তখন মনে হলো, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করে জন্মভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা আফগানদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। ফিলিস্তিনীদের দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধ আমার মনে হতাশার মনোভাবই বেশী প্রবল করেছিল।

১৯৮২ সালে ডঃ আবেদ শরীফ আমাকে আফগানিস্তান নিয়ে গেলেন। রণাঙ্গনে দু' সপ্তাহ মুজাহিদদের সঙ্গে থেকে আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম তাঁদের যুদ্ধকৌশল, জীবনাচার। তখন আমার ধারণা বদলে গেলো। মনে হলো, এরা সাধারণ যোদ্ধাদের থেকে ভিন্ন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এক পরজাগতিক চেতনায় উজ্জীবিত। আফগান মুজাহিদদের দেখে আমার মনে ভেসে উঠলো, খালেদ বিন ওয়ালিদ, তারেক বিন যিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, মাহমুদ গজনবী, শিহাবুদ্দীন ঘোরী প্রমুখ বীর মুজাহিদদের কথা, মুসলিম সেনাপতিদের জিহাদের কথা।

অত্যাধুনিক সামরিক শক্তিতে বলীয়ান রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় আফগান মুজাহিদরা যেভাবে জীবন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে এক বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য দৃশ্য ; নিজ চোখে না দেখলে আমি তা কখনও বিশ্বাস করতে পারতাম না।

এরপর আমি বহুবার আফগান রণাঙ্গনে গিয়েছি। মুজাহিদদের সাথে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি বহু জিহাদী তৎপরতা। শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কমান্ডারের সাথে কথা বলেছি, মুজাহিদদের কাছে শুনেছি জিহাদের নানা প্রসঙ্গ। ছোট, মাঝারী পর্যায়ের তরুণ কমান্ডারদের সাথে মত বিনিময় করেছি, তারাও মন উজাড় করে আমাকে সংঘটিত নানা ঘটনার ইতিবৃত্ত জানিয়েছেন।

১৯৮৬ সালে আমার ঘনিষ্ট বন্ধু, কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজের ছাত্র শহীদ যুবায়ের খান বাবর 'পয়গাম ডাইজেস্ট-এ আফগান জিহাদের উপর কিছু উপাখ্যান লিখবার জন্যে অনুরোধ করেন। তখন যুবায়ের ছিলেন পয়গাম ডাইজেস্ট-এর সম্পাদক। তাঁর পীড়াপীড়িতে আমি একটি নাতিদীর্ঘ উপাখ্যান লিখে পাঠালাম। নাম দিলাম "রহস্যময় বিস্ফোরণ"। আফগান মুজাহিদদের বৈচিত্র্যময় হাজারো ঘটনার বাস্তব বিবরণ আমার সংগ্রহে ছিল এবং মুজাহিদদের ঘটনাবলী সংগ্রহ করা আমার এক ধরনের নেশায় পরিণত হয়েছিল।

"রহস্যময় বিস্ফোরণ" কাহিনীটি পাঠক মহলে খুবই সমাদৃত হয়। তখন বন্ধুরা আমাকে আফগান জিহাদের উপর ভিত্তি করে বাস্তবধর্মী উপন্যাস লিখার জন্যে জোর তাগাদা দিতে থাকেন। বন্ধুদের উৎসাহে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে আনুপূর্বিক ঘটনাবলীর সংকলন গ্রন্থিত করে "পাহাড় কা বেটা" নামের উপন্যাসটি তৈরী করি। উর্দূ ভাষার একাধিক পত্র-পত্রিকায় একই সাথে এটি প্রকাশিত হতে থাকে। সাথে সাথে আরবীতে অনূদিত হয়েও একটি আরবী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত উপন্যাসেরই এটি গ্রন্থিত রূপ। বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আমি জিহাদের পবিত্র চেতনা ও মুজাহিদদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করেছি। এ ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠক-পাঠিকা মহলে আদৃত হলে অধমের হিদায়েত ও মুজাহিদদের সফলতার জন্যে দু'আ কামনা করি।

পরিশেষে যে সকল বন্ধু-হিতাকাঙ্খী এ উপন্যাস রচনায় আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে মুজাহিদ কমান্ডার ওলী খানের শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আফগান জিহাদ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী তথ্য দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

মল্লিক আহমাদ সরওয়ার
লাহোর

প্রাসঙ্গিক অভিব্যক্তি

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বদরের প্রান্তরে মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে তরবারি কোষমুক্ত করেছিলেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি সেই তরবারী কোষবদ্ধ করে যাননি। নবীজির অন্তিম সময়ের সংবাদ শুনে যে কাফেলাটি যাত্রাবিরতি করেছিলো, প্রাণপ্রিয় প্রেমাস্পদকে মদীনায় শায়িত করে রেখেই আবার তারা যাত্রা শুরু করলেন জিহাদের রক্তরাঙা পথে। সেই যাত্রা এখনো চলছে, কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। চিরকাল নবীজির অসিয়তকে একদল মুজাহিদ জীবন দিয়ে পালন করে যাবে। নবীউস সাইফের পদচুম্বনকারী উম্মত জিহাদের ময়দানেই সেই অসিয়ত পালন করবে।

পাঠক, আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করুন, দেখতে পাবেন সেইসব মরণজয়ী মুজাহিদের তাজা রক্তে আজকের পৃথিবীও রক্তাক্ত হয়ে আছে। অর্ধ শতাব্দী ধরে কাশ্মিরে রক্ত ঝরছে। সিকি শতাব্দী পর্যন্ত মিন্দানাওয়ে লক্ষ প্রাণের জীবন-প্রদীপ নিভেছে। যুগ যুগ ধরে আরাকানের পর্বত বেয়ে যে স্বচ্ছ বৃষ্টির ধারা নামছে, তা নাফ নদীতে প্রবাহিত হবার আগে লোহিত বর্ণ ধারণ করছে। পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরে চেসনিয়ার বুকে যে দানবের বসতি ছিলো, সে এখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। তবে শেষবারের মতো যে মরণ-কামড় দিয়েছে তাতে রক্তের প্লাবন বয়েছে দিনের পর দিন। আফগানিস্তানের কঠিন পাথরের পর্বতমালা ও চৌচির হয়ে যাওয়া জমীন উনিশ বছর ধরে মুজাহিদদের রক্তে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

জাগো মুজাহিদের পথিক স্বীয় প্রভূর দ্বীনের পতাকা মাথার উপর ধারণ করে পথ চলে। আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীনকে গালিব করতে তারা মারে ও মরে। কেননা এটিই তাদের প্রভূর সন্তুষ্টি অর্জনের অকপট কর্মপন্থা। জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স মাঝে মাঝে আপনাদের খেদমতে যা কিছু পেশ করে, তার বিনিময় তারা দয়াময় প্রভূর কাছেই কামনা করে; আপনাদের কাছে যা তারা কামনা করে, তা শুধু আপনাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও একনিষ্ঠ সহযোগিতা।

বিশ্বজুড়ে জালিমের অত্যাচার ও মুজাহিদদের প্রতিরোধের সংবাদ যাঁদেরকে অস্থির করে তুলে, 'মরণজয়ী মুজাহিদ' বইটির কাহিনী তাঁদের অন্তরকে ছুঁয়ে যাবে। আল্লাহ্র যে একনিষ্ঠ বান্দা জিহাদের পথে পথিক হবার বাসনা রাখেন, 'মরণজয়ী মুজাহিদে'র কাহিনী তাঁকে আবেগাপ্লুত করবে। জালিমের কৃপাণের নীচে যাদের বসতি, বারুদের গন্ধ যেখানে নিশ্বাসকে বন্ধ করে দেয়, সেইসব জনপদের করুণ কাহিনী ঈমানদীপ্ত অন্তরকেই কেবল আকর্ষণ করে। আফগানিস্তানের পোড়খাওয়া মানুষের হৃদয়-নিংড়ানো এই উপাখ্যান পাঠক-হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করবে। 'মরণজয়ী মুজাহিদ' পাঠককে এক আপন ভূবনে নিয়ে যাবে, যে ভূবনের বাসিন্দা হতে পাঠকের আগ্রহ হবে।

কিউ, জেড, লস্কর
সেক্রেটারী জেনারেল
জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

বিনীত নিবেদন

মরণজয়ী মুজাহিদ। একখানা উপন্যাস। তবে অন্যসব উপন্যাসের মত এর কাহিনী উপান্ত কাল্পনিক নয়। এর ভিত্তি ও পটভূমি আফগান জিহাদ। সস্তা যৌন সুড়সুড়ি এতে নেই, নেই উৎকট প্রেম প্রগলভতা। আছে ঘুমন্ত মুমিনের প্রতি মুজাহিদের ঈমান জাগানিয়া আহবান। সহস্রাধিক মুজাহিদ কমান্ডারের খন্ডিত সাক্ষাতকারসমূহ তাসবীহমালার মত একসূত্রে গাঁথা হয়েছে এ উপন্যাসে। আফগান জিহাদের নান্দনিক চিত্রও বলা চলে একে। যা ঘটেছে , তা রূপ-রসে সুরভিত করে উপন্যাসের আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এর মূল রচয়িতা নামাজাদা ঔপন্যাসিক না হলেও তিনি যে শক্ত কলমের চালক, তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু উর্দূ থেকে বাংলায় যাঁরা এর অনুবাদ করেছেন, তাঁরা লেখা-লেখকের জগতে একেবারেই নবীন। যাঁরা সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন, তারাও প্রবীণ বা শত পরীক্ষায় পোড়খাওয়া নিখাঁদ কেউ নন। আমরা সকলেই অভিজ্ঞতায় অপরিপক্ক। তবুও বইটি প্রকাশ করতে হলো। জাগো মুজাহিদ পাঠকের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম, উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে তাদের হাতে তুলে দিব। ভেবেছিলাম, অল্প সময়ে কাজটি শেষ করা যাবে। উদ্যোগ, উপকরণ ও সীমিত জনশক্তির ফলে তা হলো না। তবে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা ও সৎ সাহস আমাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

বহু সমস্যা, অসৌন্দর্য, অসংলগ্নতা ও ভুল বইটিতে রয়ে গেছে। চেষ্টা করা সত্ত্বেও বইটি সর্বসুন্দর করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে বর্তমান দুর্বলতাগুলো দূর করার ইচ্ছা আছে। তাই সকল পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা ও সুপরামর্শ কাম্য। এ বইটিতে যা সুন্দর, প্রত্যেক পাঠক তার অংশীদার, যা অসুন্দর তার দায়ভার আমরা কাঁধে তুলে নিলাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

মনযূর আহ্‌মাদ
সম্পাদনা সচিব
জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

সবুজ-শ্যামলে ঢাকা ছোট্ট একটি পাহাড়। তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ঘন গাছ-গাছালীর সবুজ চাদরঢাকা আকাশচুম্বি পর্বতমালা। এর এক প্রান্তে জীর্ণ-শীর্ণ একটি বস্তি। বস্তির উত্তর পার্শ্ব দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণা কুল কুল রবে বয়ে চলেছে অবিরাম। ছোট্ট পাহাড়টির সম্মুখ ভাগে বিশাল স্থান জুড়ে গাছ-গাছালিতে ভরা জঙ্গল। তার পার্শ্বেই বিরাট চারণভূমি। দূর থেকে দেখলে ছোট্ট পাহাড়টিকে অন্যান্য পাহাড় থেকে আলাদা মনে হয় না। পাহাড়ের মাঝে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন উর্বর যমীন। এতে বস্তিবাসীরা ফল-মূলসহ মৌসুমী ফসল আবাদ করে। পাহাড়টির পিছনের অংশে ফেলা হয়েছে বহু তাবু এবং মাটি খুঁড়ে তৈরী করা হয়েছে বহু পরিখা। এক পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে স্থাপন করা হয়েছে একটি বিমান-বিধ্বংসী কামান। আফগানীদের ভাষায় এটিকে দাসাক্কা বলা হয়। এটি পরিচালনার দায়িত্ব টগবগে যৌবনদীপ্ত এক যুবকের ওপর ন্যস্ত। তার নাম আলী খান। বয়স তের কি চৌদ্দ বছরের বেশী নয়। বয়স কম হলেও শরীরের একহারা গড়ন ও বাঁধন দেখে তাকে একজন শক্তিশালী বাহাদুর মুজাহিদের মতই মনে হয়। এই তো এক মাস পূর্বেও সে দুশমনের একটি বিমান ভূপাতিত করেছে। আলী দাসাক্কা ছাড়া রকেট লাঞ্চারও চালাতে বেশ দক্ষ।

আজ থেকে কয়েক বছর আগের কথা। তখন তার প্রিয় মাতৃভূমি ছিলো স্বাধীন। আব্বা-আম্মা ও আদরের ছোট বোন সায়মাসহ সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরপুর ছিলো তাদের ছোট সংসার। তাদের সুন্দর সাজানো বাড়ীটির সামনে ছিল বিরাট এক ময়দান। লম্বা লম্বা চেলগুজা বৃক্ষবেষ্টিত চত্বরটির দু'পাশে ছিল সারি সারি আংগুর ও আনার গাছ। গ্রামের অদূরে পাহাড়ের পাদদেশে তাদের চারণভূমি। এর নিকট থেকে প্রবাহিত ছিলো একটি পাহাড়ী ঝর্ণাধারা। চারণভূমির কিছু অংশে ছিলো আনার ও শাহতুতের গাছ। বাকী অংশে আলীর আব্বা গম,ভুট্টা ইত্যাদির চাষ করতেন। প্রবাহিত ঝর্ণাটির স্বচ্ছ-সুন্দর পানি ওই বাগানে তার আব্বা সেচ করতেন।

আলী তখন স্কুলে পড়ে। স্কুল থেকে ফিরে প্রায়ই আবাদী জমিতে পিতার সাথে কাজ করত। গরমের মৌসুমে সে শাহতুত বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসে স্কুলের ছবক ইয়াদ করত মনের আনন্দে। কোন বন্ধু আসলে গাছ থেকে আনার ও শাহতুত পেড়ে স্বহাস্য বদনে তার হাতে তুলে দিত। সে এর চেয়েও আনন্দ পেত গরমের মৌসুমে পাহাড়ের নালাগুলো পানিতে ভরে গেলে তাতে নেমে বন্ধুদেরকে নিয়ে খেলায় মত্ত হওয়ায়।

সায়মা পরিবারের সবার ছোট। তাই সে ছিলো সকলের নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তার নানা রকম দুষ্টুমি সকলে উপভোগ করত।

আলীর একমাত্র ফুফুর বাড়ীটি তাদের গ্রাম থেকে বেশ দূরে। একদিন খুব সকালে ফুফু হাঁফাতে হাঁফাতে তাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। ফুফুর এমন অবস্থা দেখে সবাই হতবাক। ফুফুর সাথে এসেছে তার সাত বছরের ছেলে খলীল। তাদের সাথে রয়েছে নাদুসনুদুস একটি বকরী ও বকরীর বাচ্চা। ফুফু আলীর আব্বাকে দেখে বিলাপ করে করুণভাবে কাঁদতে থাকে। আলীর আব্বা অনেক কষ্টে বোনের কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বোন, কি হয়েছে তোমার? তোমার গায়ে কেউ হাত তুলেছে? বলো, খলীলের আব্বা তোমাকে অপমান করেছে, সে তোমাকে মেরেছে, তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে? বল, কেন কাঁদছো তুমি?'

ফুফু জবাবে বলল, 'না ভাইজান, খলীলের আব্বা আমাকে মারেনি, ঘর থেকে বের করেও দেয়নি। অত্যাচারী রুশ সৈন্যদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণায় আমি কাঁদছি। ওরা আমার সবকিছু লুটে নিয়েছে।'

এ কথাগুলো বলতে তার কণ্ঠ বারবার কেঁপে কেঁপে রুদ্ধ হয়ে আসছিলো। ফুফু পুনরায় ফুফিয়ে কাঁদতে থাকে।

আলীর আব্বা জানতেন, আফগানিস্তানে জালিম রুশদের অনুপ্রবেশের পর নিরীহ আফগান মুসলমানরা পাইকারীভাবে তাদের বর্বরতা, অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দেশ ও জনগণের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে গ্রামেই তাদের অপবিত্র অনুপ্রবেশ ঘটছে, সে গ্রামের পুরুষ-মহিলা-বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে, গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে মসজিদগুলোকে। তাদের প্রজ্বলিত অগ্নিতে ভষ্মিভূত হচ্ছে বসতির পর বসতি।

কান্না বিজড়িত কন্ঠে আলীর ফুফু বললেন, 'গত সপ্তায় রুশীরা আমাদের গ্রামে হামলা করে। প্রথমে তারা বহু ট্যাংক এবং গাড়ী নিয়ে আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলে। প্রতিটি ঘরে তারা তল্লাশী চালায়। রাইফেল হাতে একদল রুশী ফৌজ আমাদের ঘরে এসে জিনিসপত্র হাতিয়ে নেয়। এক নরপিশাচ এগিয়ে আসে আমার গলার চাঁদীর হারটি খোলার জন্যে। আমি তাকে জোরে ধাক্কা দিলে সে পিছনের দেয়ালের সাথে আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আঘাত সামলে সে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো। খলীলের আব্বা ছুটে এসে জালিমের হাত থেকে ক্লাসিনকোভটি ছিনিয়ে নিয়ে তার বুকের ওপর গুলি চালান। জালিম তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এর মধ্যে অন্যান্য ফৌজ এসে এই অবস্থা দেখে ব্রাশ ফায়ার করে খলীলের আব্বার শরীর ঝাঁঝরা করে দেয়। খলিলের বড় ভাইকেও ওরা মেরে ফেলেছে। আমি অত্যন্ত কষ্টে ঐ নরপশুদের হাত থেকে বেঁচে এসেছি। তাদের ক্লাসিনকোভের গুলি কয়েকবার আমার কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে চলে গেছে, কিন্তু যিন্দেগীর আখেরী লম্‌হা এখনো আসেনি বলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বেঁচে গেছি। শত মসিবতের মধ্য দিয়ে কঠিন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এ পর্যন্ত

এসে পৌঁছেছি। যদি দুধাল এ বকরীটি আমাদের সঙ্গী না হত তাহলে হয়তো পথেই আমাদের উভয়কে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হতো। আমরা চলে আসতে থাকলে গোলাগুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে বকরীটি আমাদের পিছু নেয়। পথে পথে এর দুধ পান করে আমরা এ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম।

খলীলের আম্মার মুখে এ হৃদয়হীন অত্যাচারের কাহিনী শুনে সবাই দারুণভাবে ব্যথিত হয়। সকলের চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয় ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

আলীর আব্বা বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, বাহাদুর বোন আমার! সবর করো, এই দেশে আজ ক'জন মহিলা আছে, যাদের স্বামী ও সন্তানদেরকে ওরা শহীদ করেনি? গোটা আফগান আজ কাঁদছে।

এ জালিম রুশীরা শুধু আফগানেই নয়, রাশিয়ায়ও তারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছিলো। মসজিদগুলোকে ওরা মদ্যপানের আড্ডা আর নাচঘরে পরিণত করেছে। ভষ্ম করেছে ওরা পবিত্র কুরআন আর ধর্মীয় সব কিতাব। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছে ওরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে।

দিন দিন রুশী ফৌজদের জুলুম-নির্যাতন বেড়েই চলেছে। তবে আলীদের গ্রামে ওদের দাজ্জালী অনুপ্রবেশ এখনো ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী গ্রামে রুশীদের অত্যাচারের কথা সকলের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে।

আলীর আব্বা তার বোনের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত।

আলীর ছোট্ট বোন সায়মা এ সবের কিছুই বুঝে না। সমবয়সীদের নিয়ে সে সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে।

এখন খলীলও সায়মার খেলার সাথী হয়েছে। ওরা দু'জন বকরী ও বকরীর বাচ্চাটি নিয়ে পাহাড়ের উপর চরাতে যায়, ছুটোছুটি করে। এভাবে ক'দিনেই ওরা একে অপরের আপন হয়ে গেছে। কখনো বাগানে লুকোচুরি খেলে আবার কখনো পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে পাথর সাজিয়ে খেলার ঘর তৈরী করে। পরস্পরে ঝগড়া হয়, কিন্তু অল্পক্ষণে মিটমাট করে সব ভুলে খেলায় মনযোগ দেয়।

তাদের এমন পেয়ারী পেয়ারী দুষ্টুমী দেখে বাড়ীর সবাই সীমাহীন আনন্দ উপভোগ করে। এই কারণে এবং সময়ের ব্যবধানে খলীলের আম্মা নিজের শোক হয়রানীও অনেকটা ভুলে গিয়েছে, তবুও প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর নিজের দেশের আযাদীর জন্য দু'আ করতে সে কখনো ভুলে না।

একদিন সায়মা ও খলীল কাঁদতে কাঁদতে ঘরে আসে। হাতে তাদের বকরীর বাচ্চাটি। বাচ্চাটির সমস্ত গা রক্তে ভেজা। সে রক্তে লাল হয়ে গেছে খলীল ও সায়মার গায়ের জামা। বুঝা যাচ্ছে, বকরীর বাচ্চাটি আর বেঁচে নেই। বাচ্চাটির নাড়িভূড়ি বেরিয়ে গেছে। বকরীটিও পিছনে পিছনে চীৎকার করে ছুটে আসছে। বকরীটি ফ্যালফ্যাল চোখে সেদিকে তাকাচ্ছিল, জিভ বের করে মুখ চাটছিলো আর তার মৃত অসাড় বাচ্চাটি দেখছিলো। মনে হয় যেন বকরীটির দু'চোখে প্রচুর অশ্রু এসে জমেছে। বেদনার অশ্রু

দু'চোখ উছলে পড়ছে। এই অবোধ প্রাণীটির কথা বলার তাকৎ থাকলে অবশ্যই এখন সে চীৎকার করে বলতো, "আমার প্রিয় সাবকটিকে কে কতল করেছে? কী কসুর ছিল তার? কোন অপরাধে ওর শরীর রক্তাক্ত করা হলো?

বকরীটি তার স্বভাবসুলভ মায়াবী চোখে কখনো অতি পরিচিত সায়মা আবার কখনো খলীলের দিকে চাইছে। আর যেন বলছে, 'তোমরা আমার বাচ্চাটিকে ভীষণ আদর করতে আর সর্বক্ষণ ওকে নিয়ে খেলতে, তোমাদের উপস্থিতিতে আমার এতবড় সর্বনাশটা কেন হতে দিলে? তোমরা ওর ব্যাপারে বে-খেয়াল ছিলে, তোমরা অপরাধী নও কি?'

এদিকে সায়মা এবং খলীলও কাঁদছে, ওরা সত্যিই বাচ্চাটিকে খুব আদর করত। এই সাবকটি ছিলো ওদের খেলার অকৃত্রিম সঙ্গী।

খলীলের আম্মা খলীলের কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা, বাচ্চাটিকে কে কতল করেছে, চিনো তাকে?

খলীল কিছু বলার আগে সায়মা বল্ল, ঃ ফুফীজান, বাচ্চাটি আমাদের অদূরেই ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছিলো। আমি আর খলীল ভাইয়া খেলা করছিলাম। হঠাৎ বিকট এক আওয়াজ শুনে আমরা ভয় পেয়ে যাই। তখন বকরীটি দৌঁড়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ায়। আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে তখন ধূলো-বালি উড়ছে। এর রহস্য কি তা দেখতে আমরা সেই স্থানে যেয়ে দেখি, বকরীর বাচ্চাটি খুনের মধ্যে ছটফট করছে। কাউকে দেখলাম না, কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না যে, কে মারল এই সাবকটিকে। কোনো মানুষ আমাদের নজরে পড়েনি।

এবার সকলে পেরেশান হলো এই ভেবে যে, তবে কে কতল করলো, কোন কারণে বাচ্চাটি মেরে ফেল্লো!

গর্ত করে বাচ্চাটিকে মাটি চাপা দেয়ার সময় ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলো সায়মা। ওর আব্বা কান্না থামাতে চাইলে ধরা গলায় ও বলে, আমি এখন কাকে নিয়ে খেলা করবো আব্বু!

তার আব্বু তাকে প্রবোধ দিয়ে বল্লেন, কেঁদো না মা, এভাবে কাঁদতে হয় না, বাজার থেকে একটি খুবসূরত বকরীর বাচ্চা তোমাকে কিনে দেবো।

খলীল পাশেই দাঁড়ানো ছিলো, সে বললো, মামিজান, বড় বকরীটি বাচ্চা ছাড়া কি ভাবে একা একা থাকবে? ওর কষ্টের কথা কে বুঝবে? কাকে বলবে সে মনের কষ্ট ও ব্যথার কথা?

খলীলের কথা শুনে সায়মার আম্মার চোখেও অশ্রু আসে। সন্তান হারাবার যন্ত্রণার তীব্র অনুভূতি তার দু'চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরাচ্ছে।

আলী পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনছিলো এবং অবলোকন করছিলো। আলীকে দেখে বুঝা যায়, গভীরভাবে সে কি যেন ভাবছে। আলী প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হলেও বিচক্ষণ ও

মেধাবী। সে এই ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না যে, এই বিস্ফোরণটি কোত্থেকে কিভাবে হলো। রুশী ফৌজরা তো এখনো এদিকে আসেনি এবং আকাশে তাদের কোন বিমানও উড়তে দেখা যায়নি। আলী তার আব্বাকেও এ ব্যাপারে বহু প্রশ্ন করেছে। কিন্তু কোন সমাধান তার আব্বাও দিতে পারেননি। কেউ বিষয়টা আবিষ্কার করতে পারছে না।

সকলে ঘরেই বসা। হঠাৎ রাস্তার দিকে লোকজনের শোরগোল শুনে আলীর আব্বা বাইরে বেরিয়ে দেখেন, একজন আহত যুবককে লোকেরা হাতে হাতে ধরে বাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যুবকটির হাত ও মাথা থেকে অজস্র খুন ঝরছে। আলী ও তার আব্বা আহত যুবকটির বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো—কি ঘটেছে তা জানার জন্যে।

কিছুক্ষণ পর যুবকটির হুঁশ ফিরে আসলে সে জানালো , ক্ষেত থেকে বস্তিতে ফেরার পথে রাস্তার উপর একটি সুন্দর ঘড়ি চোখে পড়ে। নীচু হয়ে ঘড়িটি তুলতেই বিকট শব্দে তা বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাই।

আলী দেখলো, যুবকটির তিনটি আঙ্গুলই উড়ে গেছে। কিন্তু কারো মাথায় ঢুকছিলো না যে, ঘড়ির সঙ্গে বিস্ফোরণের সম্পর্কটা কী!

উপস্থিত সকলে যুবককে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকলে গোবেচারা অনুযোগের সুরে বলে, আমি তো ঘড়িটি হাতে তুলেছিলাম মাত্র।

সামান্য একটি ঘড়ি বিস্ফোরিত হয়ে তার হাতের আঙ্গুল উড়িয়ে নিয়েছে এবং তাকে কিভাবে মারাত্মক রকম যখম করেছে, তা কেউ বিশ্বাসই করতে পারছে না। এক বৃদ্ধ বললেন, ঘড়ি হাতে নিলে বিস্ফোরণ ঘটে এমন কথা তো কখনো শুনিনি। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, সে কারও সাথে অবশ্যই মারামারি করেছে।

আরেকজন এক ধাপ এগিয়ে বললো, যদি ঘড়ি হাতে তুললে তা বিস্ফোরিত হয়, তাহলে ভদ্র লোকেরা তা পরে কেন?

এমনিভাবে নানাজন নানা রকম মন্তব্য করে।

আস্তে আস্তে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে সবাই পা বাড়ায়।

আলীও তার আব্বার সাথে বাড়ী ফিরে আসে।

আলী বিষন্ন, চিন্তিত ।

সে তার আব্বাকে বললো, আব্বু, নিশ্চয় এর ভিতর কোন রহস্য লুকায়িত আছে। কেননা, এ ব্যক্তি যে ধরনের বিস্ফোরণে যখমী হয়েছে, আমাদের বকরীর বাচ্চাটিরও একই ধরনের বিস্ফোরণের কবলে মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং এ বিস্ফোরণ কিভাবে কোত্থেকে হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা করে তার সূত্র খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন।

একথা শুনে আলীর আব্বা তাকে বললেন, বেটা, যে কথা বড়দেরই বুঝে আসছে না তা নিয়ে তোমার চিন্তা করে লাভ কি?

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলী ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করেছে, কিন্তু কোন কিনারা না পেয়ে এক সময় গভীর নিন্দ্রার কোলে ঢলে পড়ে।

সায়মা ও খলীল বকরীর বাচ্চাটি মরে যাওয়ায় ভীষণ কষ্ট পায়। যার কারণে ওরা রাতের খানাও খেল না। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে মায়ের নিকট বকরীর বাচ্চাটির কথা আলোচনা করতে করতে এক সময় ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম থেকে উঠে সায়মার আম্মা দেখলেন, বকরীটিও রাতে কিছু খায়নি। খাওয়ার জন্য ঘাস পানি যা দেয়া হয়েছিলো পুরোটাই রয়ে গেছে।

পরের দিন আলী তাদের যমীন পার হয়ে পাহাড়ের ওপর উঠলে আচানক দেখতে পায়, অদূরেই একটি মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। নিকটে যেয়ে দেখে, এ যে তার দোস্ত আহমাদ গুল! বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে আছে আহমাদ গুল। তার আহত বাহু বেয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে। তার সম্পূর্ণ হাতটাই কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। আলী তাকে তুলে তাদের বাগানের মধ্যে নিয়ে আসলো। ইতিমধ্যে আলীর পিতাও সেখানে এসে উপস্থিত হন। আলী পিতাকে সব ঘটনা খুলে বলে। বাপ-বেটার সেবা-শুশ্রূষা ও চেষ্টা-তদবীরে এক সময় হুঁশ ফিরে আসে আহমাদ গুলের। সে তাদেরকে বলে, 'পাহাড়ের ওপর বেড়াতে আসলে এক জায়গায় সে একটি সুন্দর কলম দেখতে পায়। চমৎকার দর্শনীয় কলমটি সে হাতে তুলে নেয়। সাথে সাথে সেটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এতটুকু মনে আছে। এরপর কি হয়েছে তা' জানি না।'

সেদিন দুপুর বেলা সায়মা ও খলীল ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ওপর খেলা করার জন্য এসে দাঁড়ায়, যেখানে বকরীর বাচ্চাটির মৃত্যু ঘটেছিলো। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে খেলার ছলে ছুটাছুটি করছিলো। এ সময় সায়মা অদূরেই একটি সুন্দর বস্তু দেখতে পেয়ে দৌঁড়ে সেদিকে যায়। বস্তুটি ছিলো সুন্দর একটি ঘড়ি। সায়মা খলীলকে বলে দৌঁড়ে ঘড়িটির কাছে যেয়ে হাতে তুলতেই সেটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। সাথে সাথে সায়মা হুঁশ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অবস্থা দেখে খলীল ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায় এবং চীৎকার করতে করতে দৌড়ে বাড়ী চলে আসে।

সায়মার আব্বা পাহাড়ের ওপর উঠে যা' দেখলেন, তা' ছিলো খুবই মর্মান্তিক। সায়মার একটি বাহু সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে টুকরো টুকরো অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। ঘাড় ও মুখাবয়বও তার জখম হয়েছে। যখম থেকে অজস্র রক্ত ঝরছে। সায়মার আব্বা তাকে পাজাকোলা করে বাড়ী নিয়ে আসলে এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে যায়।

দু'দিন পরে আলী ও তার আব্বা আহত সায়মাকে নিয়ে বরফবেষ্টিত পাহাড় এবং ঘন বন-জঙ্গল অতিক্রম করে রুশী ফৌজদের থেকে গা বাঁচিয়ে মুজাহিদদের এক ঘাঁটিতে এসে পৌঁছে। মুজাহিদরা গাড়ীতে করে তৎক্ষণাৎ সায়মাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ডাক্তার সায়মাকে পরীক্ষা করে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, বাচ্চাটিকে তাৎক্ষণিক-ভাবে পৌঁছালে বাঁচানো সহজ হতো। কিন্তু তারপরও আমরা চেষ্টায় ত্রুটি করব না।

তিন দিন পর হাসপাতালে সায়মার হুঁশ ফিরে আসে। সায়মাকে চোখ খুলতে দেখে আলী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বাজার থেকে তার জন্য বিভিন্ন খেলনা এনে তার সামনে রেখে দেয়। যার মধ্যে প্লাস্টিকের একটি সুন্দর ঘড়িও ছিল। সায়মা চোখ খুলে প্লাস্টিকের ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই চীৎকার দিয়ে দ্বিতীয়বার বেহুঁশ হয়ে পড়ে।

ডাক্তার চীৎকার শুনে ছুটে আসেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন সায়মার হুঁশ ফিরিয়ে আনার জন্যে। কিন্তু ডাক্তারের সকল চেষ্টা বিফল হলো। ক'মিনিট পর হতাশার সাথে ডাক্তার বললেন, 'মেয়েটি আর জীবিত নেই। তার রূহ এখন জান্নাতবাসীদের সাথে মিলিত হয়েছে।'

আলী ডাক্তারের কথা শুনে আদরের ছোট বোন সায়মার লাশের উপর পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আলীর আব্বা নিশ্চল পাথরের ন্যায় মুক হয়ে চেয়ে থাকে নিষ্পাপ মেয়ের চেহারার দিকে। তার চোখ দিয়ে ঝরছিলো অঝোর অশ্রুধারা।

দীর্ঘক্ষণ পর পিতাপুত্রের অবস্থায় কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে আসলে ডাক্তার বললেন, 'সায়মা খেলনার সেকেলে তৈরী বারুদী বোমার আঘাতে আহত হয়েছিলো। এই বোমাগুলো খুবই মারাত্মক, যা রুশী ফৌজরা আফগানিস্তানের আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস বা পঙ্গু করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এখানে সেখানে ফেলে রাখছে। এই কয়দিনে বারুদী খেলনা বোমায় আহত বহু শিশু-কিশোর-যুবককে আমরা চিকিৎসা করেছি। তাদের মধ্যে অনেকেই শাহাদাতবরণ করেছে। তাদেরকে আমরা বহু চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি। এ খেলনাবোমা রুশী ফৌজরা পথে-ঘাটে, চারণভূমিতে এবং বসতি কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের ওপর ফেলে রাখে। যাতে স্পর্শকারীর শরীরের কোন একটি অংগ নষ্ট বা বিকল হয়ে যায়। কখনো কখনো ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারাবার কথাও শুনা যায়। দেখতে সুন্দর এই সব খেলনাবোমা শিশুরা হাতে নিতেই বিকট আওয়াজে বিস্ফোরিত হয়। রুশী ফৌজদের এই হীন কাজ বড়ই অমানবিক ও হৃদয়বিদারক। তারা এই জঘন্য পথে আফগান জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এর দ্বারা সকলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রয়াস চলছে। যেন বড় হয়ে এ প্রজন্ম রুশী ফৌজদের মুকাবিলায় হাতিয়ার উঠাতে হিম্মত না করে। সাথে সাথে তারা আফগান জাতিকে চিরদিনের জন্য গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখছে। এরপর তারা থাবা বিস্তার করবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে।'

আলী খুব মনোযোগের সাথে ডাক্তারের কথাগুলো শুনছে, নিজের অজান্তে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায় তার হাত। তার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো প্রতিশোধের অনির্বাণ শিখা। মনে মনে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে, এ জালিম রুশীদের থেকে তার প্রিয় বোন সায়মার খুনের বদলা সে নে-বে-ই।

সায়মার লাশ নিয়ে ফেরার পথে আলী তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে,'আব্বু! রুশীরা আফগানীদেরকে কেন হত্যা করছে?'

জবাবে তার আব্বা বলেন, 'আসলে আফগানীদেরকে নয় বরং ওরা মুসলামনদেরকে হত্যা করছে। আফগানের মুসলমানরা যে আল্লাহ ও রাসূলে (সাঃ) বিশ্বাস করে–এটাই তাদের অপরাধ।'

'আব্বু! রুশীরা আল্লাহ্ ও রাসূলকে শত্রু মনে করে কেন? আল্লাহ্ তো আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্য তৈরী করেছেন কত রকম ফল-ফুল, সবুজ পৃথিবী, নীল আকাশ। আর আল্লাহ্র রাসূল-তিনিও তো কত ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি কাফির-মুশরিকদের ছেলেদেরকেও তো কত আদর করতেন। অসুস্থ দুশমনকেও তিনি সেবা-শুশ্রূশা করতে যেতেন এবং তাদের রোগমুক্তির জন্যে দু'আ করতেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি সকল দুশমনকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন–যারা তার উপর সীমাহীন জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে স্বদেশ-মাতৃভূমি ত্যাগ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিলো'।

আলীর কথা শুনে তার আব্বা বল্লেন,'বেটা! রুশীরা শয়তানের অনুসরণ করে, আর শয়তান হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের কাট্টা দুশমন। রুশীরা মনে করে, আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছু নেই। মানুষ, জীবজন্তু, গাছ-পালা সবকিছু এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। পরকালেও তারা বিশ্বাস করে না। এজন্য জুলুম করতে ওরা মোটেও দ্বিধা করে না। কেননা জুলুমের জন্য পরকালে শাস্তি ভোগ করার ভয় তাদের নেই। মনে রেখো, যে সব লোক বা জাতি আল্লাহ্র ওপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, তারা এই বর্বর রুশীদের ন্যায় সীমাহীন অত্যাচারী হয়ে থাকে। অত্যাচার করাকে তারা অন্যায় মনে করে না। শয়তান আর তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।'

গ্রামে পৌঁছে তারা খবর পেল যে, আরো অনেক শিশু এ বারুদী খেলনায় শহীদ হয়েছে, যখমী হয়েছে অসংখ্য। সায়মার লাশ নিয়ে বাড়ী আসলে দীর্ঘক্ষণ ধরে সায়মার আম্মা, ফুফু কান্নাকাটি করে। কোনভাবেই আলী তার মার কান্না থামাতে পারছিলো না। আলী তার আম্মুকে লক্ষ্য করে বললো, 'আম্মু, চোখের পানি মুছে ফেল।' প্রতিশোধের অগ্নিতে প্রজ্বলিত আলী শপথ করে বল্লো, 'আমি এক একটি রুশীকে কতল করে বোন সায়মার এক এক ফোঁটা খুনের বদলা নেব। ওদের এদেশ থেকে তাড়াবই। আমি বিশ্বাস করি, যে কওম আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে মানে না, তারা যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন ধ্বংস ও পরাজয় তাদের অনিবার্য।'

এমনিভাবে প্রতিদিন ছোট ছোট শিশু যখমী ও শহীদ হওয়ার ফলে গ্রামময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাপ-মা ছোট বাচ্চাদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেন না। এমনকি বহু পরিবার এরই মধ্যে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করে পাকিস্তানের পথে পাড়ি জমিয়েছে।

নীরবতা ও উদাসীনতার মধ্যে দিয়ে আলীর দিনগুলো কাটলেও হৃদয়ে তার প্রতিশোধের বহ্নিশিখা দিন দিন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। কোন কাজেই তার মন বসছে না।

ঘুমের ঘোরে প্রায়ই সায়মাকে সে যখমী অবস্থায় খুনের মাঝে তড়পাতে দেখে।

কয়েকবার সে তার আব্বুর নিকট মুজাহিদদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আব্বু তাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন, 'বেটা তুমি এখনো ছোট। অস্ত্র তুলে যুদ্ধ করার মত বয়স, শক্তি ও বুদ্ধি তোমার এখনও হয়নি। কিছুদিন অপেক্ষা কর।'

খলীল এখন আর পাহাড়ে গিয়ে খেলা করে না, সারাটা দিন উদাসীনভাবে তার আম্মার কাছে বসে তাকে।

বকরীটিও বুঝি তার বাচ্চা ও সায়মার মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারল না। সকাল বেলা ওঠে দেখা গেল, রাতের কোন এক সময় বকরীটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

একদিন আলী সবার সাথে ঘরে বসে নাস্তা করছিল। এমন সময় তারা জঙ্গী বিমানের শব্দ শুনতে পায়। নাস্তা রেখে নিরাপদ পরিখায় পৌঁছার পূর্বেই তারা বোমা নিক্ষেপের আওয়াজ শুনতে পেল। সাথে সাথে বিকট শব্দে সেটি বিস্ফোরিত হয়।

বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় তাদেরই ঘরের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে তাদের ঘরখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তার মা ও ফুফু ঘরের মধ্যে ছিলো। তারা আত্মরক্ষার সুযোগও পেলেন না। উভয়ে বোমা বিস্ফোরণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তৎক্ষণাৎ দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়ে চলে যান।

তার পিতাও মারাত্মকভাবে আহত হন। আলী সামান্য যখম হয়। রক্তঝরা বাহু তুলে প্রতিশোধের স্পৃহায় প্রজ্বলিত আলীর পিতা তাকে কাছে ডেকে বলে, 'বেটা তুমি অনেকবার আমার কাছে জিহাদে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চেয়েছো, আমি তোমাকে অনুমতি দেইনি। এখন সময় হয়েছে, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। তুমি খলীলকে সঙ্গে নিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়।

আলী তার পিতার যখম থেকে অস্বাভাবিক রক্ত ঝরতে দেখে মমতার সুরে বললো, 'আব্বু! আপনি মারাত্মক আহত। আপনাকে এভাবে রেখে কিভাবে আমি অজানার পথে পাড়ি দিব?'

আলীর আব্বা বললেন, 'আলী! তুমি চিন্তা করো না। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে তোমাদের সাথে মিলিত হবো– ইনশাআল্লাহ্। সময় খুব কম। বিমান হামলা করে ওরা গ্রাম ধ্বংস করছে। এর পরই ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ী এসে গ্রাম ঘিরে ফেলবে। আমরা যারা এখনো বেঁচে আছি, তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের মোকাবেলা করবো। যদি মরতেই হয় তবে লড়াইয়ের ময়দানেই মৃত্যুকে আলিঙ্গণ জানাবো। কিন্তু তুমি এখনও ছোট, তোমাদের ভবিষ্যৎ বহু বিস্তৃত। দেশের আজাদীর জন্য লড়তে হবে তোমাদেরই। তোমাদের বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। যদি দুশমন তোমাকে ধরে ফেলে তবে জিন্দা ছেড়ে দেবে বলে মনে করি না। অতএব তুমি আমার কথা শুন, এক্ষুণি এখ'ন থেকে বেরিয়ে পড়। আর প্রধান পথ ধরে হাঁটবে না। ইতিমধ্যে সেখানে দুশমনের ট্যাঙ্ক এসে

গেছে। পিছনের পাহাড়ী পথ দিয়ে বেরুবে। বারুদের খেলনা ও মাইন দেখে পথ চলবে। খলীলকেও তোমার সাথে নিয়ে যাও। ভালভাবে ওর দেখাশুনা কর। ওর যেন কোন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো।'

বিদায় বেলা আলীর বাবা তাকে একটি থলে হাতে দিয়ে বললেন, 'বেটা এর মধ্যে কিছু টাকা আছে যা আমি জিহাদে খরচ করার জন্যে জমিয়েছি। তুমি এগুলি নিয়ে যাও। প্রয়োজনের সময় এগুলো কাজে আসবে।

বাবা আলীর কপালে চুমু দিয়ে অসীয়ত করে বললেন, 'সব কিছুর বিনিময়ে ইসলামের পতাকা সর্বদা সমুন্নত রাখবে। তোমাদের গাফিলতির জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট যেন আমাকে লজ্জিত হতে না হয়। আমি দোয়া করি যেন সকল আফগান নওজোয়ানের ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার লড়াইয়ে শরীক হওয়ার ভাগ্য হয়। আমাদের জন্যে ভেব না, আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করব।'

পিতার ক্ষতস্থান সে রুমাল দিয়ে বেঁধে দেয়। শহীদ মা ও ফুফুকে একবার চোখ ভরে দেখে হৃদয়ে প্রতিশোধের স্ফূলিঙ্গ নিয়ে সব মায়া পিছনে ফেলে বাড়ীর পিছন দিকের পাহাড়ী পথ ধরে নির্দিষ্ট মন্‌যিলের উদ্দেশ্যে কদম কদম অগ্রসর হয়। আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে। সেখানে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে তারা গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে বিমানের আকস্মিক আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন বিপদের আশংকা নেই। বোমা হামলায় সমস্ত গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনেক নারী ও শিশু গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ পাহাড়ের দিকে চলে এসেছে। কিছু সময় পরে দুশমনের সাজোয়া বহর গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে পুরো গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে। তারা গ্রামের উপর লাগাতার তোপের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। তাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকে এই নারকীয় কান্ড। ক্রমাগত গোলাবর্ষণের পর তাদের মনে হলো যেন গ্রামের একটি প্রাণীও আর বেঁচে নেই। এই বর্বরদের মোকাবেলা করার মতো একটি প্রাণীও বুঝি জীবিত নেই। এবার তারা ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া যান থেকে নেমে ক্লাসিনকভ হাতে গ্রুপে গ্রুপে গ্রামে প্রবেশ করে। হঠাৎ তাদের সামনের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসতে শুরু হয়। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুশমনের কয়েক ডজন সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রুশ সৈন্যরা এবার সতর্ক হয়ে পিছনে এসে পুনরায় তোপের গোলা বর্ষণ করতে থাকে। এভাবে আরও এক ঘন্টা চলার পর ক্লাসিনকভ দিয়ে সামনের দিকে গুলি করতে করতে তারা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে।

আলীর কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। না হয় এখান থেকে বেশ কিছু দুশমনকে হত্যা করা তার জন্যে বেশ সহজ ছিল। সে আফসোস করতে লাগলো, হায়, যদি একটা বন্দুক তার কাছে থাকতো।

দুশমনের লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে সে আনন্দে তকবীর ধ্বনি দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়। ফলে দুশমনের ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ী ভিতরে ঢুকে পাইকারীভাবে সকল শ্রেণীর লোককে বন্দী করে। আলী করুণ চোখে

অসহায়ের মত সব দেখতে থাকে। রুশীরা গ্রামের পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের এক মাঠে জড়ো করে ব্রাশ ফায়ারে সকলকে শহীদ করে। এরপর তারা পুরো গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসব দেখে আলীর হৃদয় ব্যাথায় কুঁকড়ে ওঠে। খলীল মানসিক যন্ত্রণায় আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী ভাবতে থাকে, অবশ্যই তার বাবা বেঁচে নেই। নিশ্চয়ই শহীদদের কাতারে শামিল হয়ে গেছেন তিনি। সে অশ্রুসিক্ত নয়নে উঠে দাঁড়িয়ে খলীলকে নিয়ে পাহাড়ের অপর দিকে চলে যায়। তারা দু'জন দিনভর হেটে সন্ধ্যায় পাহাড়ের এক গুহায় শুয়ে পড়ে। উভয়েই ছিল ভীষণ কাতর ও ক্ষুধাতুর। এত কম বয়সে এত ভয়ংকর দৃশ্য কখনো তারা কল্পনাও করেনি। উপরন্তু অজানা পথের এই লম্বা সফর–ভাবছে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। নিজ মঞ্জিল ও দুশমনের ঘাঁটি কোনটিই তারা চেনে না। জানে না, তাদের সহযোগিরা কোথায় আছে। সারা দিন পথ চলে ক্লান্ত শরীরে শোয়ার সাথে সাথে চোখে গভীর ঘুম নেমে আসে। ঘুমের ঘোরে সারা রাত আলী ভয়ংকর আজেবাজে স্বপ্ন দেখে। সকালে উঠে আবার হাঁটতে থাকে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা মেপে মেপে দেখে-শুনে সামনে চলছে। কোথাও মানুষের শব্দ পেলে পথ বদলে নেয়। হতে পারে ওরা দুশমনের লোক। অচেনা এলাকায় কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

পথের পাশে একটি জায়গায় ঝর্ণা দেখতে পেয়ে তারা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। হাতের পুটলি থেকে রুটি বের করে খেয়ে নেয় এবং প্রাণভরে পান করে স্বচ্ছ ঝর্ণার নির্মল পানি। খলীল অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে আলী তাকে কাঁধে তুলে নেয়। দুশমনের কোন বিমানের আওয়াজ পেলেই ওরা ঝোপ-ঝাড়ে কিংবা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এভাবে লাগাতার তিন দিন সফর করার পর তারা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের পায়ে ফোসকা উঠে। চলার গতি ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে। সামান্য যে কয়টি রুটি তারা এনেছিল তা-ও শেষ হয়ে গেছে। খলীল ক্ষুধায় কাতরাতে থাকে। বার বার আলীকে বলে, ভাইজান, 'দারুণ ক্ষুধা পেয়েছে, আর হাঁটতে পারছি না।'

আলী তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, সামান্য চললেই সামনে খাবার পাওয়া যাবে। আলীও ক্রমশঃ দুর্বলতা অনুভব করছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলতে থাকে। চলার শক্তি নেই, তবুও সামনে অগ্রসর হতে হবে–চলতে হবে, তাই চলছে।

আবহাওয়া খুব উষ্ণ। হঠাৎ পশ্চিম আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে যায়। বিদ্যুতের চমক ও গর্জনে পাহাড়গুলো কেঁপে কেঁপে উঠে। প্রচন্ড বেগে বায়ু বইছে। এসব দেখে খলীল ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করে। আলী তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রচন্ড বেগে ধেয়ে আসা হাওয়ার মোকাবেলা করে মোটেই এগুতে পারছিল না। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ ভেঙ্গে নেমে আসা শিলাবৃষ্টি থেকে গা আড়াল করার মত কোন আশ্রয় না পেয়ে খলীলকে শিলা থেকে বাঁচাতে আলী নিজের চাদর তার মাথায় বেঁধে দেয়। শিলাগুলো আকারে বেশ বড় হওয়ায় আলীর খালি মাথায় আঘাত লেগে প্রচন্ড ব্যাথার সৃষ্টি করে।

সামনে একটি ছোট ঝোপ দেখে তারা তার নীচে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ঝড় ও শীলা থেমে গেলেও বৃষ্টি থামার নাম নেই। এবার শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। সন্ধ্যায় বৃষ্টি থেমে গেলেও পাহাড় থেকে বর্ষার পানি নালায় নেমে ঢল বইতে থাকে। পানির স্রোতের শোঁ শোঁ আওয়াজ দূর থেকেও শুনা যায়। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

খলীলের গা বেশ গরম হয়েছে। ক্রমেই তার শরীরে জ্বরের তেজ বাড়ছে। খলীল জ্বর ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেবল হাত পা ছুড়ছে। আলী খলীলের বেহাল অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লো, 'তুমি এখানে থাক, আমি সাতার কেটে ওপারে গিয়ে দেখি, খাবার জন্যে কিছু পাওয়া যায় কিনা! তুমি বেশী অস্থির হয়ো না। আল্লাহ্‌ তার অসহায় বান্দাদের জন্যে কোন সুব্যবস্থা করবেনই।'

কিন্তু খলীল কোনো ক্রমেই একা থাকতে রাজী নয়। আলী নিরাশ হয়ে খোদার কাছে দোয়া করতে থাকে, 'হে পরম করুণাময় আল্লাহ, এখনই নালার পানি শুকিয়ে দাও যেন আমরা ওপারে যেতে পারি। আমাদেরকে বন্ধুদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।'

অসহায় মানুষের প্রার্থনা আল্লাহ দ্রুত কবুল করেন।

আলী কারও পায়ের শব্দ শুনতে পায়। শত্রুর আশংকায় প্রথমে তার শরীর শিউরে ওঠে। খলীলের অবস্থার কথা বিবেচনা করে পরক্ষণেই সে সিদ্ধান্ত নেয়, বিপদে শত্রুরও সাহায্য নিতে হয়। তাই এরা যদি শত্রুও হয় নিজের উদ্দেশ্য গোপন রেখে সে তাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাবে।

পায়ের আওয়াজ অনুসরণ করে আলী শব্দ করে তাদেরকে ডাকতে থাকে।

কারও ডাকার শব্দ শুনে সাতজন সশস্ত্র যুবক দাঁড়িয়ে যায়। আলী নিঃসংকোচে তাদের নিকট তার অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে। অবশেষে সে জানতে পারে, এরা সবাই মুজাহিদ। তারা নিকটবর্তী এক পোস্টে হামলা করার জন্যে রওয়ানা হয়েছে। খলীলের অবস্থা দেখে কমান্ডার ছ'জন সাথী নিয়ে হামলার জন্য চলে যায়। বাকী একজনকে এদের সাথে রেখে যায়। মুজাহিদদের কাছে তখন খাওয়ার জন্য সামান্য গুড় ছিল। তা তারা খলীলকে খেতে দিল। গুড় খেয়ে খলীল সামান্য সুস্থ অনুভব করে। নালার পানি কমলে মুজাহিদ যুবকটি তাদেরকে নিয়ে নালা পার হয়ে মারকাজের দিকে চলতে থাকে। খলীলের পক্ষে হাঁটা সম্ভব ছিল না বলে তাকে কাঁধে করে নিতে হয়েছে। কয়েকঘন্টা চলার পর তারা মুজাহিদদের একটি ছোট ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছে।

এই ক্যাম্প কায়েম করা হয়েছে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে। পূর্বে এতে জংলী জানোয়ার বাস করতো। মুজাহিদরা তা সাফ করে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। মুজাহিদরা তাদেরকে অবশিষ্ট কয়টি রুটি খেতে দেয় আর গরম চা তৈরি করে পান করায়। এক মুজাহিদের কাছে জ্বরের ট্যাবলেট ছিল তা খলীলকে খাইয়ে দেয়া হয়। আলী ও খলীল শুয়েই গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়।

সকালে খলীলের জ্বর ছেড়ে যায়। ক্যাম্পের মুজাহিদরা নাস্তা করতে বসতেই রাতের আক্রমণকারী গ্রুপ ফিরে আসে। কমান্ডার প্রথমেই আলী ও খলীলের খবর নেয়। এর

পর গত রাতের অপারেশনের (আকস্মিক হামলার) বিবরণ শুনায়। দুশমনের বিশজনেরও বেশী সৈন্য হতাহত হয়েছে। কয়েকটি গাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে। বেশ কিছু রুশী অস্ত্র তাদের হাতে এসেছে। কমান্ডার সেগুলি আলী ও খলীলকে দেখায়। এরপর অস্ত্রগুলি মারকাজের অস্ত্রাগারে জমা করা হয়।

তিনদিন পর্যন্ত আলী ও খলীল এ মারকাজে থাকে। এর পর কমান্ডার তাদেরকে ওই প্রদেশের কেন্দ্রীয় মারকাজে পাঠিয়ে দেয়। মুজাহিদদের চীফ কমান্ডার আলী ও খলীলের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি আলীকে বলেন, 'দেখ বেটা! আফগানিস্তানের সর্বত্র আজ জুলুম ও নির্যাতন চলছে। কোথাও বারুদের খেলনা, কোথাও বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে রুশীরা মুসলমানদের হত্যা করছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। রুশীদের মোকাবেলায় মুজাহিদরা আজ মজবূত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মুজাহিদদের বিজয়ী করবেন।'

আলী বল্‌লো, দুশমনদের কাছে বিমান, ট্যাঙ্ক ও অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র আছে। খালী হাতে মুজাহিদরা এর মোকাবেলা কিভাবে করবে?'

আলীর প্রশ্নের জবাবে কমান্ডার বল্‌লেন, 'দুশমন যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন আল্লাহ তাদের থেকে বহু বেশী শক্তির মালিক। তুমি জঙ্গে বদরের ইতিহাস শুনেছো? মুসলমানদের কাছে সামান্যই হাতিয়ার ছিল। আর তা নিয়ে তিনগুণ শক্তিশালী কাফেরদের ওপর আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ, আমরাও অতি শীঘ্রই দেশকে রুশদের কব্জা থেকে আজাদ করব এবং আফগানিস্তানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াব।'

অল্প দিনের মধ্যে আলী মুজাহিদদের পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়। সে একদিন কমান্ডারের কাছে গিয়ে বলে, 'আমাকে অস্ত্র দিন, আমিও দুশমনের সাথে লড়াই করব।'

কমান্ডার তাকে বল্লেন, 'এখনও তুমি ছোট, আমি তোমাকে ও খলীলকে পাকিস্তান পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। সেখানে লেখাপড়া শেষ করে ফিরে এসে তোমরা জিহাদে শরীক হবে।

আলী নাছোড় বান্দা। সে বলতে লাগলো, আমি এত ছোট নই যে বন্দুক উঠাতে পারবো না। আর এখন আমার অস্ত্র চালানোর শিক্ষা নেয়া বেশী প্রয়োজন, যা পাকিস্তানে নয় বরং এখানেই অর্জন করা সহজ ও সম্ভব।

কমান্ডার তাকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তে অনড়। অবশেষে কমান্ডার আলীর প্রস্তাব মেনে নেন। তবে শর্ত দিলেন, ছয় মাসের মধ্যে কোন লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাতে পারবে না। বরং ট্রেনিংয়ের সাথে সাথে সে মারকাজের সকলের খেদমত করবে। ঝর্ণা থেকে মুজাহিদদের জন্য পানি আনবে, জ্বালানী সংগ্রহ করবে এবং যখন যে কাজের প্রয়োজন তা' করবে। এরপর তাকে অস্ত্র দেওয়া হবে এবং লড়াইয়ে যাওয়ার অনুমতি পাবে।

আলী সানন্দে এ প্রস্তাব মেনে নেয়।

খলীলকে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হয়। বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় খলীল খুব বেশী কান্নাকাটি করে। আলী তাকে অনেক বুঝায় এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলে, পাকিস্তান এসে সে মাঝে মাঝে তার সাথে দেখা করবে।

ছয় মাস পর আলীর ট্রেনিং সমাপ্ত হলে চীফ কমান্ডার তার হাতে অস্ত্র তুলে দেন। আলী অত্যন্ত খুশী হয়। সে এবার দুশমনের ওপর হামলা করার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে।

আলী রাইফেল ও অন্যান্য ছোট অস্ত্র চালাতে সক্ষম হওয়ায় চীফ কমান্ডার তাকে ছোট ছোট হামলায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেন। এসব অভিযানে আলী অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং প্রমাণ করে যে, সে অন্যান্য পরীক্ষিত মুজাহিদদের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। আলী অতি অল্প সময়ের মধ্যে রকেটলাঞ্চার ও বিমানবিধ্বংসী তোপ পরিচালনা শিখে নেয়। এর পর সব ধরনের আক্রমণের সময় সবার আগে তাকেই ডাকা হয়।

ষোল বছর বয়সের আলী অল্প সময়ের মধ্যে গেরিলা লড়াইয়ে পারদর্শী হয়ে উঠে। মারকাজের সকল মুজাহিদের নিকট সে দুঃসাহসী মুজাহিদ বলে পরিচয় লাভ করে। কমান্ডার তাকে সম্মুখবর্তী ফ্রন্টে নিয়োগ করেন। সেখানে দু'টি উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের ঘাঁটি। পাহাড়ে প্রচুর গাছপালা থাকায় দূর থেকে তা ঘন জঙ্গল বলে মনে হয়। পাহাড় দু'টি আরও কিছুদূর যেয়ে এক সাথে মিশে গেছে। সেখান থেকে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে স্রোতের সৃষ্টি করে দু' পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে। স্রোতধারার দু' পাশে মুজাহিদদের সারিবদ্ধ পরিখা।

এই পাহাড় থেকে আট মাইল দূরে আরও উঁচু পাহাড়ের ওপর দুশমনের ঘাঁটি। মুজাহিদরা সেই ঘাঁটিটির পতন ঘটাতে অগ্রসরমান। এক রাতে আলী সহ বিশজন মুজাহিদ অন্ধকারে আকস্মিক হামলা চালাতে সেদিকে রওয়ানা হয়। তারা ধীরে ধীরে দুশমনের পোস্টের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে।

রুশ সৈন্যরা পোস্টের আশেপাশে মাইন বিছিয়ে রেখেছে। মাইন অনেক প্রকারের। কোন কোনগুলো বড় আকারের। যখন ট্যাঙ্ক এর উপর দিয়ে চলে তখন তা বিষ্ফোরিত হয়ে ট্যাঙ্ককে ধ্বংস করে দেয়। অন্যগুলি পদাতিক বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পুঁতে রাখা হয়। এগুলো আকারে ছোট। কোন কোনটি মাটির সামান্য নীচে স্থাপিত থাকে। যদি কারো পা এর উপর পড়ে তবে সাথে সাথে বিষ্ফোরিত হয়ে পা উড়িয়ে নিয়ে যায়। এক প্রকারের মাইন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে পুঁতে রেখে লম্বা বৈদ্যুতিক তার সংযোজন করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা হয়। কারো পায়ের সাথে তারের টান পড়লেই ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে এর কণাগুলো দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছুটে যেয়ে গায়ে বিদ্ধ হয়।

এছাড়া রয়েছে ইলেকট্রোনিক মাইন। যা মাটির গভীরে অনেকগুলো এক যায়গায় পুঁতে রাখা হয়। মাটির নীচ দিয়ে এর সাথে তার সংযুক্ত করা হয়। সেখানে যখনই কোনো শত্রু বাহিনী এসে জড়ো হয় তখন ব্যাটারী চার্চ দিয়ে একই সঙ্গে সবগুলো

বিস্ফোরিত করা হয়। রুশরা আরো এক প্রকার মাইন আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে। যার রং ও ধরণ পাথরের মত। অসংখ্য বিক্ষিপ্ত পাথরের মধ্যে এই মাইনগুলো সনাক্ত করা ভারি কঠিন।

আলীদের গ্রুপ আক্রমণের জন্য শত্রুদের পোস্টের কাছে পৌঁছল একজনের পা মাইনের ফাঁদে পড়ে যায়। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতেই রুশ সৈন্যরা সেদিকে অন্ধের মত গুলি ছুড়তে থাকে। ফলে তারা পিছনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ফেরার পথে কয়েকজন মুজাহিদ আহত হয়। নিরাপদ স্থানে জমায়েত হয়ে দেখে, দু'জন সাথী নেই। কমান্ডার ঐ দু' মুজাহিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আব্দুল্লাহ নামক এক মুজাহিদ বলে যে এরা দু'জনই মাইনের উপর পড়েছে। সম্ভবতঃ তারা শহীদ হয়ে গেছে।

মুজাহিদরা তাদের শহীদ সাথীদের লাশ কখনও শত্রু এলাকায় ফেলে আসে না। লাশ উদ্ধারের জন্য তারা দ্বিতীয়বার হামলা চালায়। দুশমন প্রস্তুত ছিল। এ আক্রমণে আরও দু'জন মুজাহিদ জীবন দিয়েও শহীদদের লাশ আনতে ব্যর্থ হয়। শত্রু পোস্ট বিজয় না করা পর্যন্ত লাশ আনা সম্ভব নয়। আলীসহ পাঁচজন মুজাহিদকে লাশ পর্যবেক্ষণের জন্য রেখে কমান্ডার বাকীদের নিয়ে মারকাজে ফিরে যান। এরা পরিখা বানিয়ে দূর থেকে লাশ পাহারা দিচ্ছিলো। কোন সৈনিক এদিকে অগ্রসর হলে গুলি করে তার পথ রুদ্ধ করা হত। এভাবে কয়েকদিন চলে গেল। উপায় না দেখে তারা রাতে কামান দ্বারা দুশমনের পোস্টের ওপর গোলা বর্ষণ করে, যাতে দুশমন পোস্ট খালী করে চেলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু এতেও তেমন ফল হল না। তাদের পোষ্ট ছিল অনেক উঁচুতে। মুজাহিদদের গোলায় তাদের তেমন ক্ষতি হচ্ছে না। অপর দিকে মুজাহিদদের পরিখার অবস্থান লক্ষ্য করে রুশ সৈন্যরা ভারি তোপের গোলা বর্ষণ করে। তোপের আঘাতে একজন মুজাহিদ শহীদ ও কয়েকজন আহত হয়।

মুজাহিদরা বড়ই পেরেশান। দিনে হামলা করলে পোস্ট দেখা যায়। রাতে গোলার শব্দ ও আলোকরশ্মিতে পরিখার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কোন প্রকারেই লাশ আনা যাচ্ছে না। আক্রমণ চালালে শত্রুর চেয়ে নিজেদেরই বেশী ক্ষতি হয়।

দুমশনের এলাকায় শহীদের লাশ পড়ে থাকবে তা আত্মমর্যাদায় উজ্জীবিত মুজাহিদদের বরদাস্ত হচ্ছিল না। আরো কয়েকদিন এভাবে চলে গেল।

এক দিন আলী কমান্ডারের কাছে গিয়ে বল্‌লো, আমার কাছে একটি কৌশল আছে, যদি আপনি অনুমতি দেন তবে তা' প্রয়োগ করে দেখতে পারি। ইনশাআল্লাহ প্রথম পদক্ষেপেই আমরা লাশ উদ্ধার করতে সক্ষম হব। আশা করি, এ পরিকল্পনার আওতায় পরবর্তিতে পোস্টও দখল করা যাবে।

কমান্ডার আলীর কাছে তার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। আলী তাঁকে মোটামুটি ধারণা দিয়ে বল্‌লো, আর যা করব তা ওই সময় তাৎক্ষণিকভাবে নির্দ্ধারণ করতে হবে। একথা যেন আপনি কাউকে না জানান। আমাদের মধ্যে দুশমনদের গুপ্তচর লুকিয়ে থাকতে পারে।

কমান্ডার আলীকে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুমতি দেন। আলী তার এই অপারেশনের নাম বিখ্যাত মুসলিম গেরিলা মুজাহিদ ইমাম শামিলের নামে 'শামিল' নামকরণ করে। এরপর ছোট-খাট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাঁচজন বাছাই করা মুজাহিদ নিয়ে অগ্রসর হয়। সাথে নেয় ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য রকেট-যাকে মুজাহিদরা রকেট মিসাইল বলে। আর নেয় ছয়টি খালি টিনের কৌটা, প্রয়োজনীয় ব্যাটারী ও বৈদ্যুতিক তারসহ অন্যান্য সামগ্রী।

কারো বুঝে আসছিল না, আলী কিভাবে ঐ খালী টিনের কৌটা দিয়ে শহীদদের লাশ উদ্ধার করে আনবে।

আলী কারও উপহাস ও সমালোচনায় কান দিচ্ছে না। রুশী পোস্টের এক মাইল দূর থেকে আলী লাশের দিকে যাওয়ার পরিবর্তে পোস্টের অপর দিকে চলে আসে। পোস্ট থেকে এক কিলোমিটার দূরে সাথীদের নিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে আলী আশপাশের অবস্থান ও পোস্টের দূরত্ব পর্যবেক্ষণ করে। এর পর সাথীদেরকে টিনের ডিব্বায় পানি ভরে আনতে বল্‌লে সাথীরা তো হেসে খুন। হাম্বল খান নামক একজন মুজাহিদ হেসে হেসে বলে, তুমি কি রুশদেরকে পাতিকাক ভেবেছো যে, টিনের ডিব্বায় শব্দ করলে তারা ভয়ে পালিয়ে যাবে?

আলী মৃদু হেসে বললো, 'কাক তো ভাল, ওদেরকে তো আমি পাতিশৃগালের চেয়েও ভীতু মনে করি।'

পানি আনতে বলায় হাম্বল খান এবার বল্‌লো, তুমি কি এদের ডিব্বার পানির মধ্যে ডুবিয়ে মারবে?

আলী এবার কঠোর স্বরে বল্‌লো, ঠিকই বলেছো, এরা এর মধ্যে ডুবে মরবে না বটে, তবে তাদের দাফন করার পূর্বে গোসল দেওয়ার জন্য পানি আনতে বলছি।'

মুজাহিদরা ঝর্ণা তালাশ করে ডিব্বায় পানি ভরে আনলে আলী তার ব্যাগ থেকে বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারী ও কয়েকটি লোহার পাত বের করে। তারপর লোহার পাতের সাথে তারের এক মাথা লাগিয়ে তা ব্যাটারীর সাথে সংযুক্ত করে। এবার তারের অন্য মাথা রকেট মিসাইলের সাথে টেপ দিয়ে সেটে দেয়। লোহার পাত একটি কাঠের টুকরার সাথে বেঁধে টিনের পানির উপর ভাসায়। ব্যাটারীর অপর পাশ থেকে অন্য তার এনে কৌটার সাথে সেটে দেয়। এভাবে একশ' গজ দূরে এক একটি মিজাইল তাক করে ডিব্বার কৌটায় বিভিন্ন আকারের একটি করে ছিদ্র করে দেয়। ছিদ্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরতে থাকে। আলী সাথীদের নিয়ে এবার দ্রুত লাশের দিকে চলে আসে। লাশের কাছাকাছি এসে একটি নিরাপদ স্থানে সবাইকে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

আলীর চিন্তা ও দৃষ্টি তাক করা রকেট মিসাইলের দিকে নিবন্ধ। আধ ঘন্টা হয়ে যায়। তার হৃদকম্পন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয় এই চিন্তায় যে, পরিকল্পনা বিফল হলে কমান্ডারকে কি জবাব দেবে, এটাই হলো তার উৎকণ্ঠার বড় কারণ। তার হিসাব মতে এতক্ষণে ফায়ার শুরু হওয়ার কথা। এর পরও দশ মিনিট অতিবাহিত হয়। তার

চেহরায় হতাশার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সাথী মুজাহিদরাও তাকে ঠাট্টা করতে থাকে। আলী মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলো। কোনক্রমে যদি ইজ্জত রক্ষা পায়। এমন সময় হঠাৎ করে একটি মিসাইল ফায়ার হল, সাথে সাথে আরও একটি। রুশ সৈন্যরা ভাবলো, মুজাহিদরা এদিক থেকে হামলা করেছে। তাই তারা সেদিকে লক্ষ্য করে ফায়ার খুলে দিল।

এবার আলী সাথীদের বল্‌লো, দুশমনের দৃষ্টি এখন ঐদিকে। এখন বিরতি দিয়ে আমাদের এক একটি মিসাইল ফায়ার হতে থাকবে। আমরা এই বিরতির সময় লাশের দিকে অগ্রসর হব। মাইনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে মুজাহিদরা পায়ে পায়ে লাশের কাছে পৌঁছে গেলো।

ইতিমধ্যে আটটি মিসাইলের ফায়ার হয়েছে, বাকী চারটা শেষ হবার পূর্বেই মুজাহিদরা লাশ নিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে এসেছে।

দুশমন ধোকায় পড়ে যায়। যেদিক থেকে মিজাইল ফায়ার হচ্ছিল ওদিকে তাদের রসদ সরবরাহ লাইন। সরবরাহ লাইন বন্ধ হলে খাদ্য পানি জুটবে না ভেবে সৈন্যরা ঐ দিকে বেহিসাব গোলা বারুদ ছুড়তে থাকে।

আলীর মিশন কামিয়াব হওয়ায় কামান্ডারসহ সকল মুজাহিদ অত্যন্ত খুশী হয়। তারা একে অন্যকে মোবারকবাদ জানায়।

আলীকে ডেকে কমান্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে এ পরিকল্পনার কথা তোমার মাথায় আসলো?'

আলী জবাবে বল্‌লো, ট্রেনিং নেওয়ার সময় টাইম-পীচ ঘড়ির বদলে টিনের কৌটায় পানি রেখে সংযোগ ঘটানোর বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তখন সফল হইনি। তারপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা-করে কৌশল আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছি। টিনের কৌটায় পানি রেখে তার উপর কাঠের সাহায্যে লোহার পাত ভাসিয়ে রাখি। এরপর প্রত্যেকটি কৌটায় ছোট বড় আকারে ছিদ্র করে দেই। ছিদ্রের আকার অনুযায়ী কৌটর পানি পড়ে যাওয়ার পর লোহার পাত টিনের গা স্পর্শ করার সাথে সাথে বিদ্যুতের নেগেটিভ-পজিটিভ মিলে যায়। তখনই রকেট উড়ে যেয়ে নির্দিষ্ট স্থানে বিস্ফোরিত হয়।

কমান্ডার সাহেব আলীর এই কৌশল খুব পছন্দ করলেন। সেই রাতে আলীর সাথে পরামর্শ করে পোস্টের উপর নতুনভাবে আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো।

রকেট মিজাইল সাথে নিয়ে কৌশল অনুযায়ী মুজাহিদরা পূর্বের মত পোস্টের অন্য পাশে এসে অবস্থান নেয়। আলী সবার আগে গিয়ে পোস্টের সৈন্যদের গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে থাকে। অপারেশন শুরু হয়। পোস্টের কাছে মিজাইল বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেই যেদিক থেকে গোলা এসেছে রুশ সৈন্যরা সেদিকে অবিরাম গোলা বর্ষণ শুরু করে দেয়।

অবস্থা বেগতিক দেখে রুশ সৈন্যরা আর্টিলারী অস্ত্রের উপর পূর্ণ ভরসা করতে না পেরে ওয়ারলেসে হেডকোয়ার্টার থেকে বিমান পাঠাতে বলে। এক ঝাঁক বোমারু বিমান

এসে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচুর বোমা ফেললো। মুজাহিদরা অপর পাশের পরিখার উপর দাঁড়িয়ে তা উপভোগ করছিলো। দুশমনদের গতিবিধি নিরীক্ষা করার পর আলী অপর পার্শ্ব থেকে হামলা করার নির্দেশ দেয়। সাথে সাথে সকল মুজাহিদ একযোগে পোস্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঝটিকা আক্রমণে রুশ সৈন্যরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না, কি করবে, কোন দিকের আক্রমণ আগে ঠেকাবে। কিছু কিছু সৈন্য দিগ্ব-দিক হয়ে নিজেদের বিছানো মাইনের উপর যেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুজাহিদদের গুলি ও হ্যান্ড গ্রেনেডে বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়। বেঁচে যাওয়া বাকী বিশজনও আত্মসমর্পণ করে। মুজাহিদরা তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।

এই যুদ্ধে প্রচুর রুশী অস্ত্র মুজাহিদরা গনীমত হিসেবে লাভ করে। খাদ্যদ্রব্য যা পেয়েছে তাতে মারকাজের এক মাসের প্রয়োজন মিটে যায়। পোস্ট বিজয়ের পর ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুজাহিদরা ওদের পাকা পরিখাগুলো গুড়িয়ে দেয়। যদিও লড়াইয়ে তিনজন মুজাহিদ শহীদ ও পনেরো জন যখমী হয়, কিন্তু বিজয়ের উল্লাসে তারা ভুলে যায় সে দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা ।

পোস্ট বিজয়ের পর মুজাহিদরা এক আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করে। কমান্ডার আলীকে মোবারকবাদ জানিয়ে বলেন, 'আমরা তোমাকে ছোট ভেবে কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করার সাহস পাচ্ছিলাম না। তুমি বয়সে ছোট হলেও আল্লাহ তোমাকে সাহস, গভীর বুদ্ধি ও কৌশল-জ্ঞান দান করেছেন। আজ থেকে তুমি এই মারকাজে আমার নায়েবের দায়িত্ব পালন করবে। আমি চীফ কমান্ডারের নিকট সুপারিশ করব, তিনি যেন তোমাকে মজলিশে সুরার সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যাতে তোমার সুপরামর্শ দ্বারা নতুন নতুন যুদ্ধ কৌশল উদ্ভাবন করা যায় এবং আমরা প্রতিটি অপারেশনে বিজয় লাভে সক্ষম হই।

আলীর বিজয় অভিযানের খবর চীফ কমান্ডারের কাছে পৌঁছলে তিনি আলীকে হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠান। আঞ্চলিক কমান্ডার আলীকে নিয়ে হেড কোয়ার্টারে আসেন। চীপ কমান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে আলীকে বুকে চেপে ধরে আনন্দের আতিশয্যে তার গালে গভীর চুমু এঁকে দেন। আনুষ্ঠানিক কুশলাদী জিজ্ঞাসার পর হাত ধরে আলীকে কাছে বসিয়ে ঐতিহ্যবাহী 'সিন' চা পান করতে দেন। গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আলীর অভিযানের সকল খবর তিনি তার কাছ থেকে শুনলেন। এর পর বললেন, আলী! প্রথম দিনই আমি তোমার মাঝে সাহস ও প্রতিভার আভাস পেয়েছিলাম। আমি তখনই মনে করেছিলাম, এ ছেলে বড় হয়ে একদিন মুজাহিদদের খুব বড় কমান্ডার হবে। আজ আমার ধারণা সত্যে পরিণত হলো। তোমার হিম্মত ও বিচক্ষণতা দেখে আমি আনন্দিত। এখন তোমাকে এক বিশেষ জরুরী কর্মস্থানের দায়িত্ব দেব। আশা করি তুমি তা সফলতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।'

আলী বিনীতভাবে বললো, 'আপনি যে প্রশংসা করেছেন আমি তার যোগ্য নই। তবে আমার ওপর কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করলে আমি অত্যন্ত খুশী হব এবং জীবন বাজি রেখে আমি তা সম্পাদন করতে চেষ্টা করব।'

কমান্ডার এবার আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'বহুত আচ্ছা! গরদীজ সেনানিবাসে মেজর ফাইয়াজ খান নামে একজন অফিসার আছেন-সে আমাদের লোক। তার কাছে আমার এক পয়গাম পৌঁছিয়ে তার জবাব নিয়ে আসতে হবে। গরদীজের নিকটবর্তী মারকাজের দু'জন কমান্ডারকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তাকে তালাশ করে বের করতে ব্যর্থ হয়েছে। গত দু'মাস ধরে তার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। হতে পারে তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। তার সকল তথ্য জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বিশেষ গোয়েন্দা সার্ভিসের সে একজন একনিষ্ঠ কর্মী। অতএব বুঝতেই পারছো, তার সাথে যোগাযোগ করার গুরুত্ব কত বেশী।

গরদীজ পৌঁছার পূর্বেই তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাবে। এ ব্যাপারে গরদীজ শহরে আমাদের যারা হিতাকাঙ্খী রয়েছে তারা তোমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে। এখান থেকে তুমি পাঁচজন মুজাহিদ সাথে নিয়ে গরদীজের নিকটবর্তী ঘাঁটি "মারকাজে হায়দার" যাবে। সেখানে অস্ত্র রেখে খালী হাতে তোমাকে শহরে প্রবেশ করতে হবে। হায়দার মারকাজের কারো সাথে তুমি তোমার মিশন সম্পর্কে আলাপ করবে না। দুশমনদের গুপ্তচর তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। পরিণামে শহরে প্রবেশের সাথে সাথে তারা তোমাকে গ্রেফতারও করতে পারে।'

মুজাহিদদের এই মারকাজ থেকে ছয়দিনের দূরত্বে গরদীজের অবস্থান। এ শহরে পঞ্চাশ হাজার লোকের বসবাস। গরদীজ আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী। সামরিক দিক দিয়ে গরদীজের গুরুত্ব অপরিসীম।

এখান থেকে গরদীজের পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল। পথে ঘন জঙ্গল, উঁচু পাহাড়। মধ্যে মধ্যে বয়ে গেছে স্রোতোস্বীনী পাহাড়ী ঝর্ণা। উপরন্তু অবিরামভাবে চলছে জঙ্গি বিমানের বোমাবর্ষণ। পথে পথে দুশমনদের গুপ্তচর ও রুশ সেনাদের পোস্ট তো রয়েছেই। তবে আলীর বিগত পাঁচ বছর এ নিয়েই কেটেছে বিধায় তার কাছে এ সফর অতি মামুলী বলে মনে হলো।

আলী ও তার সফর সঙ্গীরা হালকা অস্ত্র, শুকনো রুটি, কিসমিস এবং সামান্য বিছানা পত্র নিয়ে এ বিপদসংকুল পথে রওয়ানা হলো। দু' দিন চলার পর এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গাছের ছায়ায় তারা ঘুমাচ্ছিল। এমন সময় পাহাড়ের অপর পাশ থেকে গড় গড় আওয়াজ শুনতে পায়। আলী সাথীদের নিয়ে দ্রুত একটি পাথরের আড়ালে এসে দাঁড়ায়। পাহাড়ের নীচের এক গ্রামে রুশ সৈন্যরা প্রবেশ করেছে। ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়িতে গ্রাম ভরে গেছে। গ্রামে চরম ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, অধিকাংশ ঘরে আগুন জ্বলছে। বহু নিস্পাপ সরল মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে জালিমরা!!

আলীর মনে সেই দিনের কথা স্মরণ হলো, যে দিন রুশীরা আলীদের গ্রামে হামলা করে তার মা ও ফুফুকে শহীদ করেছিলো। এ বীভৎস দৃশ্য দেখে আলীর ভীষণ কান্না আসে। তার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আলী তার সাথীদের বললো, 'আজ আমার কাছে ভারি অস্ত্র থাকলে রুশদের জব্বর শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম।

সাথীরা বললো, আমরা এখন বিশেষ এক মিশন নিয়ে যাচ্ছি, এ সময় অন্য কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া আমাদের উচিত হবে কি? চুপিচুপি পথ পরিবর্তন করে উদ্দেশ্যের পানে অগ্রসর হওয়াই ঠিক।

অথচ রুশীদের দেখেই আলীর মনে শত শিখায় প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তার মনে পড়ে খেলনাবোমা বিস্ফোরণে ছটফট করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া স্নেহসিক্ত বোন সায়মার কথা। ছাপ ছাপ রক্তে সিক্ত মা ও ফুফুর লাশ তার চোখের তারায় ভেসে উঠে। তার হৃদয় স্বজন হরানোর যন্ত্রণা ও তাদের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় ব্যাঘ্র হয়ে ওঠল। সে তার সাথীদের পরামর্শ রদ করে বললো, বন্ধুরা, আজ রুশদের বদলা নিয়েই সামনে অগ্রসর হব বলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

একজন মুজাহিদ বললো, আমাদের কাছে তো শুধু ক্লাসিনকভ, এ দিয়ে কিভাবে ওদের মোকাবেলা করবো?

আলী মৃদু হেসে বললো, বন্ধুরা! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, রাতের অন্ধকারে ওদের সবগুলোকে জাহান্নামে পাঠাবার কৌশল আমার জানা আছে। কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

অন্য মুজাহিদরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোন ভরসায় আপনি এতবড় ঝুকি নিচ্ছেন?

আলী এ কথার জবাব না দিয়ে সাথীদেরকে বল্লো, ওইখানে তিনটি গাড়ি উল্টে পড়ে আছে, তোমরা তিনজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলোর টায়ার খুলে ফেলো। আমরা অন্যান্য সরঞ্জাম জোগাড় করে তোমাদের কাছে আসছি।

মুজাহিদরা বুঝতে পারছিল না, আলী এই প্লাষ্টিকের টায়ার দিয়ে ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ির মোকাবেলা কিভাবে করবে? তবুও আদেশ অনুযায়ী তারা টায়ার খুলতে চলে যায়। আলী তার অপর সঙ্গীকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে আসে। এ গ্রামে মাত্র কয়েকটি বাড়ি। গ্রামটি খুবই ছোট। ধ্বংস করে দেওয়া গ্রামের কিছু লোক এখনও বেঁচে আছে।

আলী রাস্তার পাশে গভীর চিন্তামগ্ন এক বৃদ্ধকে দেখে এই গ্রামে কোন দোকান আছে কি না তার কাছে জানতে চাইলো। বৃদ্ধ বললেন, এ গ্রামে কোন দোকান নেই। পাশের গ্রামে ছিল। সে গ্রামটিও ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে।

আলী জিজ্ঞেস বরলো, গ্রামের লোকজন কোথায়?

বৃদ্ধ বললেন, তুমি যদি এ দেশের লোক হয়ে থাক তবে লোকজন কোথায় গেছে সেকথা তোমার অজানা থাকার কথা নয়, আমরাও চলে যাব। আর থাকবোই বা কিভাবে? আমাদের পাশের গ্রামের দোকান থেকে মুজাহিদরা সওদাপাতি কিনতো বলে আজ সে গ্রামটিও রুশীরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। প্রথমে বিমান দিয়ে বোমা বর্ষণ করেছে, এরপর ট্যাঙ্ক নিয়ে এসে পুরো গ্রাম ঘেরাও করে ফেলে। উপর থেকে নিক্ষেপিত

বোমার জ্বলন থেকে রক্ষা পাওয়া ঘরগুলোতে ওরা স্বহস্তে আগুন জ্বালিয়ে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করেছে। আল্লাহ্ জানেন, ওদের হিংস্র নখরাঘাতে কত নিষ্পাপ শিশু, অবলা নারী ও আজাদী-পাগল পুরুষ শাহাদাত বরণ করেছে। এর পূর্বে এই গ্রামের বহুলোক হিজরত করে অন্যত্র চলে গেছে।

আলী বৃদ্ধকে বললো, আমরা মুজাহিদ, বিশেষ এক কাজে আমাদের কিছু পুরনো কাপড় ও কেরোসিন তেলের প্রয়োজন।

বৃদ্ধ গ্রামের কয়েকটি ঘর থেকে পুরোনা কাপড়, কেরোসিন তেল সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

আলী তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললো, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বহু কষ্ট করেছেন। আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ করুন।

আলী ও তার সাথী তেল ও পুরোনা কাপড় নিয়ে পাহাড়ে চলে আসে। কিন্তু অপর তিন সাথী টায়ার নিয়ে তখনও ফেরেনি। তাই তারা কাপড় ও তেল রেখে অন্যদের সহযোগিতার জন্য ছুটে যায়। সবাই মিলে টায়ারগুলো খুলে পাহাড়ের চূড়ায় তুলে আনে।

সন্ধ্যার এক ঘন্টা পর আলী পাহাড়ের অপর পাশে চলে আসে। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। রুশ সৈন্যরা সারাদিন ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার পর পাহাড়ের পাদদেশে তাবু খাটিয়ে নেশায় বুদ হয়ে বিছানায় ভেংগে পড়েছে। তাদের ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়িগুলো তাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

আলী সব কিছু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর একটি উপযুক্ত ঢালু স্থান নির্বাচন করে সব টায়ার সেখানে জমা করে। এবার পুরোনা কাপড় টায়ারে পেঁচিয়ে তাতে কোরোসিন তেল ঢেলে দেয়। পেঁচানো কাপড়ে ভালো করে তেল ঢেলে সে সাথীদেরকে বললো, আমি এ গুলোতে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এই পরিস্কার সোজা ঢালু পথ দিয়ে একটি একটি করে গড়িয়ে দেবে। তারপর এখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করা চলবে না। সোজা দৌঁড়ে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলে যাবে। সেখানে বসে এর ফলাফল স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

সব টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে গড়িয়ে দেওয়ার পর মুজাহিদরা দৌঁড়ে পাহাড়ের অপর প্রান্তে গিয়ে আড়ালে বসে তাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। জ্বলন্ত টায়ারগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তেই রুশদের তাবুতে আগুন লেগে যাচ্ছে।

প্রবল হাওয়া বইছিল। দেখতে না দেখতে এক তাবু থেকে অন্য তাবুতে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। প্রচন্ড আগুন তাবুর আশেপাশে দাঁড়ানো ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়িতে লেগে গেলো। গাড়িতে রাখা গোলাবারুদ আগুনে উত্তপ্ত হয়ে প্রচন্ড শব্দে বিষ্ফোরিত হতে লাগল। রুশীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক দৌঁড়াতে ছিল। তারা কিছুই বুঝতে পারছে না যে, কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে এবং কারা করছে। এই আকস্মিক বিপদের মুকাবিলা কিভাবে করবে তা তাদের মাথায় আসছে না।

জালিম রুশদের অবস্থা দেখে মুজাহিদরা আনন্দে নেচে ওঠে।

কয়েক মিনিট পর বিকট বিস্ফোরণ শুরু হলে মনে হলো যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। আগুনে রুশদের গোলা-বারুদের গাড়ি জ্বলতে থাকলে তার মধ্যে রাখা ভারী-ভারী গোলাগুলো প্রচন্ড আওয়াজে ফাটতে শুরু করে। আগুনের আলোতে নীচের সব কিছু পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। রুশীদের তুলতুলে সাদা শরীরগুলো তাদেরই গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় উড়তে ছিলো। কয়েকজন অফিসার জীবন বাঁচাতে পাহাড়ের দিকে ছুটে আসলে আলী ও তার সঙ্গীরা সিঙ্গেল সট্ গুলি ছুড়ে ওদের পাখির মত মজা করে হত্যা করে। ওরা গুলি খেয়ে তড়পাতে তড়পাতে পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে নীচের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

হঠাৎ তারা পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পায়।

আলী ভাবলো, মুজাহিদদের কোন গ্রুপ হয়তো অপর দিক দিয়ে হামলা শুরু করেছে। তবুও সে সাথীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললো, বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। আক্রমণ করলে ওদের কাউকে জীবিত পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া যাবে না।

এ কথা বলতে না বলতেই কয়েকজন রুশ সৈন্য এদিকে হামলা চালায়।

আলী ও তার সাথীরা ক্লাসিনকভের ব্রাশ ফায়ারে তাদের ঝাঁঝরা করে দেয়।

রুশীদের পক্ষ থেকে আর কোন আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। তাদের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে। এতক্ষণে ওদের অস্তিত্ব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

কোনদিক থেকে আর কোন গুলির আওয়াজ শুনতে না পেয়ে আলী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নীচে নেমে আসে। তাবুর নিকটবর্তী এসে সে এক ধরনের সংকেত বাজালো, কোন মুজাহিদ কমান্ডার ছাড়া অন্য কেউ সে সংকেতের অর্থ বুঝতে পারবে না। অপর পাশ থেকে সংকেতের জবাব এলো।

বল্লো, তোমরা নির্ভয়ে চলে এসো।

আলী নীচে এসে মুজাহিদদের সাথে মিলিত হলো। তারা ইতিমধ্যে একশ'র মত রুশ সৈন্যকে গুলি করে মেরেছে। আর সমান সংখ্যক জীবনে বেঁচে থাকার আশায় মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আগুনে যারা পুড়ে মরেছে তাদের হিসাব তখনও করা হয়নি।

অন্য গ্রুপের মুজাহিদরা আলীকে জানালো, আমরা এদের উপর আকস্মিক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় পাহাড়ের উপর থেকে আগুনের বড় বড় কুন্ডলী রুশদের তাবুর উপর পড়তে দেখলাম। দেখতে না দেখতে সকল তাবুতে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মজুদ করা পেট্রোল ও গোলায় আগুন ধরলো। প্রাণের ভয়ে রুশ সৈন্যরা যে যেদিকে পারলো পালাতে থাকলো। আমাদের মুজাহিদরা পূর্বেই পরিখা বানিয়ে পজিশন নিয়ে বসেছিলো। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই তারা ব্রাশ ফায়ারে দুশমনদের কুপোকাৎ করছিল। বাকীরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে।

আলী এবার তাদের নিকট আগুনের কুন্ডলীর রহস্য বর্ণনা করে।

তার কৌশলের কথা শুনে স্থানীয় মুজাহিদ কমান্ডার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, যে দেশে আপনার মত সাহসী নওজোয়ান ও বুদ্ধিমান মুজাহিদ থাকবে সে দেশের মানুষকে কেউ দাসত্বের শিকল পরাতে পারবে না কোন দিন।

এর পর মুজাহিদরা মালে গনীমত জমা করলো। দু'শ অক্ষত ক্লাসিনকভ ও তিনটি ট্যাঙ্ক গনীমতে পাওয়া গেল। সতেরোটি ট্যাঙ্ক, পঞ্চাশেরও বেশী ট্রাক ও সাজোয়া গাড়ি জ্বলে নষ্ট হয়ে গছে।

স্থানীয় কমান্ডার আলীকে বললো, আমাদের কাছে নগদ অর্থ নেই, আপনারা মারকাজে চলুন, সেখানে থেকে আপনাদের গনিমতের সম্পূর্ণ অংশ আদায় করে দিব।

আলী বললো, আমাদের গনিমতের প্রয়োজন নেই। আমরা কোন ব্যক্তিস্বার্থে এ কাজ করিনি। আমাদের জরুরী কাজ আছে। খুব সকালে আমাদের বিদায় নিতে হবে।

আলীর বারবার আপত্তি সত্বেও স্থানীয় কমান্ডার আলীকে কিছু নগদ টাকা গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

রাতটি স্থানীয় মুজাহিদদের সাথে কাটিয়ে সকাল বেলা আলী তার সাথীদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। মাইল তিনেক চলার পর রাস্তায় তারা তিনজন মুসাফিরকে দেখতে পায়। তারা আলীদের দেখে পথ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে। আলী উচ্চস্বরে তাদেরকে ডেকে বলে,'আমরা মুজাহিদ, তোমাদের কোন ভয় নেই। পালাচ্ছো কেন তোমরা!'

একজন বৃদ্ধ, একজন মহিলা ও একটি শিশু আলীর ডাক শুনে ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। শিশুটি মারাত্মক আহত। তাকে কোনক্রমে বৃদ্ধ লোকটি কোলে তুলে নিয়ে আসছিলো।

আলী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা, এই বাচ্চাটি কিভাবে আহত হয়েছে। আর আপনিই বা ভয় পাচ্ছেন কেন?

বৃদ্ধ কিছুই বলছে না। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না।

আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'আমরা মুজাহিদ, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। যথাসম্ভব আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

বৃদ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর কান্না থামিয়ে সে বলতে থাকে, এখান থেকে চার মাইল দূরে আমাদের গ্রাম, যা এখন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। গতকাল ভোরে আমরা নামাজ পড়ে ঘরে ফিরছিলাম। এমন সময় আকাশে পাঁচটি রুশীবিমান দেখা গেল। বোমারু বিমান দেখে গ্রামবাসীরা নিরাপদ ব্যাংকারে পৌঁছার পূর্বেই উপর থেকে বোমাবর্ষণ শুরু হলো। এতবেশী বোমা বর্ষিত হচ্ছিল যে, অধিকাংশ লোক ঘরে রয়ে গেছে, পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়ার সুযোগও তারা পায়নি। অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা বর্ষণে সমগ্র গ্রাম

মিছমার হয়ে যায়। বিষাক্ত নাপাম বোমা এখানে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। শত শত লোক বোমার আঘাতে ঘর চাপা পড়ে শহীদ হয়ে যায়। বিমান আকাশ ছেড়ে যাওয়ার পূর্বেই গ্রাম ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা গোলা বর্ষণ শুরু করে। যখন তাদের ধারণা হল আর কেউ জিন্দা নেই, তখন তারা গোলা বর্ষণ বন্ধ করে এবং গ্রামে প্রবেশ করে ভাঙ্গা ঘর-বাড়ীর মধ্যে তল্লাসী চালায়। ওরা আহত-নিহতদেরকে এক জায়গায় জমা করে। আহতদের গর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয় এবং নিহতদের ওভাবেই ফেলে রেখে চলে যায়। আমরা যারা কোনক্রমে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে ছিলাম, সৈন্যরা চলে যাওয়া পর গ্রামে এসে শহীদদের লাশ দাফন করার জন্য ব্যস্তভাবে কবর খুড়ছিলাম। কিন্তু শহীদদের কোন লাশ তুলতেই প্রচন্ড শব্দে মাইন বিস্ফোরিত হচ্ছিলো। তাতে আরও কয়েকজন মারা যায়। এর পর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসি। আমরা জানি না যে, লাশগুলো কেন বিস্ফোরিত হচ্ছিল। লাশ বিস্ফোরিত হওয়ার ঘটনা এর আগে আর কখনও দেখিনি ও শুনিনি। শহীদদের লাশ উঠাতে আমার পুত্রও শহীদ হয়েছে, আমার নাত্নি এতিম হয়েছে। গত রাত পাহাড়ে কাটিয়ে আমরা দু'-তিনজন করে দল-বিভক্ত হয়ে রওয়ানা হয়েছি। একত্রে অনেক লোক দেখলে রুশী বিমান বোমা বর্ষণ করে সবাইকে মেরে ফেলতে পারে।

বৃদ্ধের কথা শুনে আলী আফসোস করে বল্‌লো, আমাদের কি দুর্গতি, আজ আমরা প্রিয়জনদের লাশও দাফন করার সুযোগ পাচ্ছি না!

আলী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের ওপর এত নির্যাতন কেন করা হল, আপনাদের কী অপরাধ ছিল?

আমাদের গ্রামের কিছু যুবক মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মুজাহিদরা গ্রামে আসলে মহিলারা তাদের মেহমানদারী করে, রান্না করে খাওয়ায় এবং আশ্রয় দেয়-এই হলো অপরাধ। এছাড়া আমরা অন্য কিছু করিনি।

আলী প্রথমে শিশুটির যখমের ওপর পট্টি বেঁধে দেয়। তারপর বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বলে, 'আপনাদের গ্রামে আমাদেরকে নিয়ে চলুন, আমরা শহীদদের দাফন করব।

বৃদ্ধ বললেন, না বেটা! আমি তোমাকে একাজ করতে দেব না। যে-ই লাশ ধরেছে সে-ই বিস্ফোরণে শহীদ হয়েছে।

আলী বৃদ্ধকে বুঝিয়ে বললো, আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুজাহিদ। বারুদের মাইন খুলে নিতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। বৃদ্ধ এবং আলীর সঙ্গীরা আলীকে এমন বিপজ্জনক কাজ করতে বারণ করলো। কিন্তু আলী নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। অবশেষে বাধ্য হয়ে বৃদ্ধ তাদের নিয়ে নিজ গ্রামের দিকে চললেন।

গ্রামে পৌঁছে তারা দেখলো, এখনও কিছু লোক গ্রামে রয়ে গেছে। আলীকে দেখে সবাই তার কাছে জড়ো হলো। আলী সবাইকে বললো, আপনারা পিছনে থাকুন আমি একা লাশের কাছে যাচ্ছি।

গ্রামে প্রবেশ করে আলী দেখলো, এখানে-সেখানে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারো শরীরে হাত নেই, কারো মাথা নেই, কারো পা উড়ে গেছে। গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া লাশগুলো জ্বলে খাক হয়ে গেছে। এখনো গর্তে কিছু হাড় ও পোড়া গোস্ত দেখা যাচ্ছে। গ্রামের অনেক ঘর থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছে। কোন জীবন্ত মানুষ এ বীভৎস দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারে?

তখন আলীর নিজ গ্রামের কথা মনে পড়ে। তাদের গ্রাম তো এভাবেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তার চোখে অশ্রু ছল ছল করছে। কিন্তু আলী নিজেকে সামলে নিয়ে লাশের কাছে চলে আসে।

গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধ তখন পিছন থেকে চীৎকার দিয়ে বলছিলেন, বেটা, এখনও চলে এসো, লাশের গায়ে হাত দিওনা!!

আলী কারো কথা শুনলো না। সে একটি লাশের পেটের ওপর অতি সাবধানে হাত রাখে। দেখা গেল লাশটির পেট কাটা। আলী ধীরে ধীরে কাটা জায়গা ফাঁক করে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলো যে, তারা লাশের পেটের মধ্যে একটি প্রেসার বোমা ফিট করে রেখেছে। লাশ উঠাবার সময় কিংবা লাশের উপর মাটি ঢালার সময় প্রেসার-পিনের উপর যখনই চাপ পড়বে তখনই মাইন ফেটে বিস্ফোরণ ঘটবে। এই মাইনগুলো এত শক্তিশালী যে, যারা এ লাশ উঠায় বা লাশের ওপর মাটি ঢালে তারা এর প্রচন্ড বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

আলী সাথীদের একটি থলে দিতে বলে। অতি সাবধানে পেট থেকে বোমা বের করে তার প্রেসার-পিন খুলে সবগুলো থলের মধ্যে রেখে দেয়। আস্তে আস্তে সে সকল লাশের পেট ও পিঠ থেকে বোমা বের করে নেয়। এরপর লোকদেরকে নিয়ে লাশ দাফন করার কাজ শুরু করে।

গ্রামবাসীরা এরপরও লাশ ধরতে ভয় পাচ্ছিলো এই আশংকায়, যদি কোন বোমা বিস্ফোরিত হয়!

আলী তাদেরকে অভয় দিয়ে বললো, এখন আর কোন ভয় নেই, সব বোমা বের করে নেয়া হয়েছে।

সব লাশ দাফন করার পর আলী গ্রামবাসীদের উদ্দেশ করে এক বক্তৃতা দিলো। বললোঃ 'আমার প্রিয় দেশবাসী! এই দেশে এই প্রথম গ্রাম নয় যার ওপর এত জুলুম হয়েছে। আমার নিজ গ্রামটিও ওরা এভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। আফগানিস্তানের কোন গ্রামই এই ধরনের নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি। মনে রাখবেন, আজাদীর জন্য সব কিছু কোরবানী দিতে হয়। এই গ্রামের জনসাধারণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে সেজন্যে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদেরকে জঘন্যতম জালেম, খুনী, হীন ও নিচু প্রকৃতির দুশমনের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। যখন কোথাও মুজাহিদদের হাতে তাদের পরাজয় ঘটে তখন তারা কাপুরুষের মত সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় নিরীহ গ্রামবাসীর উপর। ওরা আমাদের সন্ত্রস্ত করার জন্য এভাবে গ্রামগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। কিন্তু

আমরা পাহাড়ী সন্তান, পাহাড়ের মত অটল থেকে আমরা ওদের উচিত জবাব দেবো। তারা হয়তো জানে না যে, বোমা মেরে পাহাড় খন্ড বিখন্ড করা যায়, শরীরের রক্ত ঝরান যায়, কিন্তু আমাদের ঈমান ও হিম্মত টলাতে পারবে না-ইনশাআল্লাহ।

আমার ভাইয়েরা! এই গ্রামবাসীর কোরবানী আমাদেরকে পয়গাম দিচ্ছে যে, হয় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকো, নয় শহীদী মৃত্যুকে বরণ করো। এই শহীদদের জন্য কেঁদো না বরং এদের ছুয়ে স্বাধীনতা সুরক্ষার শপথ নাও। এদের পথই কামিয়াবী ও আত্মসম্মানের পথ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন, 'ওই লোকদের সাথে (কাফের) যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে ওদের শাস্তি দিবেন, ওদেরকে অপদস্ত করবেন এবং তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন।'

আলীর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পূর্বেই বোমারুবিমান আবার গর্জে উঠে। আলী সবাইকে নিয়ে দ্রুত পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। ওই রাতটি আলী মজলুম গ্রামবাসীর সাথে কাটিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে মনে সাহস যোগায়, তাদেরকে জিহাদে যোগদানের দাওয়াত জানায়। ফলে নওজোয়ানরা আলীর সাথেই যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। আলী তাদেরকে হেড কোয়ার্টারে গিয়ে প্রথমে ট্রেনিং গ্রহণের পরামর্শ দেয়।

পরদিন সকালে আলী তার সাথীদের নিয়ে আপন মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হয়। শহীদদের বুক থেকে তোলা পার্সোনাল বোমের থলেটি সে সাথে নেয়। একজন সাথী বললো, এই বোমার বোঝা বয়ে কি লাভ হবে? আলী বললো, 'এগুলো পথে কোথাও আমাদের প্রয়োজন হতে পারে। সময়ে এগুলো খুবই কাজে আসবে।'

এক মুজাহিদ বললো, 'যদি এগুলো রাস্তায় ফেটে যায় তবে আমরাই এর আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাব।'

আলী মুজাহিদের কথা শুনে হাসলো। তারপর তাদের বুঝিয়ে বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো অন্য কোন লাশের মধ্যে ফিট না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলি ফাটবে না। নির্ভয়ে চলো, এর দ্বারা বিপদের কোন আশংকা নেই।

সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে আলী একটি পাহাড় থেকে নীচে নামছিল। হঠাৎ কয়েকজন লোকের চাপা গুঞ্জন তার কানে ভেসে আসে। প্রথমে আলী ও তার সাথীরা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে এ লোকদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। তারপর মুজাহিদদের নিজস্ব বিশেষ ধরনের কোড সংকেত বাজায়। অপরদিক দিয়েও কোডের মাধ্যমে এর জবাব আসে যে, আমরা মুজাহিদ, নির্ভয়ে কাছে চলে এসো।

আলী সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়। গ্রুপের কমান্ডারের নাম ইবরাহীম। আলী তার কাছে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে তাদের এখানে আসার কারণও জানতে চাইলো।

কমান্ডার ইবরাহীম আলীকে জানালো, আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আগামী কাল দুশমনের কনভয় এ রাস্তা দিয়ে এসে সামনের একটি গ্রামের ওপর হামলা চালাবে। আমরা রাতের অন্ধকারের অপেক্ষা করছি। আঁধার নেমে এলে আমরা এই পথের ওপর মাইনের ফাঁদ বিছাবো।

আলী জিজ্ঞাসা করলো, এটি কত বড় কনভয় হবে বলে আপনি মনে করেন?

কমান্ডার ইবরাহীম বললো, 'তেমন বড় নয়। তারা শুধু একটি গ্রামের ওপর হামলা চালাবে। মোটামুটি কয়েকটি ট্যাংক, সাজোয়া গাড়ী এবং শ'দুয়েক সৈন্য কনভয়ে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আলী বললো, আমরা যদিও অন্য কাজের জন্য এদিকে এসেছি কিন্তু আজ রাত আপনাদের সাথেই কাটাতে চাইছি।

কমান্ডার মহানন্দে তার প্রস্তাব কবুল করেন।

আলী কমান্ডার ইব্রাহীমের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারলো, তার কাছে মাত্র কয়েকটি ট্যাংক-বিধ্বংসী মাইন আছে। সে কমান্ডারকে বললো, একটি কনভয়কে ঠেকানোর জন্য মাত্র কয়েকটি মাইন যথেষ্ট নয়। আমরা যদি মাইন বিছানোর সাথে সাথে অন্য কৌশল অবলম্বন করি, তবে অতি সহজে পুরো কনভয়ের গতিরোধ করতে পারব।

কমান্ডার ইব্রাহীম আলীর পরিকল্পনা শুনে অত্যন্ত খুশী হলো। বলতে লাগলো, আমি অবাক হই, তুমি এত অল্প বয়সে কিভাবে এতসব কৌশল আয়ত্ত করেছো! তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে আমরা তো মাইন ছাড়াই দুমশনের কনভয় প্রতিহত করতে পারব।

আলীর কথামত কমান্ডার কয়েকখানা কোদাল, কুঠার ও কয়েকজন মজদুর জোগাড় করে আনলো। একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে প্রথমে মুজাহিদরা মাইনের ফাঁদ পেতে দিল। এরপর আরও তিন মাইল সামনে অগ্রসর হয়ে মজদুরেরা একটি বড় গর্ত খুড়লো। মুজাহিদরা জঙ্গল থেকে গাছ কেটে এনে এ গর্তের ওপর বিছিয়ে তার ওপর সামান্য মাটি দিয়ে ঢেকে দিলো। উপর থেকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে, এখানে কোন গর্ত আছে। গর্ত থেকে তোলা মাটি দূরে সরিয়ে রাখা হলো।

আল্লাহ এ সময় মুজাহিদদের গায়েবী সাহায্য করলেন। গর্তের কাজ শেষ করে ক্লান্ত মুজাহিদরা উঠে আসতেই হালকা বৃষ্টি হলো। ফলে মাইন ফাঁদ ও গর্তের উপরের সকল পায়ের ছাপ মুছে পূর্বের মত সমান হয়ে যায়। কমান্ডার ইব্রাহীম সেই রাতে গ্রামবাসীদের বলে দেয় যে, তারা যেন ভোর হওয়ার পূর্বে গ্রাম থেকে বের হয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়।

ভোর হতেই দুশমনের বোমারু বিমানগুলো গ্রামের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে। বোমার আঘাতে গ্রামের ঘরবাড়ি মিছমার হয়ে যায়। কোন কোন ঘরে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। কিন্তু হামলায় কোন গ্রমাবাসী হতাহত হয়নি। তারা ভোর হওয়ার পূর্বেই গ্রাম থেকে বের হয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। আলী ও অন্য মুজাহিদ সাথীরা ফজরের নামাজ শেষ করেই রাস্তার দু' পাশের পাহাড়ে পজিশন নেয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুশমনের কনভয়ের দেখা পাওয়া যায়। ট্যাংকগুলো রাস্তার দু'পাশে এলোপাথারী গোলা বর্ষণ শুরু করে। মুজাহিদরা বড় বড় পাথরের আড়ালে পরিখায় বসে থাকায় এই গোলা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

আলী সবাইকে বলে রেখেছে যে, আমরা প্রথমে গুলি ছুড়বো না। আমাদের আক্রমণ হবে শেষে। যাতে দুশমন পালিয়ে যেতে না পারে।

কনভয়টিকে বিনা বাধায় সামনে অগ্রসর হতে দেয়া হল। প্রথম ট্যাংকটা মাইনের কাছাকাছি পৌঁছতেই মুজাহিদদের হৃদকম্পন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছিলো। দেখতে না দেখতে ট্যাংক মাইনের ওপর উঠে এল। বিকট শব্দে মাইন বিষ্ফোরিত হলো। ট্যাংক টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। সামনের ট্যাংকের দুর্দশা দেখে পিছনের ট্যাংকগুলি রাস্তার দু'পাশের পাহাড়ে এলোপাথারি গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে। অন্যান্য ট্যাংকের লোকেরা বের হয়ে মৃতদের লাশ তুলে নেয়। এরপর তারা সতর্কতার সাথে মাইন ক্লিয়ারিং মেশিন দিয়ে ভালোভাবে রাস্তা পরিস্কার করে সামনে অগ্রসর হয়। এবার গর্তের ওপর দিয়ে দ্বিতীয় ট্যাংকটি অগ্রসর হওয়ার সময় তার ওজনে কাঠের ছাদ মড় মড় করে ভেংগে পড়ে ট্যাংকটি গিয়ে গর্তের নীচে পতিত হয়। গর্তটা খোড়া হয়েছিল ঢালে। পরবর্তী ট্যাংকের ড্রাইভার সামনের ট্যাংককে গর্তের মধ্যে পড়তে দেখে কড়া ব্রেক করে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু পথ ঢালু হওয়ায় এবং ব্রেক অত্যন্ত কড়া হওয়ায় ট্যাংকটি উল্টে যায়। পর পর তিনটি ট্যাংক বিকল হওয়ায় রাস্তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সৈন্যরা সাজেয়া গাড়ী থেকে নীচে নেমে পথ পরিস্কার করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়। মুজাহিদরা এ সুযোগের অপেক্ষায়ই এতক্ষণ ওঁত পেতে বসে ছিলো। এবার অরক্ষিত সৈন্যদের ওপর তারা দু'দিক থেকে বৃষ্টির মত গুলী ছুড়তে শুরু করে। দুশমনরা নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে পাল্টা গুলী বর্ষণের পূর্বেই কয়েকডজন সৈন্য রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। মুজাহিদদের কাছে ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল না বলে তারা খুব নীচে নেমে এসে ট্যাংকের মুকাবিলা করেনি। এদিকে একটি ট্যাংক ধ্বংস ও দু'টি বিকল হওয়ায় সৈন্যরা হতোদ্যম হয়ে পালাবার চেষ্টা করে। তাদের গোলাবারুদ কমে এলে নিহত ও আহতদের গাড়ীতে তুলে পিছনে পালিয়ে যায়।

এই বিজয়ে কমান্ডার ইব্রাহীম অত্যন্ত খুশী হলো। মুজাহিদদের আক্রমণ পরিকল্পিত ভাবে সফল হওয়ায় দুশমনের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। অপরদিকে মুজাহিদরা কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই দুশমনদের হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আলী তেমন খুশী হতে পারেনি। সে এই ভেবে হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করে যে,

যদি আমাদের কাছে আধুনিক মারণাস্ত্র থাকতো, তবে কোন দুশমন আজ জীবন নিয়ে পালাতে পারতো না।

দুপুরের দিকে আলী ও তার সাথীরা কমান্ডার ওমরের মারকাজে পৌঁছে গেলো। প্রবেশ পথে দাঁড়ানো পাহারাদারকে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার পর সে তাদেরকে কমান্ডার ওমরের নিকট নিয়ে যায়।

ওমর আফগান সরকারী সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ছিলেন। রুশ সেনাদের অবৈধভাবে আফগানিস্তানে দখলদারীর পর তিনি সেনা অফিসারের পদ ত্যাগ করে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেন। প্রথম থেকেই তিনি এই মারকাজের দায়িত্বশীল। এই মারকাজের অধিনে অনেকগুলো ছোট ছোট মারকাজ রয়েছে। কমান্ডার ওমর আলীকে নিজের কাছে বসিয়ে তার খবরা-খবর নেন। তিনি বলেন, তোমার আগমনের খবর আমি ওয়ারলেসে পেয়েছি। সে অনুযায়ী আরো দু'দিন পূর্বে তোমার এখানে পৌঁছার কথা। এই দু'দিন পর্যন্ত আমি পথে তোমার কোন অনুবিধা হয়েছে কিনা ভেবে চিন্তিত ছিলাম।

আলী পথিমধ্যে সংঘটিত সকল ঘটনা তাকে খুলে বললো। যার কারণে তার এখানে পৌঁছতে দু'দিন দেরী হয়েছে।

সব কথা শুনে কমান্ডার বললেন, 'এটা ঠিক যে, তুমি পথিমধ্যে অনেক ভালো কাজ করে এসেছো। কিন্তু চীফ কমান্ডারের হুকুম তালিম করা তোমার একান্ত কর্তব্য ছিল। যা হোক, তুমি এখানে দু'দিন বিশ্রাম করার সুযোগ পেতে। কিন্তু পথিমধ্যে সে দু'দিন অতিবাহিত হওয়ায় তোমাকে কালই মারকাজে হায়দারে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। সেখানে থেকে তুমি তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। ওখানে তোমাকে জানানো হবে, কিভাবে শহরে প্রবেশ করবে এবং কোন বেশ ধারণ করবে।

আলী কমান্ডার ওমরের কথায় সম্মতি জানিয়ে রাতের বিশ্রামের জন্য এক তাবুতে চলে যায়।

রাত তিনটার সময় আলীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ শোরগোল শুনে তাবুর বাইরে এসে দেখে, সকল মুজাহিদ তড়িঘড়ি বুট-কোট পরে তৈরী হচ্ছে। মনে হচ্ছিল তারা কোন আক্রমণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আলী তাড়াতাড়ি বুট পরে হাতে ক্লাসিনকভ নিয়ে প্রথমে ম্যাগজিন চেক করলো। এর পর কমান্ডার ওমরের কাছে এসে তাকে মুজাহিদদের প্রস্তুতির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'কয়েক মিনিট পূর্বে ওয়ার্লেসের মাধ্যেমে অন্য এক গ্রুপের মুজাহিদরা খবর পাঠিয়েছে যে, রুশ সৈন্যরা তাদের মারকাজে আক্রমণ চালিয়েছে। জরুরীভাবে তারা আমাদের সাহায্য চেয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি তাদের সাহায্যে এগিয়ে না গেলে দুশমনরা মারকাজ দখল করে ফেলবে। বিলম্ব হলে ওরা সকল মুজাহিদকে শহীদ করে দিবে। মারকাজ থেকে তাদের একজনেরও বের হওয়ার কোন রাস্তা খোলা নেই।'

আলী এই যুদ্ধে কমান্ডারের সাথে যাবার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি ক্লান্ত, উপরন্তু মেহমান। আজ বিশ্রাম নাও।

আলী এর পরও তাকে সাথে নেবার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকলে অগত্যা তিনি তাকে সাথে নিতে রাজী হন।

দেড় ঘন্টা চলার পর মুজাহিদরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে একত্রিত হয়। এখান থেকে কমান্ডার ওমর যুদ্ধরত মারকাজের সাথে ওয়ালেসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু যোগাযোগ করা সম্ভব হল না। তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অথচ ভোরের আলো ফোটার পূর্বে শত্রু-বেষ্টনিতে আটকে পড়া মুজাহিদদেরকে উদ্ধার করতেই হবে। দেরী হলে তাদের সকলের জীবন বিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি আলীর হাতে ওয়ারলেস দিয়ে বললেন, তুমি চেষ্টা করে দেখো, যোগাযোগ করতে পারো কিনা।

অতঃপর সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেন, 'এই মুজাহিদরা প্রথম বারের মত আমাদের সাহায্য চেয়েছে, যদি আমরা তাদের উদ্ধার না করতে পারি তবে পৃথিবীতে কাউকে মুখ দেখানোর সুযোগ থাকবে না।'

ইতিমধ্যে আলী ওয়ারলেসে যোগাযোগ পেয়ে, সেটটি কমান্ডার ওমরের হাতে দিল। কমান্ডার ওমর প্রথমে তাদের অবস্থা এবং দুশমনের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য জেনে নিলেন। তিনি তথ্যগুলো এক টুকরো কাগজে টুকে নেন।

কথা শেষ করে একটি কাগজের ওপর টর্চের আলোর সাহায্যে নকশা এঁকে কিভাবে আক্রমণ চালানো যায় সে ব্যাপারে কয়েকজন মুজাহিদের সাথে পরামর্শে বসেন। আলীও আলোচনায় যোগ দেয়। কমান্ডার ওমর বললেন, এ মারকাজের দশজন মুজাহিদ ইতিমধ্যে শহীদ হয়েছে এবং পনেরজন গুরুতর আহত অবস্থায় আছে। বাদবাকী আঠারোজন মুজাহিদ জীবন বাজি রেখে এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সীমিত গোলাবারুদ শেষ হওয়ার পথে। বড়জোর আর এক ঘন্টা তারা লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে। মারকাজের দক্ষিণ দিকে দুশমনের সৈন্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং তারা ট্যাঙ্ক বহরের সাহায্যও পাচ্ছে। দুমশনের ধারণা, মুজাহিদরা কেবল দক্ষিণ দিক থেকে সাহায্য পেতে পারে, এজন্য তারা সেই দিকে বেশী সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। তাদের ধরণাও ঠিক। মুজাহিদদের নিকট পূর্ব দিক থেকে কোন সাহায্য পৌঁছানো সহজ নয়। কেননা ওদিকে সারি সারি পরিখায় সৈন্যরা পজিশন নিয়ে আছে। অন্য দু'দিকে দক্ষিণ দিকের তুলনায় কম সৈন্য থাকা সত্ত্বেও সেদিকে মুজাহিদদের কোন মারকাজ না থাকায় সেদিক থেকে সাহায্য পাবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। দুশমনরা এসব ভেবেই যুৎসই পজিশন নিয়েছে। উত্তর দিক হতে দুশমনরাও কোন আক্রমণ চালায়নি। তবে ঐ দিক দিয়ে আমাদের আক্রমণ করা আত্মঘাতি কাজ হবে। কেননা উত্তরে মাত্র চার মাইল দূরে রুশ সৈন্যদের ছাউনী । ঐদিক থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা সাহায্য পাবে।

দুশমনদের পরিকল্পনা হলো দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ চালানো। ফলে মুজাহিদরা উত্তর দিকে পালাবে, আর সেদিক থেকে অতি সহজে তাদেরকে গ্রেফতার করা যাবে। বাকী থাকে পশ্চিম দিক। প্রথমতঃ পশ্চিম দিক উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সৈন্যদের গুলীর পাল্লার মধ্যে । দ্বিতীয়তঃ ঐ দিকের পাহাড় একদম পরিস্কার। আড়াল নেয়ার মত কোন ঝোপঝাড় বা বড় পাথরও নেই। উপরন্তু ঐ দিকে দুশমনরা আলোর গোলা নিক্ষেপ করছে। যদি ওদিক থেকে মুজাহিদরা পালাবার চেষ্টা করে তবে তাদের ওপর বোমার সাথে সাথে গুলীও বর্ষণ করা হবে। অতএব এদিক থেকে হামলা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই এদিকটা বাদ দিয়েই আমাদেরকে চিন্তা করা উচিত। কেননা, এদিকের পাহাড়গুলোও খাড়া। আমরা সংখ্যায় মাত্র ষাট জন। অপরপক্ষে কেবল দক্ষিণ দিকেই দুশমনের সংখ্যা পাঁচ থেকে সাত শ'র মত। এখন আপনারা বলুন, কিভাবে আক্রমণ চালালে ভালো হবে?

বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের পরামর্শ দিল।

অবশেষে আলী বললো, আপনাদের চেয়ে এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম, তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়. আমার সবাই এক দিকে হামলা না করে চল্লিশজন মুজাহিদ দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ চালালে ভালো হয়। বাকী বিশজন উত্তর দিকের পোষ্টের ওপর আক্রমণ করলে আটকে পড়া মুজাহিদরা বের হয়ে আসার রাস্তা তৈরী করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু বিশজন মুজাহিদ নিয়ে উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করা তো আত্মহত্যার সামিল। কম করে হলেও দুশমনের একশ' সৈনিক সেখানে অবস্থান নিয়েছেঃ বল্‌লেন কমান্ডার ওমর।

আলী এর জবাবে বললো, দুশমনরা অবশ্যই ধারণা করছে, উত্তর দিক থেকে মুজাহিদরা কোন অবস্থায় আক্রমণ করার ঝুঁকি নেবে না। আর এদিক থেকে এবং দক্ষিণ দিক থেকে একযোগে আক্রমণ চালালে শত্রু সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়বে। তারা আমাদের সীমিত শক্তি সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ কোন ধারণা করতে পারবে না এবং ওরা অবশ্যই আমাদের বহুমুখী আক্রমণে হতবাক হয়ে পড়বে। এই সুযোগে আমরা দ্রুত মারকাজের মুজাহিদদের বের করে আনতে সক্ষম হব বলে আশা করি।

আলীর পরামর্শের ব্যাপারে কমান্ডার সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, আলীর পরামর্শ অনুযায়ী আক্রমণ রচনা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও আত্মঘাতি হলেও এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তবে মুজাহিদরা ফিরে আসার পথে যদি পূর্বদিক থেকে দুশমনরা গুলী বর্ষণ করে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে!

আলী বললো, ফেরার সময় রুশ সৈন্যরা পূর্ব দিক থেকে গুলী চালাবে না। কেননা আমরা আক্রমণ চালালে উত্তরের সৈন্যরা পূর্বদিকে পালাবে। এ সময় যদি রুশ সৈন্যরা ফায়ার করে তবে এতে তাদের লোকই বেশী মারা যাবে।

কমান্ডার সাহেব আলীর কথা শুনে বললেন,'তুমি যদিও এখনও ছোট কিন্তু আল্লাহ তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি দিয়েছেন। সেনা অফিসার হওয়া সত্ত্বেও আমার মাথায় এবুদ্ধি আসেনি। আমি আশা করি, যেহেতু এই পরিকল্পনা তোমার, তাই, তুমিই সবচেয়ে উত্তমরূপে তা বাস্তবায়িত করতে পারবে। আমি বিশজনের বদলে ত্রিশজন মুজাহিদ তোমার সাথে দিচ্ছি। বাকী ত্রিশজন নিয়ে আমি দক্ষিণ দিকে সৈন্যদের ব্যস্ত রাখব। তবে খেয়াল রেখ, নিজেদেরকে মারাত্মক বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ কর না।'

আলী জবাবে বল্‌লো, 'আমার ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করায় খুশী হয়েছি। সবার নিকট দোয়া চাই। ইনশাআল্লাহ আমি সকল মুজাহিদকে সহি-সালামতে উদ্ধার করবই। আমাকে একটি ওয়ারলেস সেট দিন, যার দ্বারা মারকাজে আটকে পড়া মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি।

কমান্ডার তাকে ওয়ারলেস দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাকে কামিয়াব করুন।

আলী আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হল। পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল। পদে পদে বিপদ। দু'জন মুজাহিদ প্রথমে সামনে অগ্রসর হয়ে পথ পরিস্কার কিনা তা জানানোর জন্য বিশেষ আওয়াজ দিলে অন্যরা অগ্রসর হয়। সামনে অগ্রসর হয়ে তারা একটি পাহাড়ী শুষ্ক নালার পাশে এসে দাঁড়ায়। সেখানে প্রচুর ঝোপ-ঝাড় থাকায় আলী সবাইকে তার আড়ালে বসিয়ে মাত্র তিনজন মুজাহিদ সাথে নিয়ে পোস্টের দিকে অগ্রসর হয়। একটু অগ্রসর হওয়ার পর পোস্টের তাবু দেখতে পায়। একটি তাবুর মধ্যে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। আলী সাথীদেরকে বল্‌লো, তোমরা ক্রোলিং করে সামনে অগ্রসর হয়ে দুশমনের কাছে গিয়ে তাদের পজিশন সম্পর্কে অবহিত হয়ে এসো। সে নিজেও ক্রোলিং করে তাবুর দিকে অগ্রসর হল। একটু অগ্রসর হয়ে দেখলো, যে তাবু থেকে আলো আসছে তার পিছনে আরও অনেক তাবু। ঐ তাবুর সামনে একজন সশস্ত্র রুশী পাহারা দিচ্ছে। যার অর্থ দাঁড়ায় ঐ তাবুতে অবশ্যই কোন অফিসার আছে।

আলী ভাবলো, যদি ঐ রক্ষীকে অপহরণ করা যায় তবে দুশমনদের সকল পরিকল্পনা জানা যাবে। কিন্তু অপহরণ করা তো সহজ নয়। যদি তখন হৈ চৈ পড়ে যায়, তবে সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। এরপর তার মাথায় নতুন চিন্তা আসে যে, সারা রাত পাহারা দেওয়ায় রক্ষী অত্যন্ত ক্লান্ত। আর তাবুর ভিতরে অফিসার মদের নেশায় অবশ্যই বেহুঁশ হয়ে শুয়ে আছে। রক্ষীর আশেপাশে অন্য কোন পাহারাদার নেই। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হলেও আলী প্রথমে রক্ষীকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

এবার ক্রোলিং করে সে রক্ষীর খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। রক্ষী আধো ঘুমে ঢুলছে। আলী পিছন থেকে এসে এক হাত তার মুখের ওপর চেপে রেখে অন্য হাতে ধরা পিস্তলের বাট দিয়ে রক্ষীর মাথায় সজোরে আঘাত করলো। আঘাত খেয়েই রক্ষী বেহুঁশ। আলী তাকে টেনে নালার মধ্যে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে অপর মুজাহিদরাও অনুসন্ধান শেষে ফিরে এসেছে। আলী রক্ষীর হুঁশ ফিরিয়ে আনার জন্য মাথায়-ছোখে পানির ছিটা দেয়ায় অল্পতেই তার হুঁশ ফিরে আসে। হুঁশ ফিরতেই সে নিজেকে মুজাহিদের মধ্যে

দেখে ঘাবড়ে যায়। আলী তাকে অভয় দিয়ে বললো, যদি তুমি আমাদেরকে তোমাদের পরিকল্পনার কথা খুলে বল তবে তোমাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া হবে না। যদি গাদ্দারী কর তবে জীবনে মেরে ফেলা হবে তোমাকে।

রক্ষী বললো, 'যদি আপনারা আমাকে প্রাণে না মারেন তবে আমি সর্বোতভাবে আপনাদের সহযোগিতা করব। রুশ সৈন্যদের প্রতি আমার মনেও প্রচন্ড ঘৃণা জন্মেছে।

সে রুশ ও আফগান সরকারী সৈন্যদের পজিশনের কথা বলে দেয়। আলীর পাঠানো অনুসন্ধান গ্রুপও প্রায় একই রূপ তথ্য জানালো। যাতে বুঝা গেল, রক্ষী ধোঁকা দেয়নি। যতদূর তার জানা ছিল ঠিক ঠিক বলেছে। আলী রক্ষীকে আরো প্রশ্ন করে জানতে পারলো, এই দিক থেকে আক্রমণের কোন আশংকাই তারা করেনি। এ পাশে সেনা সংখ্যা একশ'রও কম। একজন আফগান আফিসার এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কোন আক্রমণের আশংকা না থাকায় সৈন্যদের পরিখায় বসিয়ে অফিসার তাবুতে ঘুমাচ্ছে। তাদের পরিকল্পনা ছিল, দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণের পর মুজাহিদরা উত্তর দিকে চলে আসবে এবং ভোর হলেই তারা মুজাহিদদের গ্রেফতার করবে।

আলী মুজাহিদদের তিন গ্রুপে ভাগ করল। পাঁচ মুজাহিদ বিশিষ্ট গ্রুপকে দায়িত্ব দেয়া হল, শত্রুপক্ষের ট্রাক দখল করে সাথে সাথে এই খাদের পাশে নিয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র তাতে তুলে ফেলবে। দশ মুজাহিদ বিশিষ্ট গ্রুপের দায়িত্ব হলো শত্রুদের তাবুতে আগুন জ্বালানোর পর গোলাবারুদের ডিপোতে আগুন লাগানো। নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থেকে আগুন লাগানোর পর তারা পূর্ব দিক হতে আক্রমণকারী শত্রুদের পথ আটকাবে, যাতে কোনোভাবেই মুজাহিদরা শত্রুদের বেষ্টনীতে আটকা না পড়ে।

উভয় গ্রুপ রওয়ানা হয়ে গেলে আলী ওয়ারলেসে আটকে পড়া মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করে বললো, আপনি উত্তর দিকের ঘেরাও হতে বের হওয়ার চেষ্টা করুন।

অবরুদ্ধ কমান্ডার বললেন, এদিক থেকে তো আমাদেরকে বন্দী করার জন্য শত্রুরা ওঁৎপেতে বসে আছে।

আলী আবার বললো, আপনি মুজাহিদদের নিয়ে এদিকে আসার জন্য প্রস্তুত থাকুন। দশ মিনিট পর আপনি রাস্তা বাধামুক্ত পাবেন এবং দেখতে পাবেন, দুশমন পূর্ব দিকে পলায়ন করছে। শত্রু এখন আমাদের বেষ্টনির মধ্যে। এখন আপনাকে এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারছি না, সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

অবরুদ্ধ কমান্ডারের সাথে কথা শেষ করে বাকী পনেরজন মুজাহিদ নিয়ে আলী শত্রুদের পরিখার দিকে রওয়ানা হলো। সে খুব ধীরে ধীরে চলছিলো, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগে শত্রু সৈন্য তাদেরকে দেখে না ফেলে।

অন্ধকার কমতে শুরু করেছে, অল্প সময়ের মধ্যে যদি অপারেশন কামিয়াব না হয় তাহলে অবরুদ্ধ মুজাহিদদেরকে হয়ত আর বাঁচানো যাবে না। তাই খুব সতর্কতার সাথে

আলীর সাথীরা পা ফেলছে। বন্দী সৈন্যকে দশজন মুজাহিদের সাথে পাঠানো হয়েছিল, যাতে সে ওই মুজাহিদদের সহযোগিতা করতে পারে। ওই গ্রুপকে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছিলা যে, তাবুতে কোন সৈন্যকে পাওয়া গেলে তাকে যেন জীবন্ত ছেড়ে দেয়া না হয়। কেননা সেনাদের বন্দী করা হলে তাদের পাহারা দেয়ার মত পর্যাপ্ত লোক আমাদের নেই।

আলী ও তার সঙ্গীদের অর্ধেকের বেশী পাহাড়ে আরোহণ করল। দুশমনের পরিখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অল্প ব্যবধানে গাছ ও পাহাড়ের আড়ালে তারা অবস্থান নেয়। পরিখাগুলোতে রকেট হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাবুতে আগুন লাগানোর পর এ আক্রমণ শুরু হবে। আলীর দৃষ্টি তাবুর সারিতে নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত পর সে দেখতে পেল, সমস্ত তাবু হতে দাউ দাউ অগ্নিশিখা উপর দিকে ঠিকরে উঠছে। নালার দিকেও শত্রুদের ট্রাক যেতে দেখল সে। ওদিকে অস্ত্রের ডিপোতে আগুন লাগার কারণে প্রচন্ড বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেছে।

আলী এতক্ষণ এ মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় ছিল। সে তার সঙ্গী মুজাহিদদের নিয়ে পাহাড় কেটে তৈরী করা শত্রু পরিখার উপর রকেট হামলা শুরু করে দেয়। কমিউনিস্ট সেনারা এখানে এরূপ প্রচন্ড হামলার মুখোমুখি হওয়ার কথা চিন্তাও করেনি। মুজাহিদদের সংখ্যাও ছিল তাদের নিকট অজ্ঞাত। তাই পাল্টা আক্রমণ করার পরিবর্তে তারা উদ্ধর্শ্বাসে ভাগতে লাগল এবং আলীর ধারণা মতে তারা পূর্বদিকে ছুটতে লাগল। আলী ওয়ারলেসে যোগাযোগ করে অবরুদ্ধ কমান্ডারকে তৎক্ষণাৎ রাস্তা পরিষ্কার হওয়ার কথা জানিয়ে দেয় এবং সে সামনে অগ্রসর হয়ে কমিউনিস্ট সেনাদের তৈরী করা পরিখা দখল করে নেয়।

কিছুক্ষণ পর শহীদ এবং আহতদের নিয়ে আটকে পড়া মুজাহিদরা আলীর দখলকৃত পরিখায় পৌঁছলে আলী তাদের বললো, আপনারা জলদি করে নীচে খাদের পাশে চলে যান, সেখানে আমাদের পাঁচজন মুজাহিদ রয়েছে। আমরা এখানে থেকে আরও দশ মিনিট দুশমনের মোকাবেলা করব, এরপর আমরা ফিরে যাব। জলদি করুন, দুশমন আমাদের পিছু হটার কথা জানতে পারলে পশ্চাৎদিক হতে আক্রমণ করতে পারে।

পলায়নরত রুশ সেনাদের অনেকে নিহত হলো। রকেটের আঘাতে নিহত সেনাদের লাশ পরিখার মধ্যেই পড়ে ছিলো। আলী যখন নিশ্চিত হলো যে, অবরুদ্ধ মুজাহিদ গ্রুপ নালায় পৌঁছে গেছে আর দুশমনও তাৎক্ষণিকভাবে কোন পাল্টা আক্রমণ করতে পারছে না, তখন সে বিশেষ সংকেত দ্বারা দশ মুজাহিদ বিশিষ্ট গ্রুপকে নালায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পরিখায় পড়ে থাকা দুশমনের অস্ত্রগুলো নিষ্ক্রিয় করতে থাকে।

সাথে করে প্রেসারবোমা আনার কথা আলী ভুলেনি। সে পাহাড়ে দুশমনের পড়ে থাকা কয়েকটি লাশের পেট কেটে তাতে প্রেসার বোম ফিট করে রাখে। এরপর পাঁচ জন ছাড়া সব মুজাহিদকে ফিরে যেতে বলল। এ পাঁচ মুজাহিদের দায়িত্ব ছিল শত্রু পক্ষের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখা। মজার কথা হল, এ পর্যায়ে দুশমনের

তোপ দ্বারাই তাদের উপর গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল। মুজাহিদরা যেগুলি ধ্বংস না করে রেখে দিয়েছিল।

আলী বাকী পাঁচজন মুজাহিদকে নিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে চললো এবং নালায় পৌঁছে সে সমস্ত মুজাহিদকে বললো, আপনারা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করুন। তবে নালার উপর দিয়ে কেউ যাবেন না, কারণ, হয়ত শত্রুরা নালার মধ্যে মাইন পুঁতে রেখেছে। যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরে যেতে হবে।

আলী ও অন্যান্য মুজাহিদরা যখন পাহাড়ের মধ্যখানে পৌঁছলো অমনি দুশমনের যুদ্ধবিমানগুলো তাদের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে দেয়। দ্রুত মুজাহিদরা পাথর আর বৃক্ষের আড়ালে লুকাতে থাকে। দুশমন হয়ত মুজাহিদদেরকে দেখেনি, তাই একটু দূরে দাঁড় করানো খালি গাড়ীগুলোর ওপর বিমান বোমাবর্ষণ করতে থাকে। কয়েকটি বোমা এসে মুজাহিদদের নিকট পড়ে। এতে দু'জন মুজাহিদ শহীদ হয়। বোমাবর্ষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আলী বললো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে পৌঁছতে চেষ্টা করুন। কারণ, এদিকে গাছপালা খুব কম, এ অবস্থায় যদি দুশমনের জঙ্গী কপ্টার এসে পড়ে তাহলে আমাদের আত্মরক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়বে। পাহাড়ের অপর দিকে ঘন ঝোপঝাড়, ওখানে আত্মগোপন করার সুযোগও অনেক।

আলী ও অন্যান্য মুজাহিদরা শহীদ ও আহতদের নিয়ে মারকাজে পৌঁছলো, তখনও কমান্ডার উমর এসে পৌঁছেননি। অবরুদ্ধ মুজাহিদ কমান্ডার আলীর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করে বললো যে, এমন অবরোধে আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু তোমাদের আবিশ্বাস্য নৈপুণ্যের ফলে আল্লাহপাক আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখনও আমার মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি। কথা প্রসঙ্গে তিনি আরো বললেন, পরিখা হতে তোমাকে পাহাড়ের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে ভেবেছিলাম, কমান্ডার অন্য কেউ হবে। কারণ, তোমাকে এখনও কিশোর মনে হচ্ছে। আমি সীমাহীন আনন্দিত যে, আমার কওমের মাঝে তোমার ন্যায় বাহাদুর ও বিচক্ষণ যুবক রয়েছে। আমার এক ছেলে ছিল তোমারই বয়সের, সে গত বৎসর শহীদ হয়েছে।

মুজাহিদরা সবাই ক্লান্ত, নিদ্রার আবেশে তাদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিলো। শহীদ ও আহতদের জন্য সবাই ব্যথিত, কিন্তু এই বিয়োগ-বেদনা তো এখানের নিত্যদিনের ব্যাপার। উপরন্তু সকলে ক্লান্ত। আহতদের ব্যান্ডেজ করে সবাই নাস্তা সেরে শুয়ে পড়লো।

ঘুম থেকে মুজাহিদরা যখন ওঠলো তখন যোহর নামাজের সময় হয়ে এসেছে প্রায়। কমান্ডার ওমর এখনও এসে পৌঁছেননি। আলী তাই ভাবছিলো, কমান্ডার উমরকে তাদের ফিরে আসার সংবাদ দেয়ার জন্য কয়েকজন মুজাহিদ পাঠাবে। এর মধ্যে এক মুজাহিদ বললো যে, কমান্ডার উমরসহ অন্যান্য মুজাহিদরা ফিরে আসছে। কমান্ডার উমরের অভ্যর্থনার জন্য সব মুজাহিদ বেরিয়ে আসে, পুরা মারকাজ তাকবীর নিনাদে গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। কতক মুজাহিদ ক্লাশিনকভের ফায়ার করে আনন্দ প্রকাশ করলো।

কমান্ডার উমর আলীকে দেখেই নিঃসীম কৃতজ্ঞতায় বুকে টেনে নিলেন এবং সাবাস দিলেন। এরপর অবরুদ্ধ থাকা মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে মুসাফাহা করে কুশল বিনিময় করলেন।

কমান্ডার উমর আলীর কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট জেনে আলীকে বললেন যে, তোমাকে এদিকে পাঠিয়ে আমি দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করতে ছিলাম , তিনি যেন তোমাকে সুস্থ ও সহীহ-সালামতে ফিরিয়ে আনেন। আমরা এখান থেকে গিয়েই শত্রুর উপর আক্রমণ করি, তারা যেহেতু এদিক থেকে আক্রমণের আশংকা করছিল তাই দুশমনের জবাবী গোলা সোজা আমাদের উপর পড়তে লাগলো। এতে প্রথম পাঁচ মিনিটেই পাঁচজন মুজাহিদ শাহাদত বরণ করে। এরপর আমরা অবস্থান পরিবর্তন করলাম। আল্লাহর রহমতে এরপর আর কোন ক্ষতি হয়নি। সূর্য উঠার সময় হয়ে এলো, ভোরের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। তখন দুশমনের পজিশন নির্ণয় করে আমাদের গোলা ঠিক জায়গায় পড়ছে কিনা তা দেখার জন্য এক মুজাহিদকে পাহাড়ের চূড়ায় পাঠিয়ে দিলাম।

উক্ত মুজাহিদ নীচে এসে বললো, ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া বহর নিয়ে দুশমন পিছু হটে যাচ্ছে। কথাটা আমার বিশ্বাস হল না, তাই দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। দুরবীন লাগিয়ে দেখলাম, দুশমন ভাগছে। আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার সিদ্ধান্ত নিলাম, কিন্তু এমন সময়ে বোমারুবিমান এসে যাওয়াতে অগত্যা আমাদের পিছিয়ে আসতে হলো। বোমারুবিমান লাগাতার পাহাড়ের উপর বোমাবর্ষণ করতে থাকে। আমাদের নিকট বিমান-বিধ্বংসী কোন তোপ ছিল না। আর থাকলেও আমরা কিছু করতে পারতাম না। কারণ বিমানগুলো খুব উঁচু থেকেই বোমাবর্ষণ করছিলো। এজন্য ফিরে আসতে আমাদের দেরী হয়েছে। তবে তোমার এ নিপুণ দক্ষতা চিরকাল আমার হৃদয়পটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

হায়দার মারকাজের দিকে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আলী দাঁড়িয়ে ছিলো। এমন সময় দলত্যাগী দু'জন আফগান সেনা এসে উপস্থিত হয়। তারা বললো, গতকাল ভোরে আপনারা যখন কমিউনিস্টদের ওপর হামলা করেন, তখন অফিসাররা ধারণা করে যে, বড় কোন মুজাহিদ দল তাদের ঘেরাও করার চেষ্টা করছে। কারণ, উত্তর দিক হতে কেউ আক্রমণের আশংকাই করেনি। এ কারণে উত্তরদিক হতে আক্রমণ শুরু হওয়ায় কমিউনিস্টদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তারা দেখলো, তাবুতে আগুন লেগেছে, পরিখার উপর একের পর এক গোলা এসে বিস্ফোরিত হচ্ছে। সবাই জীবন বাঁচাতে ভাগতে শুরু করে। ছাউনির দক্ষিণে অবস্থিত সেনাদেরকে পিছু হটার নির্দেশ দেয়া হলো। বড় কোন আক্রমণ হচ্ছে না দেখে দ্বি-প্রহরের দিকে সৈন্যরা আবার ছাউনিতে ফিরে এলো। তারা ভাবতে লাগলো, মুজাহিদদের সংখ্যা যদি বেশী হয় আর যেভাবে তারা আমাদের ঘেরাও করেছিলো, তাহলে আমরা ছাউনী রক্ষা করতে পারতাম না, এবং মুজাহিদরা অবশ্যই আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করত। আসরের সময় যখন তারা সংবাদ

পেল যে, মুজাহিদরা পরিখা ত্যাগ করে ফিরে গিয়েছে, সবাই আবার চিন্তায় পড়ে গেল। তাদের ধারণা ছিলো, উত্তরদিক হতে কমপক্ষে হলেও এক হাজার মুজাহিদ হামলা করেছে। পূর্বদিকের সৈন্যরাও যখন খবর পেলো যে, মুজহিদরা উত্তর দিকেও হামলা করেছে, তখন তারা সকলে অস্ত্র ফেলে ভাগতে শুরু করলো।

সন্ধ্যার দিকে ট্যাঙ্ক এবং সাজোয়া গাড়ী সাথে নিয়ে এক বিশাল ফৌজি কনভয় তাদের লাশ তুলে নিতে আসে। অস্ত্রশস্ত্র ঠিকঠাক মত দেখে তারা হয়রান হয়ে যায়। এবার সৈন্যরা উত্তর দিকের পাহাড়ের লাশ উঠাতে শুরু করলে সেগুলো প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হতে থাকে। এতে আরো কিছু সৈন্য নিহত হয়। এরপর আর লাশ না উঠিয়েই তারা ফিরে গেলো। আমরা দু'জন মুজাহিদের সাথে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তাই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম। রাতটা ঝোপের মধ্যে কাটিয়ে ভোরেই এদিকে হাটতে থাকি, কোন মুজাহিদের দেখা মিলে কিনা এই আশায়, তাহলে মুজাহিদদের মারকাজে পৌঁছা সহজ হয়ে যাবে। এমন সময় দু'জন মুজাহিদ আমাদের বন্দী করে।

সৈন্যদের কথা শুনে মুজাহিদদের মনে অত্যন্ত আনন্দ লাগলো। আল্লাহ পাক আমাদের সাহায্য করেছেন, যার ফলে ত্রিশজন মুজাহিদকে শত্রুরা এক হাজার মনে করে ভেগে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ফেরেশতা দিয়ে সাহার্য্য করেছেন। এত সুযোগের পরও তাদের ফেলে যাওয়া গোলা বারুদ নিয়ে আসতে পারলাম না, আমরা কেমন ভীরু!

এ কথাগুলো আলী কমান্ডার উমর এর কাছে বললে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য না হলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না।

কমান্ডার ওমর বলেন, কিন্তু লাশ বিস্ফোরিত হওয়ার বিষয়টি আমার বোধগম্য হচ্ছে না, এটা আবার কোন গোলকধাঁধা?'

আলী অপারেশনে যাওয়ার সময় সাথে করে প্রেসারবোমা নেওয়ার কথা কমান্ডার উরমকে জানালো এবং বললো, ওগোলই ওদের কলিজার কাছে রেখে এসেছিলাম।

আলী যখন হায়দার মারকাজে পৌঁছলো, তখন এশার নামাজের সময় হয়ে গেছে। মারকাজের প্রধান হলেন মুহাম্মদ হানীফ খান। তিনি নিজ গোত্রেরও প্রধান। তাঁর গোত্রের শতাধিক মুজাহিদ জিহাদে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ মারকাজ তেমন বড় নয়, এখানে মুজাহিদদের সংখ্যা মাত্র জনাচল্লিশের মত। এখানে মোট চারটি গুহা।

গুহার সামনে খুব গভীর নালা, এতে সব সময় পানি থাকে। নালার অপর পাশে উঁচু বড় বড় গাছের সারি। ফলে দুশমনের হামলা হতে ছাউনি যথেষ্ট সুরক্ষিত বটে।

কমান্ডার হানীফ খানের ধারণা ছিলো, গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে যে লোকটি আসছে তিনি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক কোন মুজাহিদ হবেন। কারণ, হেড কোয়ার্টার হতে কোন ব্যক্তিকে পাঠানোর অর্থই হল কাজটা এমন যা আমরা করতে পারবো না। তাই আলীকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন যে, ষোল-সতের বৎসরের একটি যুবক গারদেজ গিয়ে করবে টা কি? কিন্তু সঙ্গী মুজাহিদের কাছে তিনি যখন আলীর নিপুণ কর্ম-কুশলতার বিবরণ শুনলেন তখন তার বিস্ময় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলো এবং এ কথা ভেবে তিনি আনন্দিত হলেন যে, আফগানিস্তানে এরূপ দক্ষ মুজাহিদদেরও অস্তিত্ব রয়েছে!

আলী তিনদিন এ মারকাজে অবস্থান করে গারদেজ শহর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলো, পথঘাটের বিবরণ নিয়ে চতুর্থ দিন গারদেজ শহরের দিকে রওয়ানা হলো। হানীফ খান যাওয়ার সময় তাকে বললো, এখনও তুমি ছোট, আবেগের বশবর্তী হয়ে সেখানে কোন কাজ করবে না, সব কাজে সুচিন্তিতভাবে হাত দেবে।

শহরে পৌঁছে আলী এক হোটেলে বসে চা পান করছে। এমন সময় সে একটা পরিচিত চেহারা হোটেলে প্রবেশ করতে দেখে। চেহারাটা তারই গ্রামের নূর মোহাম্মদ নামে এক যুবকের। সে-ও প্রথম দৃষ্টিতে আলীকে চিনতে পারলো। আলী ও নূর মুহাম্মদ একই স্কুলের সহপাঠি ছিলো। তবে সে আলী থেকে ছয় বৎসরের বড়।

উভয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরে কোলাকুলি করে হোটেলের এক কোনায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলো। নূর মুহাম্মদ আলীকে বল্লো, মনে করেছিলাম, গ্রামের অন্যান্য লোকদের ন্যায় তুমিও বুঝি শহীদ হয়ে গিয়েছো। এখন তোমাকে জীবিত দেখে আমার খুব খুশী লাগছে। আমাদের গ্রামের কম লোকই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পেরেছিলো। মাঝে মাঝে একথা ভেবে আমার মনটা খুব বেদনাহত হয়ে উঠে, রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে দখলদারীত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশের পরিবেশ কত সুন্দর ছিলো, ফল-ফলাদীর বৃক্ষ, শ্যামলিমায় ঢাকা আকাশচুম্বী পাহাড়-পর্বত আর মিষ্টি পানির ঝর্ণার মানোরম দৃশ্যে মন দুলে উঠত সীমাহীন আনন্দে। গ্রামবাসী তখন কত সুখে ছিলো, কত মমত্ববোধ ছিলো পরস্পরে। সবাই সবার দুঃখে ব্যথিত হতো, রোযার মাস আসলে ধুম-ধামের সাথে রোযা আর ঈদ পালিত হতো। পাহাড়ের উপর বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি পড়তো তখন আমরা খেলতাম, লুটোপুটি খেতাম। আর বসন্ত কালে পাহাড়ের কোলে বন্য ফুলগুলো বাতাসে দুলতো, সে দৃশ্যগুলি কতই না মনোমুগ্ধকর ছিল। কতো আনন্দের ছিলো সে দিনগুলো। হঠাৎ করেই যেন কি হয়ে গেলো, লন্ড ভন্ড হয়ে গেলো সব। আনন্দের সে গুলিস্তান আজ বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে, ফুলকলিরাও আর পাহাড়ের কোলে ফুটে না, চোখ শুধু পোড়ামাটি দেখছে, বাতাসে ভেসে আসছে শুধু বারুদের গন্ধ।

কথা বলতে বলতে নুর মুহাম্মদ হঠাৎ চমকে উঠে নিচু গলায় বললো, দোস্ত! ভাবাবেগে আমি তোমার কাছে যা বলে ফেলেছি, তা যেন আর কেউ জানতে না পারে।

আফগানিস্তান এখন আর মুক্ত-স্বাধীন নয়, এ সব আলোচনা সমিচীন নয়-সেকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ ছয় বৎসর পর আমার গ্রামের লোকদের মধ্যে কেবল তোমার সাথেই সাক্ষাত হলো, তাই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারিনি।

আলী বললো, আমার সাথে নির্ভয়ে কথা বলতে পারো, আমি সরকারী গুপ্তচর নই। গ্রামে আক্রমণের পূর্বেই আমি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। বলতো ভাই নুর মুহাম্মদ, আমি চলে আসার পর আমার প্রিয় গ্রামের ওপর কী দুর্যোগ নেমে এসেছিল! গ্রামবাসীদের একত্রিত করে তাদের ওপর রুশ বাহিনীকে গুলি করতে দেখেছি। এরপর কি হয়েছে তা জানি না।

এ হোটেলটা নিরাপদ নয়। এর মালিক রুশী চর, চল অন্য কোথাও গিয়ে আলাপ করি।

নূর মুহাম্মদ আলীকে নিয়ে অন্য এক হোটেলে ঢুকে এক কোনায় গিয়ে বসলো। এরপর বলতে শুরু করলো, রুশ বাহিনী ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া গাড়ী নিয়ে গ্রাম ঘিরে ফেলে, অল্প লোকই তোমার ন্যায় ঘেরাওর পূর্বে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো। বোমারু বিমানের হামলায় পুরো গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। এরপর রুশ বাহিনী ট্যাঙ্কের গোলা বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসলে পুরুষরা অটলভাবে তা প্রতিরোধ করে। ট্যাঙ্ক আর সাজোয়াযানের ভিতর থেকে সৈন্যরা বের হলে আমরা গুলি করে কিছু সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠাই, বাকীরা ভীত হয়ে আবার ট্যাঙ্কের ভিতর আশ্রয় নেয়। ক্রমে ক্রমে আমাদের গোলা-বারুদ নিঃশেষ হয়ে গেলো। রুশীরা এবার গ্রামের মেয়ে, পুরুষ ও শিশু সবাইকে বন্দী করে এক জায়গায় জমা করে। এরপর আহতদেরকে পৃথক করে মাটিতে ফেলে তাদের উপর ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেয়। আগুন জ্বালিয়ে লাশগুলি তার মধ্যে নিক্ষেপ করে। আমার আব্বার এক বন্ধু ছিল সেনা অফিসারদের মধ্যে। তাকে অনুরোধ করায় তিনি আমাদের ঘরটা পোড়ান থেকে বিরত থাকেন। উক্ত সেনা অফিসার আমাকে সাথে নিয়ে এসে ইন্টেলিজেন্সে ভর্তি করিয়ে দেন।

নূর মুহাম্মদ ইন্টেলিজেন্সের লোক, এ কথাশুনে আলীর চৈতন্য হয়।

নূর মুহাম্মদ কথা প্রসঙ্গে বললো, তুমি কোন ভয় করো না, আমি আজ পর্যন্ত নিরাপরাধ ব্যক্তির ক্ষতি করিনি। আফগান সরকারী ইন্টেলিজেন্স জনগণের ওপর কি জঘন্য অত্যাচার করে, তা আমার জানা আছে। আমার পক্ষ থেকে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। আচ্ছা বলতো, আজ-কাল তুমি কি করছো আর গারদেজেই বা কি উদ্দেশ্যে এসেছো?

আলী এখানে তার আসার উদ্দেশ্য বলেই ফেলতো, কিন্তু যখন জানতে পারলো, নূর মুহাম্মদ ইন্টেলিজেন্সের লোক, তখন সে নিজের ব্যাপারে কিছু বলাটা অনুচিত মনে করে বললো যে, আমি গারদেজ দেখতে এসেছি।

তুমি এতদিন কোথায় কি করছিলে?

আলী চিন্তায় পড়ে গেলো, তাকে কি বলবে। একটা কারণ না বল্লে তো নয়, সত্য কথাটা প্রকাশ করাও অসম্ভব, আবার মিথ্যাও বলা যায় না। অনেক ভেবে-চিন্তে সে বললো, নূর মুহাম্মদ ভাই! বয়সে আমার চেয়ে তুমি বড়, সব তুমি বুঝ। তাই একজন গৃহহারা মানুষ কোথায় থাকে কি করে তা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়। পাহাড়ী অঞ্চল আর শহর-বন্দর নিয়েই তো আফগানিস্তান। আগে ঘুরে বেড়াতাম পাহাড়ে-পর্বতে, এখন এই শহরেই আছি।

আলীর কথা শুনে নূর মুহাম্মদ হেসে বললো, আসল কথা তুমি বলতে চাইছ না, ঠিক আছে–তোমার যা খুশী। তবে সব সময় আমার একথাটা স্মরণ রাখবে যে, শহরে অচেনা লোকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা হয়। তাই সতর্ক থেকো। তোমাকে আমার সাথেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু তোমাকে সেখানে রাখার অনুমতি পাব না। আর সেখানে গেলে যে মিশন নিয়ে এসেছো সম্ভবতঃ তা সম্পূর্ণ করতে পারবে না।

আলীর সন্দেহ হলো, হয়ত আমার প্রোগ্রাম সম্পর্কে নূর মোহাম্মদ কিছু জানতে পেরেছে। অথবা আমাকে কথার প্যাঁচে ফেলে আসল বিষয় জেনে নিতে চাচ্ছে। আলী মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে এর চেয়ে বেশী আর কিছ বলবে না।

আলীকে আবার সতর্ক থাকার কথা বলে নূর মুহাম্মদ বিদায় নিলো।

যে হোটেলের ব্যাপারে নূর মুহাম্মদ বলেছিলো যে, এর মালিক একজন সরকারী চর এবং সেখানে গোয়েন্দা বিভাগের প্রচুর লোক আসা-যাওয়া করে, আলী সে হোটেলে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিল। আলীর ধারণা যে, আলোর নীচে অন্ধকার থাকে, তাই এ জায়গাটা আমার জন্য অধিক নিরাপদ হবে।

গারদেজ এসেছে আজ তৃতীয় দিন চলছে। যে ক'ব্যক্তির ব্যাপারে কমান্ডার তাকে বলছিলো যে, ওখানে তারা তোমার কাজে আসবে, তাদের কারো সাথেই সাক্ষাৎ হলো না। সবার ঘরে তালা ঝুলানো। তারা কোথায় গেছে সে কথা কেউ জানে না। শেষতক আলী ছাউনীতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো, মেজর ফাইয়াজ সেখানে থাকলে সরাসরি তার সাথে যেন সাক্ষাৎ করা যায়। আলী ছাউনীতে মেজর ফাইয়াজ খান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সবাই বললো যে, অন্য ছাউনীতে তিনি বদলী হয়েছেন।

কোথায় বদলী হয়েছেন? কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

আলী কর্নেল মুসার সাথে সাক্ষাত করলো।

কর্নেল মুসা আলীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে এবং তাকে ডজনখানিক প্রশ্ন করে।

কে তুমি? কোথা হতে এসেছ? মেজর ফাইয়াজের সাথে তোমার কি সম্পর্ক ইত্যাদি।

মানসিকভাবে আলী এসব প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলো। তাই সে কোনরূপ বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়নি। তবে এখানেও একই উত্তর মিললো, তিনি বদলি হয়ে গেছেন। কোথায় বদলী হয়েছে, একথা কর্নেল মুসা বল্লো না। বল্লো, যেহেতু যুদ্ধ চলছে তাই এখন কোন সেক্টরে আছে তা বলা কঠিন।

ছাউনী থেকেও আলী বিফল হয়ে ফিরে আসলো।

এখন শুধু এক ব্যক্তি বাকী আছে, যার নিকট মেজর ফাইয়াজের সন্ধান মিলতে পারে। সে হল আব্দুল করীম। শেষ পর্যন্ত আলী আঃ করীমের ঘর তালাশ করতে বের হলো, দরজার কড়া নাড়লে ভিতর হতে এক বৃদ্ধা মহিলার কণ্ঠ শুনা গেলো, কে তুমি?

সালাম দিয়ে আলী বললো, আম্মা! আমি আঃ করীমের সাথে দেখা করতে চাই।

ভিতরে চলে এসো বেটা। আমি ছাড়া এ ঘরে আর কেউ নেই।

আলী ভিতরে ঢুকে পুনরায় সালাম দিলো।

মহিলার বয়স প্রায় ষাট বছর হবে, তিনিই আঃ করীমের মা। আঃ করীম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তার আম্মা বললো যে, দু'মাস হলো সে ঘরে ফিরছে না। তার সব বন্ধু-বান্ধবের নিকট আমি তার খোঁজ নিয়েছে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। ঘরের বাইরে কখনো সে এত সময় কাটায়নি। জানি না ছেলে আমার কেমন আছে, তার আরো ক'জন সাথীর কোন খবর নেই।

আচ্ছা বেটা! তুমি কোথা থেকে এসেছো?

আমি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে তার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি।

আলী কথা শেষ করার পূর্বে মহিলা বললো, বেটা! খানা খাওয়ার কথা তো তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি। তুমি বসো, এক্ষুণি তোমার জন্য খানা নিয়ে আসছি।

একথা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। পাশের ঘর থেকে আলী শুনতে পেলো যে, মহিলা তার পড়শীকে বলছে, অন্য শহর থেকে আমার ছেলের এক বন্ধু এসেছে আমাকে কিছু টাকা ঋণ দাও,আঃ করীম আসলেই তোমাকে দিয়ে দিব।

পড়শী অত্যন্ত বদমেজাজী, তাকে সম্মান করার পরিবর্তে বললো, চাচি! তোমার ছেলে তো আর ফিরে আসবে না, তাই তোমাকে অতিরিক্ত আর ঋণ দিতে পারব না, তোমার ছেলে ডাকাতদের সঙ্গী ছিলো, সরকার তাকে বন্দী করে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তার কথায় আঃ করীমের আম্মা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, তারপরও ধৈর্যের সাথে বললেন, তোমরা ভুল বলছো, আমার ছেলে অত্যন্ত ভদ্র এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজী, সে কখনো ডাকাত হতে পারে না। দেখো মেহমান ঘরে বসে আছে, তুমি আমার রূপার হারটা নিয়ে হলেও কিছু টাকা দাও। ছেলে আসলে টাকা দিয়ে হার ফিরিয়ে নেব। আমার ছেলের মান-সম্মানের প্রশ্ন। মেহমান কি ভাববে যে আঃ করীমের ঘরে গিয়েছিলাম কিন্তু তার মা খানা খাওয়ার কথাও জিজ্ঞেস করলো না। আঃ করীম লাপাত্তা হওয়ার পর তো তার কোন বন্ধুও আসেনি। মানুষের কি হলো যে, তারা কেউ বলে না, আমার ছেলে কোথায় আছে, কেমন আছে। অনুগ্রহ করে হারটা নিয়ে কিছু টাকা ঋণ দাও।

পড়শী বেপরোয়াভাবে বললো, না চাচি! তোমাকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই। অন্য কোথাও চেষ্টা করো।

দেয়ালের এপাশ থেকে আলী তাদের সমস্ত কথা-বার্তা শুনছিলো। এতে তার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হলো যে, আঃ করীম সরকারের হাতে বন্দী হয়েছে।

তার কাছে প্রচুর টাকা ছিলো। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, আঃ করীমের মাকে কিছু টাকা হাদিয়া দিবে। কিভাবে দিবে? দান হিসেবে তো সে নিবেই না।

আলীর মনে সুন্দর এক বুদ্ধির উদয় হলো। আঃ করীমের মা ফিরে এসে আলীর কাছে কিছু বলার পূর্বে সে বললো, আম্মা! আমার খুব তাড়া আছে। আসল কথা হলো, গত বছর আঃ করীম ভাই থেকে আমার আব্বু কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলেন, সেগুলো আদায় করতে এসেছিলাম।

একথা বলে সে পকেট থেকে পাঁচ হাজার আফগানী রূপী বের করে আঃ করীমের মাকে দিয়ে বললো, আঃ করীম আসলে এগুলো তাকে দিয়ে বলবেন, আমর গুল পাঠিয়েছে, বাকী টাকাও জলদী পরিশোধ করবে।

আঃ কমীমের মা টাকা হাতে নিয়ে বললেন, বেটা! কিছু না খেয়ে তোমাকে বিদায় দিতে পারি না। তোমাকে কিছু খেতেই হবে।

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বাজার থেকে কিছু কিনে এনে খানা তৈরী করে আলীকে খাওয়ালেন। খানা খেয়ে আলী ঘর হতে বের হওয়া মাত্র অকস্মাৎ চার ব্যক্তি তাকে বন্দী করে গাড়িতে তুলে খাদের অফিসে নিয়ে গেলো।

খাদ আফগানিস্তানের একটি সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ, যা ভারতীয় জাদরেল গোয়েন্দাদের সমন্বয়ে গঠিত। এর কাজ হলো, প্রতি মুহূর্তে মুজাহিদদের গতিবিধি ও তৎপরতার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা। প্রথমে ডঃ নজীব খাদের প্রধান ছিলো। সে এখন বারবাকের পরে আফগানিস্তানে রুশদের পুতুল সরকার প্রধান। প্রকৃত পক্ষে খাদের দফতর হলো এক ভয়াবহ জিন্দানখানা ও নির্যাতন কেন্দ্র। বন্দীদের উপর এমন নির্যাতন ও বর্বরতা চালানো হয় যে, অধিকাংশ বন্দী তা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, গত আট বছরে খাদের নির্যাতনে কমপক্ষে এক লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে,রাশিয়ার কেজিবি-র মতই ভয়ংকর এর দানবীয় অবয়ব।

বন্দী করার পর আলীকে এক বাড়ীর বড়সড় এক কুঠরিতে নিয়ে শক্ত করে চেয়ারের সাথে বাঁধা হলো। তাকে বারবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো, মুজাহিদদের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

তুমি কোন গ্রুপের সদস্য?

কোন কোন পাহাড়ে মুজাহিদদের ঘাঁটি আছে?

কি মিশন নিয়ে তুমি গারদেজ এসেছো?

কি উদ্দেশ্যে মেজর ফাইয়্যাজের সাথে দেখা করতে চাও?

এসব প্রশ্নের উত্তরে আলীকে নীরব থাকতে দেখে দৈত্যকায় এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে আলীর গালে কষে দশ-বিশটা ঘুষি লাগিয়ে দেয়। তা'সত্ত্বেও আলী নীরব। জলন্ত সিগারেট দিয়ে তার শরীর দাগানো হলো, যার যন্ত্রণা অসহনীয়। এরপর তার শরীরে সুঁই ফুটানো হলো। সব কিছু আলী সহ্য করছে, তবুও কিছুই বলছে না সে।

প্রচন্ড বিষ-ব্যাথায় আলীর শরীর নীল হয়ে উঠেছে, তবুও সে নির্বাক। এরপর তাকে মাটিতে শুইয়ে পিনযুক্ত বুট ও লাঠি দ্বারা তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হলো। অধঃমুখী করে ছাদের সাথে ঝুলিয়ে দিলো। পায়ের দিকে সেলোয়ারের মুখ বন্ধ করে তার মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে দিলো, তার মুখ বরাবর মাটিতে মরিচ পোড়া হলো। এসব নির্যাতন ছিলো অসহনীয়। এ কঠিন মুহূর্তে হযরত বেলাল (রাঃ) এর ঘটনা তার স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠে। আলী সেখানে দেখতে পেলো, তাওহীদের ঘোষণা দেয়ার কারণে যখন হযরত বেলাল (রাঃ) কে জ্বলন্ত অংগারে নিক্ষেপ করা হলো, তখনো তার মুখে শুধুই উচ্চারিত হচ্ছে 'আহাদ' 'আহাদ'। এ দৃশ্য আলীর মনে এক অপার্থিব সাহসের সঞ্চার করে।

ছাদ হতে আলীকে অজ্ঞান অবস্থায় নামানো হলো, জ্ঞান ফিরে এলে তার চোখে প্রচন্ড জ্বালা শুরু হয়। ব্যথায় প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুকড়ে যাচ্ছে, শরীরের কয়েক স্থান থেকে রক্ত ঝরে কাপড়ে জমাট বেঁধে আছে।

কিছুক্ষণ পর দু' ব্যক্তি এসে তার চোখ বেঁধে অন্ধকার এক কক্ষে ফেলে গেলো। কক্ষের একদিক থেকে একজন লোক এসে আলীকে উঠিয়ে নিজের জায়গায় নিয়ে বসালো। আলী আবার জ্ঞান হারালো। এ কক্ষে মোট চারজন লোক, সবাই মিলে আলীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু ভোর রাত পর্যন্ত আলীর জ্ঞান ফিরলো না।

ভোরে আলীর জ্ঞান ফিরে আসে, তখনও চক্ষু দু'টি ব্যথায় জ্বলছে। সমস্ত শরীর আঘাতে আঘাতে নীল হয়ে গেছে। সে উঠতে চাইলো কিন্তু পারলো না। কুঠরিতে এখনও আবছা অন্ধকার। ওই চার ব্যক্তি আলীর নিকট এসে তাকে তুলে ভর দিয়ে বসালো, একজন কয়েকটা শুকনো রুটির টুকরো আর এক গ্লাস পানি আলীকে দিয়ে বল্‌লো, এগুলো খেয়ে নাও।

আলী শুকনো রুটির শক্ত টুকরোগুলো চিবাতে পারছে না। মুখের ওপর প্রচন্ড আঘাতের কারণে চোয়াল নাড়লেই অসহনীয় ব্যথা পায়। শুকনো রুটি পানিতে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর ভিজে নরম হলে আস্তে আস্তে সেগুলো খেয়ে নিলো। ঐ ব্যক্তি পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে বললো, এটা খেয়ে নাও, ব্যথা কমে যাবে।

আধা ঘন্টা পর আলীর ব্যথা কিছুটা কমে আসলে সে কক্ষের লোকদের জিজ্ঞেস করলো, আমি এখন কোথায় আছি? আপনারা কারা?

শুশ্রুষাকারী ব্যক্তিটি বললো, আমরা বন্দী, আমরা সবাই এখন জেলখানায় আছি।

আচ্ছা তোমার অপরাধটা কি?

আমার তো অপরাধ একটাই যে, আমি আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাসী। আফগানিস্তানে এখন এ বিশ্বাস পোষণ করাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। চুরি, ডাকাতি আর খুন-খারাবীর অপরাধ এদেশে ক্ষমা করা হয়, কিন্তু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ক্ষমাহীন অপরাধ। কারণ, আল্লাহর নাম নিলে সরকার মনে করে যে, তার রক্তচোষা লাল বিপ্লব বুঝি ব্যর্থ হবে। তাই আমাদের বিপ্লববিরোধী আখ্যা দিয়ে জেন্দানখানায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এরপর আমাদের ওপর বর্বরতার নির্মম স্টীম রোলার চালানো হয়, যাতে আল্লাহর বন্দেগী ছেড়ে আমরা খোদাদ্রোহী নমরুদদের অনুসারী হই। কিন্তু এ অমানুষগুলো ভুলে যাচ্ছে যে, আমরা একত্ববাদের পতাকাবাহী হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উত্তরসূরী, তাঁর আত্মার সন্তান। সে যুগের নমরুদের সামনে যেমন তিনি মাথা নত করেননি বরং চির সমুন্নত ছিল তার তাওহীদে বিশ্বাসী শীর। তেমনি এসব নমরুদদের সামনেও আমাদের এ তাওহীদী শির কোনদিন ঝুঁকবে না, ঝুঁকতে পারে না। যুগে যুগে তাওহীদের ঘোষণা দিতে এ শির উন্নত থাকবেই, ইনশাল্লাহ।

আলীর কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, মেজর ফাইয়াজ! আমাদের মতই এর অপরাধ। এজন্য তাকে আমাদের সেলেই নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আলী মেজর ফাইয়াজের নাম শুনে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, আপনিই কি মেজর ফাইয়াজ?

হ্যা! আমিই, তুমি কি আমার কথা জান?

হ্যাঁ! জানি, আলী উত্তর দিল।

আমি জানতে চাই যে, আমাকে কিভাবে চিন?

আলী প্রথম সব কথা বলতে যাচ্ছিলো , কিন্তু হঠাৎ সে চিন্তা করলো যে, এটা আবার শত্রুর কোন চাল নয় তো। মনে মনে বললো, এ ব্যক্তি মেজর ফাইয়াজ কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে অতিরিক্ত আর একটি কথাও বলব না।

মেজর ফাইয়াজই তাকে বললো, তোমাকে কিভাবে বিশ্বাস করাব যে, আমিই মেজর ফাইয়াজ? এরা আমার সঙ্গী মাসুদ, জারতাজ ও সাইফুল্লাহ। বিশ্বাস না হয় তো তাদেরকে জিজ্ঞেস করো।

এ নামগুলি শুনে আলীর মনে পড়লো যে, এদেরকেই তো সে শহরে তালাশ করেছিলো। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে জিজ্ঞেস করল, আপনার আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সাথী কোথায়? দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে মেজর ফাইয়াজ বললেন, বোধ হয় আঃ করীমের কথা বলছো?

হ্যাঁ, আঃ করীমের কথাই বলছি।

এখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, আপনিই মেজর ফাইয়াজ।

এখন বলুন, আঃ করীম কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে?

মেজর ফাইয়াজ আলীকে বললেন, সে তো আর আমাদের মাঝে নেই। রুশী নরপশুরা তার উপর নির্যাতনের সব পন্থা প্রয়োগ করে; সে ছিল অটল পর্বত, যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে তবু টলবে না। তার প্রতিটি হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়, শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনেই তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আগুনের জ্বলন্ত শিখায় ভস্ম হয়ে শাহাদাত বরণ করলো এ মর্দে মুজাহিদ। কিন্তু তার মুখ হতে টুশব্দটুকুও বের হলো না। তিনি মহান, আমার ধারনার চেয়েও মহান।

এটুকু বলে মেজর ফাইয়াজ হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদতে থাকেন। আলীর চোখ হতেও অশ্রু ঝরে পড়লো। আলী অশ্রু মুছে বললো, আঃ করীমের মা এখনো তার অপেক্ষা করছেন।

এরপর সে নিজে বন্দী হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনালো। শুনে মেজর ফাইয়াজ বল্‌লেন, এর অর্থ তোমাকেও আঃ করীমের পড়শী ইয়াসীনই বন্দী করিয়েছে! লোকটা অত্যন্ত নিচু ও ভ্রষ্ট। উপরন্ত কম্যুনিষ্ট আর কম্যুনিস্টরা খুব লোভী।

মেজর ফাইয়াজের নিকট আলী তার সব কথা বললো, আপনার ব্যাপারে কমান্ডার সাহেব অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন, আমাকে আপনার সংবাদ নেয়ার জন্যই গরদেজ পাঠানো হয়। ছাউনীতে গিয়ে আপনার কথা জিজ্ঞেস করলে সবাই বললো, আপনি বদলী হয়েছেন। কোথায় বদলী হয়েছেন এ প্রশ্নের উত্তরে সবাই বললো, জানিনা।

আলী তার মোজার ভিতর থেকে কমান্ডারের লেখা চিঠি বের করে মেজর ফাইয়াজের হাতে দিলো। আলীর মোজা ছিলো মোটা, চামড়ার মধ্যখানে ফাঁক করে তার ভেতর চিঠি রেখে সলিশন দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিয়েছিলো। শত তল্লাশীর পরও তা আবিষ্কার করা মুশকিল ছিলো। তল্লাশীকারীরা আলীর জুতার তলা ছিড়েও কিছু পায়নি।

আলীর বুদ্ধিমত্তা দেখে মেজর ফাইয়াজ খুব বিস্মিত হলেন।

চিঠি পড়ে মেজর ফাইয়াজ আলীকে বললেন, তিন মাস পূর্বে আমার ওপর রুশীদের সন্দেহ হয়। আড়াই মাস পূর্বে মুজাহিদদের সহযোগিতা করা ও তাদের কাছে অস্ত্র পাচারের অপবাদ দিয়ে আমাকে বন্দী করা হয়। তবে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের পক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ ছিলো না। তোমার মত আমার ওপরও নির্যাতন চালানো হয়েছে। কিন্তু আমার নিকট থেকে কোন তথ্য তারা বের করতে পারেনি। এরপর আঃ করীমের পড়শীর ষড়যন্ত্রে আমার এ সাথীরাও বন্দী হয়েছে। কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চার্যান্বিত হচ্ছি যে, তারা আমাদেরকে এখানে কেন জীবিত রেখেছে।

জেলখানায় আলীর এক সপ্তাহ কেটে গেলো। তার যখমও প্রায় সেরে গেছে। এ সময় মেজর ফাইয়াজের আন্তরিক শুশ্রুষার কথা ভুলবার নয়। নিয়মিত তিনি তার নিজের অর্ধেক খানা আলীকে খাওয়াতেন।

অষ্টম দিনে একজন রুশী অফিসার সেলে এসে মেজর ফাইয়াজ ও আলীকে বললো, এখনো সময় আছে, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও, না হলে অন্য জেলে তোমাদের পাঠানো হবে, যেখানে তোমাদের গোস্ত কিমা করে কুকুরকে ভক্ষণ করানো হবে।

মেজর ফাইয়াজ রুশী অফিসারের কথার উত্তর দিয়ে বললেন, ওহে নরপশু! আমাদের সাথী আঃ করীমের ধৈর্য আর দৃঢ়তা তুই দেখেছিস, এখন আমাদের ওপর তোরা যেমন ইচ্ছা নির্যাতন করতে পারিস, আমরাও ইনশাআল্লাহ আঃ করীমের রেখে যাওয়া পতাকা উঁচু করে ধরে রাখব। প্রয়োজন হলে দ্বীনের জন্য আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করব। তবুও তোমাদের প্রলোভনে আটকা পড়ে আখেরাত নষ্ট করব না।

আল্লাহ, ইসলাম ও আখেরাতের কথা শুনে রুশী অফিসারের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে অশালীন কথা উচ্চারণ করে মেজর ফাইয়াজের গালে একের পর এক থাপ্পড় কষাতে থাকে।

রুশী অফিসারের মুখে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে অশালীন উক্তি শুনে আলী ক্রোধে জ্বলে উঠে। সে সহ্য না করতে পেরে রুশীর কলার ধরে ঘুষির পর ঘুষি লাগিয়ে তার দাঁত ভেঙ্গে দেয়। আরো সৈন্য এসে অফিসারকে না বাঁচালে আলী তাকে জাহান্নামে পাঠিয়েই ছাড়ত। আলীর ঘুষি খেয়ে রুশী অফিসার ক্রোধে গালি দিতে দিতে ফিরে গেলো। অধিনস্ত সৈন্যদের নির্দেশ দিল এদেরকে অন্য সেলে কুকুরের সামনে ফেলে দিয়ে এসো।

রুশী অফিসার ফিরে গেলে সাথীদের উদ্দেশে মেজর ফাইয়াজ বললেন, বন্ধুরা ! মনে হয় আমাদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। সব ধরনের নির্যাতন সহ্য করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হও। রুশী যে সেলের কথা বলে গেলো তা আমি দেখেছি। কত কঠিন ওখানের শাস্তি তা আমি জানি। সামরিক ছাউনীর অদূরে এক বেসরকারী বাড়ীতে এ নির্যাতন কক্ষটি। নির্যাতনের বহু যন্ত্র ওখানে রয়েছে। ওখানে এমন যন্ত্র আছে, যার একদিকে কোন মানুষকে ফেলে দিলে অপর দিক দিয়ে তার গোস্ত কিমা হয়ে বেরিয়ে আসে।

ওখানে এক কক্ষে রক্তপিপাসু কুকুর আছে, যেগুলো মুহূর্তের মধ্যে জীবিত মানুষের শরীর ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আর রয়েছে বিষধর সাপ ও ফুটন্ত তেলের বিরাটকায় কড়াই। এ ফুটন্ত তেলের মধ্যে কয়েদীদের নিক্ষেপ করা হয়। অনেক সময় কয়েদীদের এমন সব টিকা দেয়া হয়, যার প্রতিক্রিয়ায় উন্মত্ত হয়ে তারা নিজের শরীর কামড়ে ছিড়ে খায়। চিমটা দ্বারা জীবিত মানুষের নখ উপড়ে ফেলা হয়। এমন কোন কঠিন নির্যাতন নেই, যা ওখানে কয়েদীদের ওপর প্রয়োগ করা হয় না।

বন্ধুরা আমার! সর্বদা একথা স্মরণ রাখবে, আমাদের পূর্বে দ্বীন ও আজাদীপ্রিয় হাজারো মুজাহিদ এসব নির্যাতন অম্লান বদনে সয়ে গেছেন। তারা ফুটন্ত তেলে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, বেয়নেট দিয়ে তাদের গোস্ত কেটে সেখানে লবণ-মরিচ ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

একে একে তাদের শরীরের সর্বাঙ্গ কর্তন করা হয়েছে। তথাপি তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করেননি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মুখে এ সত্য উচ্চারিত হয়েছে যে, ইসলাম ব্যতীত আর সব মতাদর্শ ভ্রান্ত। একজন বীর আফগানী জীবিত থাকা পর্যন্ত এদেশে কোন কম্যুনিস্ট রুশীর অস্তিত্ব কিভাবে সহ্য করব। তাই এসো, সবাই মিলে এ বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করি, আমরাও আত্মত্যাগী সে সব শহীদের পথ ধরেই চলব এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ধৈর্য্য ও শক্তি দান করেন। এ কঠিন পরীক্ষায় আমাদেরকে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করেন।

সবাই বল্‌লো, আমীন।

রাত ন'টা। পাঁচজন কয়েদীকে নিয়ে একটা গাড়ী গারদেজের রাস্তা দিয়ে মৃত্যুকূপ নামক নির্যাতন কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তানে রুশীরা আসার পর হতে সন্ধ্যার পরপরই গারদেজ শহরের রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে। রুশীদের ভয়ে লোকজন এ সময় ঘর হতে বের হয় না। এমনকি কম্যুনিস্টরাও নিজ পরিবারের মহিলাদের সতিত্ব রক্ষার্থে সন্ধ্যায় দরজায় তালা লাগিয়ে দিত। কয়েদীদের গাড়ী ছুটে চলার সময় রাস্তায় গভীর নীরবতা বিরাজ করছিলো।

আলীর আঘাতে আহত রুশ অফিসার কয়েদীদের নির্মম মৃত্যুর দৃশ্য দেখার জন্য মৃত্যুকূপের আশে-পাশে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল। জল্লাদদেরকে সে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো, এক বন্দীকে বিষধর সাপের কক্ষে নিক্ষেপ করবে আর দু'জনকে কিমার মেশিনে ফেলবে। আর যে আমাকে ঘুষি মেরেছিল তাকে ফেলবে ফুটন্ত তেলের কড়াইর মধ্যে। ক্ষুধিত কুকুরের সামনে ফেলবে মেজর ফাইয়্যাজকে। রুশী অফিসারের গায়ে হাত তোলার মর্মান্তিক পরিণাম যেন সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। দেখে ছাড়বো আজ, কে তাদের খোদা, কত শক্তি তার, কিভাবে রক্ষা করে সে তার বিশ্বাসীদের।

রুশী অফিসার এদিকে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করে আল্লাহর শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করছিলো। ওদিকে গাড়ীর ড্রাইভার গাড়ীর মোড় ঘুরিয়ে ভিন্ন পথে শহরের বাইরে আরেকটি বড় সড়কে এসে উঠলো।

গাড়ী ফুলস্পীডে চলছে, জনমানবহীন একটা নীরব জায়গায় এসে ড্রাইভার সড়ক ছেড়ে দুই ফার্লং দূর গিয়ে গাড়ী থামাল। পিছনের দরজা খুলে স্বশস্ত্র সৈন্যদের নীচে ডাকল। গাড়ী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকায় সৈন্য দু'জন বুঝতেই পারেনি যে, তারা জেলখানার পরিবর্তে বিরান কোন ভূমিতে চলে এসেছে। তারা নিশ্চিন্ত মনে গাড়ী থেকে নামতেই ড্রাইভার ছো মেরে তাদের ক্লাসিনকভ ছিনিয়ে নিয়ে নির্দেশ দিলো, বন্দীদের জলদি গাড়ী থেকে নামাও। তাদের চোখ ও হাতের বাঁধন খুলে দাও।

জ্যোৎস্না রাত, চারিদিকে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ ঝিলমিল করছে।

বন্দীরা চাঁদের রোশনীতে ড্রাইভারকে চিনতে পারলো, ও তো নূর মুহাম্মদ!

সৈন্যদ্বয় বন্দী অবস্থায় কাঁপতে লাগলো থর থর করে।

আলী মেজর ফাইয়াজের সাথে নূর মুহাম্মাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। আনন্দে সবাই কোলাকুলি করলো, একে অপরকে মুবারকবাদ জানালো।

সন্ধানী দৃষ্টিতে নূর মুহাম্মদ এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর বললো, এতক্ষণে তো তাদের চলে আসার কথা। এ স্থানটিই তো নির্বাচন করা হয়েছিলো।

আলী জিজ্ঞেস করলো, এখানে কাদের আসার কথা?

উত্তরে নূর মুহাম্মদ বললো, আপনাদের সাহায্যে এক গ্রুপ মুজাহিদের আসার কথা ছিলো।

তার কথা শেষ হতেই অদূরে পাখির কণ্ঠের মত নির্দিষ্ট সংকেত শুনা গেলো। প্রতি উত্তরে নূর মুহাম্মদও অনুরূপ আওয়াজ দিলে সেখানে দশজন মুজাহিদের উদয় হয়। হায়দার মারকাজের ইনচার্জ হানীফ খানও এদের মধ্যে ছিলেন।

নূর মুহাম্মদ বললো, অতি তাড়াতাড়ি আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।

তখন আলী বলে উঠলো, না আঃ করীমের হত্যাকারীকে তুলে না নিয়ে এখান থেকে যাব না।

আঃ করীমের মৃত্যুতে মেজর ফাইয়াজও দারুণ ব্যথিত ছিলেন। তিনিও আলীর কথায় সমর্থন জানালেন। শেষে এটাই সিদ্ধান্ত হলো যে, আঃ করীমের হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে।

আলী, নূর মুহাম্মদ ও অপর চারজন মুজাহিদ গাড়ীতে উঠলো। দু'জন মুজাহিদ বন্দী সিপাহীদের ইউনিফর্ম পরে নিলো, রুশদের হাতে কোথাও আটকা না পড়তে হয় যাতে।

রাত বারটা। আঃ করীমের বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামল। গাড়ী হতে নেমে সে আঃ করীমের দরজার কড়া নাড়লে দরজা খুলে গেলো। আলী ঘরে প্রবেশ করলো, অপর দিকে নূর মুহাম্মাদসহ আরো দু'জন মুজাহিদ আঃ করীমের হত্যাকারী ইয়াসীনের ঘরে ঢুকে তাকে তুলে নিয়ে আসলো।

আলী সংক্ষেপে সব কথা আঃ করীমের মাকে খুলে বলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ী তাকে প্রস্তুত হতে বললো। কোন দামী জিনিস সাথে নিতে চাইলে তাও সাথে নিতে বললো, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে রুশীরা এঘর ঘেরাও করে ফেলবে।

আঃ করীমের আম্মা বললেন, আমার আঃ করীম কোথায়?

আলী বললো, আঃ করীম সম্পর্কে পরে বলব। আম্মা! আপনি জলদী করুন। মোটেই দেরী করবেন না।

বিস্ময়- বিমূঢ় হয়ে আঃ করীমের মা দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুই তার বুঝে আসছিল না। বললেন, বেটা, আমার কিছুই বুঝে আসছে না। তুমি যা বলো তাই মেনে নিচ্ছি। আমার আঃ করীমও এ কথা বলত যে, রুশীরা বড় নিষ্ঠুর। তবে আমার ঘরে আর কোন

দামী জিনিস তো নেই। আমার সম্পদই ছিলো ওই এক আঃ করীম। সে তো এখন ঘরে নেই। ওহ! একটা জিনিস রয়েছে। কুরআন শরীফটা নিতে হবে। এ ঘরে আর ফিরে আসি কিনা তার তো ঠিক নেই। রুশীরা এ ঘরে আসলে যাতে কুরআন শরীফের কোন অমর্যাদা করতে না পারে সে জন্য কুরআন শরীফখানা নিতেই হবে। আঃ করীম আমাকে বলেছে, রুশীরা বহু মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছে এবং কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে নূর মুহাম্মদ এসে বললো, জলদী কর ভাই, না হলে আমরা সবাই ধরা পড়ে যাব।

সবাইকে নিয়ে বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই গাড়ী পূর্বের স্থানে ফিরে আসলো। দু'এক জায়গায় গাড়ী থামানো হয়েছিল বটে, তবে নূর মুহাম্মদ নিজের কার্ড দেখালে পুলিশ রাস্তা ছেড়ে দেয়।

বন্দী সিপাহী দু'জন মুজাহিদের সাথে মিলে জিহাদ করার শপথ নিলে তাদের ক্ষমা করে দিয়ে মুজাহিদারা তাদেরও সাথে নিয়ে নিলো।

খানিকটা চলার পর গাড়িটা এক জায়গায় থামিয়ে মুজাহিদরা তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। কারণ সামনে পায়ে হাঁটা পথ।

সবাই হায়দার মারকাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইয়াসীনের চোখ ও হাত বেঁধে দেয়া হয়েছে।

আলী আঃ করীমের মাকে হাঁটতে সাহায্য করছিলো। তিনি বার কয়েক জিজ্ঞেসও করেন যে, আঃ করীম কোথায়? আর ইয়াসীনকে কেন বন্দী করা হয়েছে?

আলী বললো, আম্মা! মারকাজে পৌঁছে সব বলব।'

চলতে চলতে আলী ও মেজর ফাইয়াজকে নূর মুহাম্মদ বললো, আলীর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই বুঝতে পারি যে, সে বিশেষ কোন প্রোগ্রাম নিয়ে এখানে এসেছে। বিশেষ করে যখন সে বললো, বহু দিন পাহাড়-পর্বতে ঘুরেছি, এখন শহরে আছি। এ উত্তরে স্পষ্ট বুঝা যায়, মুজাহিদরা পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়ায়, তারা শহরে আসে বিশেষ কাজে। কিন্তু আমি ইন্টেলিজেন্সের লোক হওয়ায় সে আমাকে স্পষ্টভাবে কিছু বলেনি। তার ওপর আমি দৃষ্টি রাখি কিন্তু সে মারাত্মক ভুল করে বসে, ছাউনী থেকে সোজা সে আঃ করীমের ঘরে যায়। সে ঘরের উপর ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছিলো। কর্ণেল মুসা তার পিছনে লোক লাগিয়ে দেয়। ঘটনাচক্রে ইয়াসিনও ঐ সময় ঘরে ছিল, তাই সহজেও বন্দী হয় যায়। আমিও কিছু করতে পারছিলাম না। আজকে গাড়ীর ড্রাইভার নেই তাই আমাকে ডিউটি দেয়া হয়। বলা হয় যে, রাত ৯টায় গাড়ীতে করে বন্দীদের মৃত্যুকূপে নিয়ে যাবে। এই বন্দীদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলী রয়েছে বলে আমি ধরে নেই।

আমার পরিচিত লোকদের মধ্যে হাবীবুল্লাহর সাথে মুজাহিদদের যোগাযোগ আছে। আমি জলদী করে তার কাছে গেলাম এবং তাকে সব কিছু খুলে বললাম। তখন সিদ্ধান্ত

হলো যে, আমি বন্দীদের গাড়ী এখানে নিয়ে আসব, আর যদি আমি এতে ব্যর্থ হই তাহলে অন্য মুজাহিদরা মৃত্যুকূপের ওপর আক্রমণ করবে। মৃত্যুকূপের নকশাও তাকে দিয়ে ছিলাম। যা হোক আল্লাহ পাক আমাদের সাহায্য করেছেন। আমরা সফল হয়েছি।

এদিকে সবাই ধীর পায়ে মারকাজের দিকে চলছে। ওদিকে মৃত্যুকূপের মূল ফটকে ওই রুশী অফিসার অপেক্ষা করতে করতে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায়। সে বিরবির করে বলছিল, বারোটা পর্যন্তও বন্দীরা আসলো না। বন্দীরা গেল কোথায়?

কখনো রক্তপায়ী কুকুরের খাঁচার কাছে যায়, কখনো বিষাক্ত সাপের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকে। আবার কখনো আশাহত চোখে তেলের কড়াইর দিকে তাকায়। অতিক্রোধে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। রাগের বশে এক আফগানী সৈন্যকে থাপ্পড় মারতে উদ্যত হলে সৈন্যটি একপাশে সরে দাঁড়ায়। অফিসারটি টাল সামলাতে না পেরে ফুটন্ত তেলের কড়াইর মধ্যে পড়ে যায় এবং এক মিনিটের মধ্যে রোষ্টে পরিণত হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক দেখিয়ে দিলেন, ফেরাউন বা নমরুদের মত তাঁর সাথে যে-ই চ্যালেঞ্জ করবে, তার পরিণাম হবে এমনই ভয়াবহ।

মাঝ পথে নূর মুহাম্মদ বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বললো যে, এক্ষুণি আমার পরিবারকে পাকিস্তান না পাঠালে আমার ফেরার হওয়ার অপরাধে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে।

হানীফ খান, মেজর ফাইয়াজ ও আলী নূর মুহাম্মদকে শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় দিলো।

রাত ৪টা নাগাদ সবাই হায়দার মারকাজ পৌঁছে যায়। ইয়াসীনকে পাহারারত মুজাহিদদের হাতে দিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে উঠে নাস্তার পর আঃ করীমের আম্মাকে তার ছেলের শাহাদাতের সংবাদ জানানো হয়।

এ সংবাদ শুনে তিনি যেন নীথর হয়ে গেলেন, কান্নাকাটিও করলেন না বা কোন প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করলেন না।

এরপর ইয়াসীনকে সেখানে আনা হলো, আলী ও মেজর ফাইয়াজের জোর আবেদন ছিল, তাকে যেন জীবন্ত পুড়ে ফেলা হয়। কারণ, তার ষড়যন্ত্রে বন্দী হওয়া বহু মুজাহিদকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

মেজর ফাইয়াজ মুজাহিদদের সামনে আঃ করীমের শাহাদাতের হৃদয়বিদারক কাহিনী বললে সবাই তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে যে, এ ষড়যন্ত্রের হোতা ইয়াসীনকে পুড়িয়ে মারা হোক।

ইয়াসীনকে জীবন্ত পুড়ে মারবার জন্য তৈল ও লাকড়ী আনা হলো।

মৃত্যুর দৃশ্য কল্পনা করে ইয়াসীন বারবার শিউরে উঠছে। সে মেজর ফাইয়াজ, হানীফ খান ও আলীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে থাকে। কিন্তু সবাই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে, লোকটা অসম্ভব রকম নিষ্ঠুর, ঈমান তো বিক্রি করেছেই সাথে সাথে আত্মমর্যাদাবোধটুকুও সে রুশীদের হাতে খুইয়ে ফেলেছে। কত মুজাহিদকে যে সে বন্দী করিয়েছে, কত নিরীহ মানুষ তার সহায়তায় বর্বরতার যাঁতাকলে শহীদ হয়েছে তার খবর কে রেখেছে! এমন ব্যক্তির উপর দয়া করা আত্মঘাতি কর্ম ছাড়া আর কি!

ইয়াসীন আঃ করীমের আম্মার পা ধরে উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগলে তিনি মেজর ফাইয়াজকে বললেন, আপানারা একে ক্ষমা করে দিন।

তার কথায় মেজর ফাইয়াজ অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। এ কেমন মা, যার নির্দয়তার কারণে তার আদরের সন্তান রুশীদের হাতে বন্দী হয়ে জীবন্ত দগ্ধ হলো, সে তাকে ক্ষমা করে দিতে বলছে!

আঃ করীমের আম্মাকে তিনি বললেন, আম্মা, আপনি হয়ত জানেন না যে, কি নির্মম ভাবে আঃ করীমকে ওরা শহীদ করেছে।

আমি তা ভাল করেই জানি। তবে আঃ করীম ছিল এক মুজাহিদ , ইসলামের খাতিরেই সে নিজের জান আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দিয়েছে। এ ইসলাম আমাদের নিকট পৌঁছেছে হযরত (সাঃ)-এর মাধ্যমে। বলতো, মক্কাবাসীরা নবী (সাঃ) এর সাথে কীরূপ নির্মম আচরণ করেছিল? তা সত্ত্বেও কি নবীজি (সাঃ) তাদের ক্ষমা করে দেননি? তোমরা আমাকে যদি 'মা' ডেকে থাক তাহলে একে ছেড়ে দাও। আর মনে রেখো, এ আগুন হতে জাহান্নামের আগুন বেশী উত্তপ্ত। তোমরা সে শাস্তি তাকে দিতে পারবে না, যা আল্লাহপাক তাকে দিবেন।

আঃ করীমের আম্মার কথায় ইয়াসীনকে ছেড়ে দেয়া হলো।

হানীফ খান দু'জন মুজাহিদকে বললো, তার চোখ বেঁধে মারকাজ থেকে দূরে রেখে এস।

যাওয়ার সময় আলী তাকে বলে দিলো, ভবিষ্যতে কোন মুজাহিদকে যদি বন্দী করাও তাহলে এ গরম তেলে তুমি কাবাব ভাজা হবে নিশ্চিত।

আলী ও মেজর ফাইয়াজ মারকাজে এসেছেন আজ পাঁচদিন হয়েছে। যোহর নামাজ পড়ে তারা মসজিদ থেকে বের হয়েছেন কেবল। এমন সময় দেখতে পেলেন যে, স্ত্রী-পুত্র সহ ইয়াসীন মারকাজে উপস্থিত। সে এসেই হানীফ খানকে বললো, 'মুজাহিদদের সাথে আমি যে অন্যায় আচরণ করেছি সে অপরাধবোধ আমার বিবেককে দংশন করে আমায় অস্থির করে তুলছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, বাকী জীবন জিহাদেই কাটাবো, আল্লাহ পাক হয়ত এ উসিলায় আমাকে ক্ষমা করবেন।'

এরপর সে আঃ করীমের আম্মার পা ধরে বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, 'আম্মা! আপনার আঃ করীমকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবো না, আপনার হৃদয়ে তার

শূন্যতা কোনভাবেই পুরণ হবে না, তবে যে পথে তিনি কোরবান হয়েছেন আমি সে পথে নিজের সব বিলিয়ে দেব। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমার বাল-বাচ্চা আপনার সাথেই পাকিস্তান যাবে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা আপনার খেদমত করবে। খোদার দিকে চেয়ে আমার বিবি-বাচ্চা ও আমাকে মাফ করে দিন। লোভের বশে অন্যায় করে ফেলেছি। আম্মা! আমার ঘর বিক্রি করে দিয়েছি, আর কখনো সেখানে যাব না। আপনি যেখানে থাকবেন আমার বিবি-বাচ্চাও সেখানে থাকবে।'

ইয়াসীন এক তোড়া টাকা আঃ করীমের মায়ের হাতে দিয়ে বললো, বাড়ী বিক্রি করে এ টাকা পেয়েছি, আগের জমান কিছু টাকাও এর সাথে আছে। এখন এ টাকাগুলো আপনার। এদিয়ে আপনি যা ইচ্ছা তা করুন। মনে চাইলে নিজের হাতে রাখুন অথবা মুজাহিদদেরকে দিয়ে দিন। আপনি খুশী মত ব্যয় করুন।

আঃ করীমের আম্মার সাথে কথাগুলো বলতে বলতে ইয়াসীনের চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তার বিবি-বাচ্চা আঃ করীমের আম্মার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আঃ করীমের মা একজন নিতান্ত দয়াবান মহিলা। তিনি ইয়াসীনের বাচ্চাকে টেনে কোলে বসিয়ে টাকাগুলো হানীফ খানের হাতে তুলে দিলেন। অর্ধেক টাকা হানীফ খান মুজাহিদদের জন্য রেখে বাকীটা আঃ করীমের মাকে দিয়ে বললো, পাকিস্তান যাওয়ার পর এ টাকাগুলো আপনার এ বাচ্চাদের দরকার হবে।

ছয়দিন পর আলী, মেজর ফাইয়াজ, আঃ করীমের মা, ইয়াসীনের বিবি-বাচ্চা ও আরো পাঁচজন মুজাহিদ পাকিস্তানের পথে রওয়ানা দিল। ইয়াসীন হায়দার মারকাজেই থেকে গেল।

চীফ কমান্ডারের নিকট পৌঁছে আলী ও মেজর ফাইয়াজ সমস্ত বিবরণ পেশ করলো। তাদের পাহাড়সম হিম্মত ও সাহসিকতার দাস্তান শুনে কমান্ডার মুচকি হেসে বললেন, ইসলামের সোনালী যুগের নমুনা পেশ করেছো তোমরা, তোমাদের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম, আল্লাহর শোকর, তোমরা সবাই সুস্থ শরীরে আসতে পেরেছো।

আঃ করীমের আম্মা ও ইয়াসীনের বিবি বাচ্চাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দিয়ে কয়েকদিন পর মেজর ফাইয়াজ হায়দার মারকাজে ফিরে আসেন, যাতে শহরের নিকটে থেকে গুপ্ত হামলার তদারকী করা যায়।

শীতের মওসুম শেষ হয়ে বসন্তের আগমনী শুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে। এমন সময়ে মুজাহিদদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, কাবুলে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের এক বৈঠকে মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ বড় মারকাজগুলোর

ওপর প্রচন্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আলী যে মারকাজে এখন অবস্থান করছিল সেটাও এ আক্রমণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ক্যাম্পটি তিন দিক দিয়ে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। শুধু উত্তর দিকে একটি রাস্তা আছে, এ রাস্তাটি গিয়ে প্রাদেশিক শহর ও কাবুলের সাথে মিশেছে। তাই মুজাহিদরা এর নাম রেখেছে ট্যাঙ্ক রোড।

বেশ কিছুদিন যাবত এ সড়ক মুজাহিদদের দখলে, সরকারী ফৌজ সড়কটি দখল করার জন্য বার বার হামলা করেও ব্যর্থ হয়েছে। মুজাহিদদের এ ক্যাম্পটি আধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত। ক্যাম্পের মাঝে পাহাড় খুড়ে বড় বড় গুহা তৈরী করা হয়েছে। আহতদের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ড হাসপাতালও রয়েছে। পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য মসজিদ। গুহার মধ্যে রেডিও স্টেশনও আছে। আফগানিস্তানে এ স্টেশন থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় রুশী ভাষায়। পাহাড়ের ওপর সারি সারি বিমানবিধ্বংসী তোপ তাক করে রাখা হয়েছে। ক্যাম্পের এক পার্শ্বে অতিথি মুজাহিদদের জন্যে হোটেলের ব্যবস্থাও রয়েছে। নবাগত যুবকদেরকে এখানে ট্রেনিং দেয়া হয়। আবার অন্যান্য প্রদেশ ও ক্যাম্পে এখান থেকে অস্ত্র সরবরাহও করা হয়ে থাকে। এ সব কারণে ক্যাম্পটি অত্যাধিক গুরুত্ব রাখে। এ ক্যাম্পটি যুদ্ধবাজ শত্রুর কাছে যমপুরী হিসেবে পরিচিত। এ মারকাজের ব্যাপারে শত্রু পক্ষ অত্যন্ত চিন্তিত। তাই এর উপর আক্রমণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ওরা।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে সংবাদ পেল যে, দুশমনের সহস্র ট্যাঙ্ক ও সাজোয়াগাড়ীসহ বিরাট এক কনভয় মারকাজের নিকটবর্তী এক ছাউনীর দিকে এগিয়ে আসছে। শত্রুপক্ষের প্রোগ্রাম হল, প্রথমে পোস্টটি দখল করে সেখানে সামরিক সরঞ্জাম জমা করা; পরে সেখান থেকে সরাসরি মারকাজে হামলা করা।

বোমারু বিমানগুলো কনভয়ের ওপর দিয়ে ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে।

কনভয়ের অগ্রযাত্রা রোধ করতে মুজাহিদরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কনভয়ের পথে পথে বিছানো হয় ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মাইন, গর্ত খনন করা হয় স্থানে স্থানে এবং ওঁৎ পেতে কয়েক জায়গায় কনভয়ের ওপর হামলাও করা হয়। এসব পদক্ষেপের কারণে শত্রু পক্ষকে পদে পদে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে। কনভয় এক সপ্তাহের বদলে ছয় সপ্তাহ পর তাদের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। মুজাহিদদের এসব অতর্কিত হামলার প্রত্যেকটিতে আলী অংশ গ্রহণ করে। মুজাহিদরা ধারণা করে যে, শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সরঞ্জামের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তারা এখনই আমাদের মারকাজের ওপর আক্রমণ করতে সাহসী হবে না। কিন্তু একদিন অতর্কিতভাবে তারা হামলা করে বসলো।

দিনটি ছিল এপ্রিল মাসের শুক্রবার।

এ সময়ে ক্যাম্পের বেশী সংখ্যক মুজাহিদ পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাত করতে পাকিস্তান চলে গিয়েছে। মারকাজে উপস্থিত মুজাহিদদের সংখ্যা বেশী হলে একশ' হবে।

সকাল বেলা শত্রু পক্ষের বিশটি বোমারু বিমান দেখা গেলো, সাথে এক ডজন হেলিকপ্টার। শুরু হলো মারকাজের উপর বোমা বর্ষণ। মারকাজের তিন দিক থেকে হেলিকপ্টার হতে নেমে আসে কমান্ডো বাহিনী, যাতে কোনদিক থেকে মুজাহিদরা সাহায্য না পায়। চতুর্দিক দিয়ে শত্রুপক্ষ বিপুল শক্তি ও বিশাল বাহিনী নিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। অল্পক্ষণের মধ্যে তারা মুজাহিদক্যাম্প সংলগ্ন পাহাড় দখল করে নেয়।

ক্যাম্পে উপস্থিত সব মুজাহিদ একত্রিত হয়। তারা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেয়, শেষ নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত লড়ে যাবে। অল্পক্ষণ পরই মুজাহিদদের এন্টি এয়ার ক্রাফটগুলো সরব হয়ে ওঠে। শত্রু বিমানের উপর শুরু হয় একের পর এক প্রচন্ড আঘাত।

কিন্তু শত্রু বিমান তোপের রেঞ্জের বাইরে থাকায় কাজ হচ্ছে না। উপর থেকে তারা হাজার পাউন্ড ওজনের বোমা ছুড়ছিলো। তা দেখে মনে হয়, বিমানের পেট ফুঁড়ে বুঝি আরেক বিমান বের হয়ে আসছে। বোমায় মুজাহিদদের এয়ারক্রাপ্ট গানগুলো একের পর এক ধ্বংস হয়ে যায়। ক্যাম্পের কয়েক স্থানে নাপাম বোমার বিষ্ফোরণে আগুন ধরে যায়।

রোমাবর্ষণ থেকে বাঁচার জন্যে মুজাহিদরা পাহাড় খোদিত এক গুহায় আশ্রয় নেয়। মুজাহিদ সংখ্যা এখন মোট ৭০ জন। হঠাৎ গুহার উপর বিরাট এক বোমা আঘাত হানে, তাতে ৪৫ জন মুজাহিদ চাপা পড়ে শাহাদাত বরণ করে। গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাকীরা গুহার ভেতরে আটকা পড়ে যায়।

গুহায় আটকা পড়া মুজাহিদদের মধ্যে আলীও একজন। বদ্ধ গুহায় অতিরিক্ত ক'ঘন্টা তারা জীবিত থাকবে তা বলা মুস্কিল ছিলো। আর এমন প্রচন্ড বোমা বর্ষণের মাঝে বাইরের কোন সাহায্যের আশা করাও দুরাশা মাত্র। বাহির থেকে সাহায্য আসলেও গুহা মুখে জমা কয়েক হাজার টন মাটি সরাতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। ততক্ষণে অক্সিজেনের অভাবে গুহামধ্যেকার মুজাহিদরা কেউ বেঁচে থাকবে না। আলী এসব ভাবছিলো। অন্যরাও বসে বসে এ ভাবনায় ছিলো। বদ্ধ গুহার গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

এভাবে দু'ঘন্টা কেটে যায়। মুজাহিদদের শ্বাস নিতে কষ্ট অনুভূত হচ্ছে। চীফ কমান্ডরও বোমায় আহত।

তিনি মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'মুজাহিদ ভায়েরা! আমাদের আগে যারা শাহাদাত বরণ করলেন, আমরাও ক্ষণিক পর হয়ত একে একে সবাই তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। তবে ভয়ের কিছু নেই। কারণ তারা যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন বিলিয়েছেন, ঠিক তেমনি আমরাও তাদের পথে জীবন দেব। রব্বে যুলজালাল ঘোষণা দিয়েছেন, 'যারা খোদার পথে জিহাদ করে এবং নিহত (শহীদ) হয় আল্লাহ পাক তাদের উত্তম রিযিক দান করবেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক একমাত্র উত্তম

রিযিকদাতা। তাদের তিনি এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যার উপর তারা সন্তুষ্ট।' (সূরা হজ্জ)

তারপর কমান্ডার সাহেব বললেন, 'আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রতিদান যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহপাক অবগত যে, আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ-নিখাদ। আমাদের কারো মনে পার্থিব সম্পদের লালসা নেই। দ্বীন ইসলাম-এর জন্যই শুধু আমরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, জালিমের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছি। আমাদের সাথীদের মৃত্যু আল্লাহর নিকট সম্ভবত এভাবে কাম্য ছিল এবং আমরাও হয়ত তাদেরই মত শাহাদত বরণ করতে যাচ্ছি। আমাদের সবার হৃদয়ের একই আকাঙ্খা, একই আশা, আমাদের স্বদেশ মুক্ত-স্বাধীন হবে। আবার আফগানিস্তানের আকাশে উড্ডীন হবে ইসলামী ঝান্ডা। আর যে সব শহীদ আমাদের পূর্বে আল্লাহর দরবারে পৌঁছেছেন তাদেরও কামনা ছিল এটাই। বন্ধুরা! এসো সবাই মিলে আল্লাহর দরবারে একবার দু'আ করি, যেন তিনি আমাদের গুনাহ মাফ করেন। কবুল করেন আমাদের এই শাহাদাত। আমাদের দেশের স্বাধীনতাহারা মযলুম মানুষ যেন আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়। সব মুজাহিদ বল্‌লো, আমীন।'

কিছুক্ষণ পর্যন্ত মজলিস নীরব।

একদিক হতে আলীর কণ্ঠ শুনা গেল, 'শ্রদ্ধেয় কমান্ডার সাহেব! শাহাদাত আমাদের একান্ত কাম্য, শাহাদাত লাভ গৌরবের বিষয়। আমরা মৃত্যুকে ভয় কবি না। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এ কারণে যে, আমরা অসহায়ের মত মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছি। আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি না কেন, যিনি সর্বময় ক্ষমতাবান। তিনি আমাদের সাহায্যে ফেরেশ্‌তাও পাঠাতে পারেন। বদর ময়দানে আল্লাহ পাক কি ফেরেশ্‌তা দিয়ে মুজাহিদদের সাহায্য করেননি। আর আবরাহার হস্তী বাহিনীকে আবাবীল পাখী দ্বারা কি ধ্বংস করেননি। তবে কেন আমরা সেই রাব্বে যুল-জালালের দয়া থেকে নিরাশ হচ্ছি?'

আলীর কথা শেষ হতেই মুজাহিদ কামান্ডারের কণ্ঠ শুনা যায়, 'বন্ধুগণ! আলী ঠিকই বলেছে, সত্যিই আমাদের বাঁচার পক্ষে বাহ্যিক কোন উপকরণ দেখছিনা । কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হযরত ইউনুস (আঃ) সমুদ্রে নিক্ষেপিত হয়ে মাছের উদরে গেলে তিনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন কি মাছ তাকে তীরে রেখে দেয়নি। আর হ্যাঁ, আমার আরও স্মরণে আসছে, নবীজি (সাঃ) বনী ইসরাইলের তিনজন ঈমানদারের ব্যাপারেও এরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তারা পাহাড়ের গুহায় আটকা পড়েছিলেন। ঘটনার বিবরণ অনেকটা এরূপঃ

'বনী ইসরাইলের তিন ব্যক্তি ভ্রমণে বের হয়। তারা কোন এক জায়গায় পৌঁছলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। এমন সময় প্রবল বর্ষা শুরু হয়। প্রচন্ড ঝড় বইছে। ঝড় থেকে বাঁচার জন্যে তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির ফলে পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে পড়লে গুহামুখ বন্ধ হয়ে যায়। তারা তিনজন ভীষণ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে, কিভাবে এ গুহা থেকে বের হওয়া যাবে। তিনজন

মিলে সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথরটিকে ধাক্কা দেয়। কিন্তু পাথরটা এত বড় যে, এক ইঞ্চিও সরল না। এবার তারা ভাবলো যে, আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। একজন বললো, আমরা স্ব স্ব নেক আমলের উসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইলে হয়ত আল্লাহপাক আমাদের বাঁচার উপায় করে দেবেন। বাকী দু'জনও তার কথায় সমর্থন জানায়।

এরপর তাদের একজন মিনতিভরে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি আমার বৃদ্ধ মাতা পিতার সেবা করতাম একান্তভাবে, নিষ্ঠার সাথে। তাদের না খাইয়ে আমি আমার বাচ্চাদের কখনও খাওয়াতাম না, আমিও খেতাম না। একদিন আমি জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বহু দূর চলে যাই। ফিরে এসে দেখি, মা-বাবা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাদের জন্যে দুধ জ্বালালাম। এ সময় তাদেরকে জাগানো ঠিক হবে না এবং তাদের পূর্বে অন্য কাউকে দুধ খাওয়ানোও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এ অবস্থায় দুধ নিয়ে তাদের শিয়রে সারারাত দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হল, মা-বাবা জেগে উঠে দুধ পান করলেন। হে আমার মালিক! এসব কিছু যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকি তবে এ গুহার মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দাও।

দু'আ শেষ হতেই পাথরটা গুহা মুখ থেকে অল্প একটু সরে যায়।

এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমার এক অতি সুন্দরী চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে সীমাহীন ভালবাসতাম। একবার বদ নিয়তে তার নিকটে গেলাম। কিন্তু সে আমার আহবানে সাড়া দিল না। কারণ সে সতী এবং আমাকে ভীষণ ভয় করতো। একবার আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ যুবতী অভাবের তাড়নায় আমার নিকট সাহায্য চাইতে আসে। আমার কুমতলব আবার জেগে উঠে। তাকে বললাম, আমার কাম-তৃষ্ণা নিবারণের শর্তে তোমাকে একশ' বিশ দীনার দিতে প্রস্তুত আছি। অভাবের তাড়নায় নিরুপায় হয়ে সে তাতে সম্মত হল। কিন্তু আমি তার দিকে অগ্রসর হতেই সে বললো, 'আল্লাহকে ভয় কর। পাপ থেকে বেঁচে থাকো'। আল্লাহ্র ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। প্রবল কামনা সত্ত্বেও অপরাধে লিপ্ত হলাম না। কিন্তু দীনার গুলোও তাকে দিয়ে দিলাম। আয় আল্লাহ! এসব কিছু যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে আমাদের এ বিপদ হতে উদ্ধার করো।

তার দু'আ শেষ হতেই পাথরটা আরেকটু সরে গেল। কিন্তু এখনও বের হওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় জন দু'আ করলে, হে আমার আল্লাহ! তুমি অবগত আছো যে, একবার আমি ক'জন শ্রমিক নিয়োগ করি। তাদের সবার পাওনা উসুল করে দেই। কিন্তু একজন তার পাওনা না নিয়েই চলে যায়। আমি তার পাওনা টাকা ব্যবসায় ব্যবহার করে বহু অর্থ আয় করি এবং সে অর্থ দিয়ে কয়েকটি উট,গরু, ছাগল ও দাস খরিদ করি। বহু দিন পর সে কর্মচারী আমার নিকট এসে তার পাওনা চায়। আমি ওই সমস্ত উট, গরু, ছাগল এবং দাসগুলি তাকে দিয়ে দিলাম। সে স্তম্ভিত হয়ে বললো, ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার

সাথে ঠাট্টা করো না। তোমার সম্পদ নয়, আমি আমার পাওনা টাকা কয়টা চেয়েছি। তখন আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, ঠাট্টা করছি না তোমার সাথে। এ সব সম্পদ তোমার সেই পাওনার লভ্যাংশ। অতঃপর সে খুশী মনে তার সব সম্পদ নিয়ে চলে যায়। হে আল্লাহ! এসব যদি তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

তার দু'আ শেষ হতেই পাথরটি সম্পূর্ণ সরে যায়। তারা তিনজন এভাবে গুহা থেকে বের হয় এবং লাভ করে নতুন জীবন।'

এ ঘটনা বর্ণনার পর মুজাহিদ কমান্ডার বললেন, 'বন্ধুরা! এসো আজ আমরাও আল্লাহ্ পাকের নিকট অনুরূপ দু'আ করি। তিনি আমাদেরকে নেক আমলের বদলে এ বিপদ থেকে হয়ত উদ্ধার করবেন।

এরপর এক মুজাহিদ দু'আ করলো, 'হে আল্লাহ! তুমি জান, আমি কলেজে পড়াকালীন সময়ে একদিন আমাদের গ্রামে কমিউনিস্টরা শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রা দেখতে আমিও গিয়েছিলাম। তারা কমিউনিজমের বিজয় শ্লোগান দিচ্ছিলো। শোভাযাত্রা এক মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ইসলাম বিরোধী শ্লোগান দেয়া শুরু করে। কারণ ওই মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পক্ষে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। রাশিয়ায় মুসলমানদের ওপর বর্বর কমিউনিস্টদের নিপীড়নের কাহিনী তিনি মানুষদেরকে শুনাতেন। তখন ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে বেরিয়ে ইসলাম বিরোধী শ্লোগানের কঠোর প্রতিবাদ জানান। এতে রুষ্ট হয়ে কমিউনিস্টরা তাকে আঘাতে আঘাতে মেরে ফেলে, মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং কুরআন শরীফ ছিড়ে বাথরুমে নিক্ষেপ করে। উপস্থিত ক'জন লোক এর প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। একথা শুনে কমিউনিস্টরা অগ্রসর হয়ে বল্লো, যাও, তোমার আল্লাহকে ডেকে আন। এই বলে সে বর্বর কমিউনিস্ট পবিত্র কুরআনের ছিন্ন পাতায় প্রস্রাব করতে থাকে। এসব জঘন্য অন্যায় অপকর্ম দেখে আমার রাগ চরমে উঠে। তখনই দৌড়ে ঘরে যাই এবং বন্দুক এনে ঐ কমিউনিস্টসহ আরো কয়েজন নাস্তিককে হত্যা করে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেই। হে আল্লাহ! এসব কিছু যদি তোমাকে ভালবেসে করে থাকি তাহলে আমাদের মদদ কর।'

সবাই বললো, 'আমীন'।

এরপর আরেক মুজাহিদ দু'আ করলো। 'হে আমার রব! তুমি জান, আমি ও হামেদ একই সাথে পড়া-লেখা করতাম। সে ছিল আমার বাল্যবন্ধু। আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অত্যন্ত গভীর। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সে কমিউনিস্ট হয়ে যায়। আমি তাকে বহুবার বুঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সে তা মানলো না। আমার এসব কথাকে সে ঠাট্টার মত উড়িয়ে দেয়। সে কুরআনকে বলতো খৃস্টান রচিত গ্রন্থ। হে আল্লাহ! তোমার রাসূলের শানে সে অত্যন্ত অশালীন বাক্য উচ্চারণ করত। একদিন সে ক্লাশরুমে সবার সামনে কুরআন ও ইসলাম বিরোধী বক্তৃতা দিতে শুরু করে। আমি প্রথমে তাকে এসব বলা

থেকে বিরত থাকলে বল্লাম। কিন্তু সে উল্টো আমার সাথে ঝগড়া বাধায়। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অশালীন বক্তৃতায় লিপ্ত এই মুরতাদকে বেদম প্রহার করলাম। যদিও সে এক সময় আমার অতি আপনজন ছিল। এরপর আমি তার নাপাক জিহবাটা কেটে ফেল্লাম। হে আমার মাওলা, এসব কিছু যদি তোমার করুণা পাওয়ার আশায় করে থাকি তবে তুমি আমাদের মদদ কর।'

সব মুজাহিদ বললো, 'আমীন'!

এমনিভাবে সব মুজাহিদ পালাক্রমে দু'আ করলো। সবশেষে কমান্ডার সাহেব দু'আয় বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জান, এদেশে রুশ বাহিনীর জবর দখলের পর থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর নির্মম নিপীড়ন চলছে। গ্রামের পর গ্রাম পরিণত হয়েছে বিরাণ ধ্বংস্তূপে। ভেংগে ফেলা হয়েছে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা। আর তোমার নাম স্মরণ করার অপরাধে শহীদ করা হয়েছে লাখো মুমিন বান্দাকে। এসব অন্যায় আমি সইতে পারলাম না। তাই তোমার পথে অস্ত্র তুলে নিলাম। এগুলি যদি তোমার সন্তুষ্টির আশায় করে থাকি তবে আমাদেরকে মদদ কর।'

কমান্ডার সাহেবের দু'আয় মুজাহিদরা আমীন বলতেই বাইরে প্রচন্ড এক বিস্ফোরণ হয়। পাহাড় কেঁপে ওঠে। বিকট শব্দে মনে হচ্ছিলো, বাইরে যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। শব্দ শুনেই মুজাহিদরা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে। এবার সবাই চোখ মেলে দেখলো, গুহার মুখে জমে থাকা হাজার টন মাটি বহু দূরে ছিটকে পড়েছে। এত জলদী দু'আ কবুল হওয়াতে মুজাহিদরা বিস্মিত হলো। অশ্রু ভেজা নয়নে সবাই মহামহীমের দরবারে সেজদাবনত হয়।

ব্যাপারটা হলো, এক ডজন শত্রু বিমান ফাইটার পুনরায় এসে ক্যাম্পের উপর প্রচন্ড বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফাইটার থেকে দু'টি বিরাটকায় বোমা গুহা মুখের স্তূপের উপর বিস্ফোরিত হয়। এতে গুহা মুখে জমে থাকা মাটি ও পাথর বহুদূরে ছিটকে পড়ে। এভাবে আল্লাহ পাক শত্রু বিমান দিয়ে স্বীয় বান্দাদের মদদ করে আপন সর্বময় ক্ষমতার এক ঝলক তার বান্দাদের অবলোকন করালেন।

মুজাহিদরা গুহা থেকে বেরিয়ে হিসেব নিয়ে দেখলো, তাদের এয়ার ক্রাপ্টগানের সবগুলিই ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপনযোগ্য তিনটি কামান ঠিকঠাক আছে। তিনজন মুজাহিদ সেগুলো দ্বারা ফায়ার করে দুশমনের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রেখেছে। ওদিকে শত্রুর বোমারু বিমান থেকে তাদের উপর অজস্র বোমা নিক্ষেপিত হচ্ছে। কয়েকটা বোমা তাদের একেবারে পাশে এসে বিস্ফোরিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের হেফাজত করেছেন। মারকাজের মধ্যে এখনও ত্রিশজন মুজাহিদ বেঁচে আছে। বিশজন আহত এবং বাকী সবাই শাহাদাত বরণ করে মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেছে।

চীফ কমান্ডারের সামনে এখন দু'টি সমস্যা। প্রথমত, আহত মুজাহিদ ও শহীদদের লাশ নিরাপদ কোথাও স্থানান্তরিত করা। দ্বিতীয়ত, রেডিও ষ্টেশন ওয়াগনটা কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া। এখন আর মারকাজ হেফাজত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ করে কমান্ডার সাহেব সিদ্ধান্ত দিলেন, কয়েকজন মুজাহিদ কামান দাগাতে থাকবে। পাঁচজন থাকবে আমার সঙ্গে। বাকীরা এক্ষুণি রেডিও ষ্টেশন সহ গাড়ী, আহত মুজাহিদ ও শহীদদের নিয়ে মারকাজ থেকে বেরিয়ে পড়বে।

এ মারকাজ থেকে কোন কিছু নিরাপদে স্থানান্তর করা সম্ভব মনে হচ্ছিল না। কারণ শত্রু বিমান মুষলধারে বোমাবর্ষণ করে চলছে। উপরন্তু বের হওয়ার সবগুলি পথে রুশ কমান্ডো ওঁৎ পেতে আছে। তারপরও দু'জন মুজাহিদ জীবন বাজি রেখে রেডিও-ষ্টেশন নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো। বাকীরা আহত ও শহীদদের পিকআপে তুললেন। এরপর আল্লাহর উপর ভরসা করে ধীরে ধীরে সামনে রওয়ানা হলো। মারকাজ থেকে বেরুতেই শত্রু বিমান এসে তাদের ওপর বোমা বর্ষণ শুরু করে। কিন্তু ড্রাইভার অত্যন্ত দক্ষ হাতে গাড়ী পার করে নিয়ে আসে। রাস্তায় তারা রুশ কমান্ডোর অগণিত লাশ পড়ে থাকতে দেখে। ওরা বিমান থেকে মাটিতে নামতেই অন্য এক গ্রুপ মুজাহিদ ওদের হত্যা করে। ঐ গ্রুপ এখনও রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু মারকাজের চীফ কমান্ডার সে খবর জানেন না।

কমান্ডার নির্দেশ দিলেন, আমাদের অবশিষ্ট সবগুলি সচল কামান অচল করে দেয়া হোক। যাতে শত্রু বাহিনী সেগুলি দিয়ে আমাদের উপর অতিরিক্ত আক্রমণ চালাতে না পারে। এরপর তিনি সূর্যাস্তের অপেক্ষা করতে লাগলেন। যেন রাতের আঁধারে নিরাপদে সরে যাওয়া যায়।

মিনিট কয়েক পর কমান্ডার শত্রুর বিশাল ট্যাঙ্ক বহর মারকাজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখেন। এর সাথে সাথে মারকাজের ওপর শত্রুর ভারি গোলা এসে বিস্ফোরিত হচ্ছে। কমান্ডার মুজাহিদদের উদ্দেশ করে বললেন, বের হওয়ার রাস্তা শত্রুর ট্যাঙ্ক বহরের দখলে চলে গেছে। তাই সবাই ধীরে ধীরে পিছনের পাহাড়ে আরোহন কর এবং চূড়ার নিকটবর্তী বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নাও।

ধীরে ধীরে সবাই ক্রলিং করে পিছু হটছিলো, যাতে দুশমন তাদের দেখে না ফেলে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসেছে। এ সময় মারকাজের দিকে বোমারু বিমানও ধেয়ে আসে। বোমারু বিমান হতে রশ্মী বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তার আলোয় গোটা এলাকা দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠে।

মুজাহিদরা মহাসঙ্কটে পড়ে যায়। তাদের শত্রুর দৃষ্টিতে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। দু'টি রশ্মীবোমা শূন্যে ঝুলে রয়েছে।

দূর থেকে মুজাহিদরা দেখছিলো, শত্রু ট্যাংক ক্যাম্পের দরোজায় পৌঁছে গেছে। বোমারু বিমান খুব নীচে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

তখন আলী তার ক্লাশিনকভ তাক করল। কমান্ডার ফায়ার করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তার নিষেধবাণী উচ্চারিত হওয়ার পূর্বেই আলীর গুলীতে রশ্মীবোমা ফেটে যায়। পরক্ষণেই আলী দ্বিতীয় ফায়ার করে আরেকটি রশ্মী বোমা অকেজো করে দেয়।

কমান্ডার মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বললেন, এক্ষুণি এ স্থান ত্যাগ কর। এখানে এখন প্রচন্ড বোম্বিং হবে।

মুজাহিদরা অন্ধকারের ভেতর এক দৌড়ে বেশ দূরে চলে এসে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

শত্রুর বোমারু বিমান আবার প্রচন্ড বোম্বিং শুরু করে। মুজাহিদরা পূর্বের স্থানে থাকলে এতক্ষণে হয়ত কারো জীবিত থাকা সম্ভব ছিল না। মুজাহিদদের ধারণা ছিল, বোমারু বিমানের ঝাঁক পুনরায় আসবে। বহুক্ষণ অপেক্ষার পরও বোমারু বিমান ফিরছে না দেখে মুজাহিদরা পাহাড় ছেড়ে নীচে নামতে শুরু করে। সবাই সতর্ক পদে নীচে নামছে। কারণ, রুশী কমান্ডোদের হামলার ভয় আছে।

অর্ধেক পাহাড় অবতরণের পরই তাদের আশংকা বাস্তবে রূপ নেয়। নীচের দিক থেকে ফায়ারিং হচ্ছে। সবাই সটান শুয়ে পড়ে। ক্রলিং বন্ধ করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

চীফ কমান্ডার ভাবছিলেন, আহত মুজাহিদ এবং রেডিও ষ্টেশনবাহী ওয়াগানের কি হল কে জানে।

মুজাহিদরা আশংকা করছিলো, কমান্ডোরা তাদের পিছু নিবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

মাঝরাতে মুজাহিদরা কমান্ডোদের অবস্থানের দিক থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায়। এর ক্ষণিক পর ওখান থেকে দৌড়-ঝাপের শব্দ ভেসে আসে। আলীর ধারণা ছিলো, কোন মুজাহিদ গ্রুপ রুশী কমান্ডোদের ওপর হামলা করেছে। তাই আমাদের উচিৎ ঐ গ্রুপকে সাহায্য করা।

কিন্তু কমান্ডার বললেন, এটা আমাদের ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্যে শত্রুর কোন ষড়যন্ত্রও হতে পারে?

আলী ও অন্যান্য মুজাহিদরা বল্‌লো, এ স্থান থেকে বেরুতে হলে আমাদের বিপদের মুকাবিলা তো করতেই হবে। কমান্ডার অস্ত্র-শস্ত্রের হিসাব নিয়ে মুজাহিদদের মতামতের ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মুজাহিদদেরকে তিন গ্রুপে ভাগ করা হলো, যাতে সবাই এক সাথে আটকা না পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে সবাই কমান্ডোদের অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়।

আলী ও তার গ্রুপের মুজাহিদরা অল্প দূরে যেতেই দেখতে পেলো, দুটি ছায়া তাদের দিকে দৌড়ে আসছে। আলী তাদের দেখতেই ফায়ার খুলে দেয়। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তখনই তাদের দিক থেকে আওয়াজ আসলো, 'আমরা মুসলমান।'

এই অচেনা লোক দু'জন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফারসী ভাষায় কথা বলছিলো। তারা আরও বললো, 'আপনারা মুজাহিদ হলে আমাদের ওপর ফায়ার করবেন না। আমরা দু'জন

মুসলমান রুশী সৈন্য। গোলা-বারুদ নেই আমাদের কাছে। শুধু ক্লাশিনকভ আছে । তা এখনই আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

আলীর এক সঙ্গী বললো, এদের কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

আলী বলল, না, রুশীরা মুসলমান বাসিন্দাদেরকে আফগানীদের সাথে জোরপূর্বক যুদ্ধ করতে বাধ্য করছে। তাই তাদের ওপর গুলী করা ঠিক হবে না। পরন্তু এখন এ দু'জন নিরস্ত্র।

আলী রুশী দু'জনকে লক্ষ্য করে বললো, আপনারা চলে আসুন এদিকে।

আলীর কথা শুনে তারা দৌড়ে আসে। ঠিক সে মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে। দু'জনের একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ওদিক থেকে আওয়াজ আসলো, 'আমার সাথী মারাত্মক আহত হয়েছে। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে একটু সাহায্য করুন।

আলী ও তার সাথীরা তার দিকে দৌড়ে যায়। আহত রুশীর এক পা সম্পূর্ণ উড়ে গেছে। আহত লোকটির জন্য কি করা যায় তা ভেবে পাচ্ছিল না। প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় বাঁচার সম্ভবনাও ক্ষীণ। আলী নিজের কাপড় ছিলে তার আহত স্থান বেঁধে দেয়। কিন্তু রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। লোকটি ব্যথায় কঁকিয়ে উঠছিলো। মুহূর্ত কয়েক পর সে সকলকে উদ্দেশ করে বললো, 'আমার মুসলমান ভাইগণ! আল্লাহ শোকর, আমার অন্তিম আশা পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহর কাছে আমি দু'আ করেছিলাম, আমাকে মুজাহিদদের সঙ্গী হওয়ার তাওফীক দাও। আজ আমি মুজাহিদদের সাহচর্যেই মৃত্যুবরণ করছি।' এটুকু বলে আলীর হাত ধরে চুমু খেতে থাকে।

এরপর আবার বললো, 'মুজাহিদ ভাইয়েরা! অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদ করে যাবে। রুশী মুসলমানদের আযাদী পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখবে। সকল বাতিলের মোকাবেলায় জীবন বাজি রেখে লড়ে যাবে শাহাদাত নসীব হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের সহায় হোন।'

সবাই নির্বাক হয়ে যায়।

আহত লোকটির মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারিত হয়। পরক্ষণেই তার মাথা এক দিকে কাত হয়ে পড়ে। সঙ্গীটি তাকে ঝাপটে ধরে কাঁদতে থাকে। আলী ও অন্যান্য মুজাহিদের চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

শহীদ রুশী লোকটির সঙ্গী কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলছিলো, 'বন্ধু আমার! তুমি রুশী মুসলমানদের আযাদী পর্যন্ত আমার সাথে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে। কিন্তু যাত্রা লগ্নেই বিদায় নিয়ে চলে গেলে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনের অন্তিম নিশ্বাস পর্যন্ত তোমার মিশন নিয়ে অগ্রসর হব, যদিও একাকী যুদ্ধ করতে হয়।'

আলী তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'রুশী বন্ধু আমার! আমরাও তোমার সাথে থাকব। তুমি একা নও। ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি আযাদীপ্রিয় মানুষ তোমার সঙ্গে থাকবে। কারও অশ্রুঝরা দু'আ, কারও সম্পদ আর কারও জীবন-কুরবানী তোমার সঙ্গি হবে। আমাদের সবার মঞ্জিল, আমাদের চলার পথ, আমাদের আল্লাহ, আমাদের দ্বীন, আমাদের দুশমন এক ও অভিন্ন। তাই প্রতিটি আফগানী হবে তোমার চলার পথের একান্ত বন্ধু।'

আলী রুশী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার এ সঙ্গীটি কিভাবে আহত হল।'

সে বল্লো, 'আমরা আফগান কমান্ডোদের অস্ত্রের ডিপো ধ্বংস করে কমান্ডোদের হত্যা করে মুজাহিদদের সাথে মিলিত হবার জন্য এদিকে দৌড়ে আসার সময় আমাদেরই বিছানো মাইনের ওপর অজান্তে পা পড়ে যায়। ফলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাকী কথা পরে বলব। এখন আমাদের কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছা উচিৎ। কমান্ডোদের আরেক গ্রুপ নিকটেই অবস্থান করছে, তাদের হামলা করার আশংকা রয়েছে।

রুশী শহীদের লাশ উঠিয়ে সবাই নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো।

ক্ষণিক পর সবাই অন্য এক ক্যাম্পে পৌঁছে যায়। আশপাশের সব ক্যাম্পের কমান্ডারদের তৎক্ষণিকভাবে তলব করা হয়। মুজাহিদদের প্রধান সমস্যা হলো রুশীদের হাত থেকে হেডকোয়ার্টার্র পুনঃরুদ্ধার করা। সব কমান্ডার স্বীয় মুজাহিদদের নিয়ে উপস্থিত হলে জরুরী মিটিং শুরু হয়ে যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলীকে এ সভায় বিশেষভাবে ডাকা হয়। অধিকাংশ কমান্ডারের মতামত হলো, একমাস অপেক্ষা করে আরও প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আলী বললো, অনতিবিলম্বে নয় আজই আমাদের হামলা করা উচিৎ। কারণ আমরা যেমন হঠাৎ হামলায় পর্যুদস্ত হয়েছি ঠিক তেমনি আচানক হামলায় শত্রুও ঘায়েল হবে। আলীর পুরোনো সঙ্গী মুজাহিদরা তার কথায় সায় দেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, সূর্যাস্তের পর, আজই আক্রমণ করা হবে।

মুজাহিদদের সংখ্যা পাঁচ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। আজ সবাই পরাজয়ের কালিমা মুছে ফেলতে দৃঢ় প্রত্যয়ী। আল জিহাদ, আল জিহাদ শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। এ সময়ে চীফ কমান্ডার তার ঘাড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় সাধারণ মুজাহিদদের সামনে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখে সবাই তাঁর পাশে সমবেত হয়। কমান্ডার তাদের উদ্দেশ করে বলেন, 'দ্বীন ও ইসলামে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার! দুশমনের আকস্মিক হামলায় যদিও আমরা তেমন সুবিধে করতে পারিনি। তবে অল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদদের সাহসী প্রতিরোধ প্রশংসনীয়। এখন আমরা পাঁচ হাজার হলেও দুশমন আমাদের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী। তবে বন্ধুরা! আল্লাহর সুসংবাদ শুন। বহু সময় ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বিরাট দলের উপর বিজয়ী হয়। তাই আমরাও আল্লাহর উপর নিঃসীম ভরসা আর অসীম হিম্মত নিয়ে দুশমনের গর্ব ধূলায় মিশিয়ে দিব। ইনশাআল্লাহ।'

তার বক্তৃতা শেষ হতেই 'নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন কারীব' শ্লোগানে আসমান কাঁপিয়ে মুজাহিদরা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শত্রুবাহিনী মুজাহিদদের এই আকস্মিক আক্রমণে টিকতে না পেরে উর্ধ্বশ্বাসে ভাগতে শুরু করে। কয়েক হাজার শত্রুসেনা নিহত ও পাঁচশ' বন্দী হয়। গনীমত ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ ক্যাম্প পুনরুদ্ধার হয়। সবাই শুকরিয়ার সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। ১০০ মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে।

ওই রুশ মুসলমান সৈনিক আলীর কাছে নিজের দলত্যাগ ও বহু অজানা তথ্য জানালো যে, কিভাবে তাকে রুশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলী তাকে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো।

পরদিন শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদের জানাযার ব্যবস্থা করা হলো। রুশ সৈনিকটিও জানাযায় শরীক হয়েছিলো।

আব্দুর রহমান নামের এই রুশ সৈনিকটি জানাযা অনুষ্ঠানে সমবেত মুসলমানদের পরিবেশ পরিস্থিতি ও মনোভাব দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলো। সে দেখলো, শতশত শহীদের জানাযায় অংশগ্রহণকারী একজনের চেহারায়ও কোন অনুতাপ, দুঃখবোধ নেই, কারো চোখে নেই হতাশার অশ্রু। আপনজনহারা মহিলাদের কণ্ঠেও বিলাপ-আহাজারী নেই।

সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আলীকে জিজ্ঞেস করলো, 'পিতা-পুত্র ভাইদের মৃত্যুতেও এরা এক বিন্দু চোখের পানি ঝরাচ্ছে না, সামান্যতম শোকানুভূতিও এদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না, একি অদ্ভুত ব্যাপার। এরা এতো নিষ্ঠুর কেন?'

আলী রুশ সৈনিককে একজন বৃদ্ধ আফগান মুজাহিদের কাছে নিয়ে গেলো, এই যুদ্ধে যার পাঁচ পুত্রের তিন জনই শহীদ হয়েছে।

বৃদ্ধ মুজাহিদ আব্দুর রহমানের বিস্ময়ভরা প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'বেটা! আফগান জিহাদে এ পর্যন্ত বারো লক্ষের চেয়েও বেশী মুসলমান শাহাদত বরণ করেছে। আমরা ক'জনের জন্য শোক প্রকাশ করব? এরা সবাই তো আমাদের আপনজন। তাছাড়া শাহাদত আল্লাহর বিশেষ উপহার। উপহার তো চোখের পানি দিয়ে নয়-হাসি মুখে গ্রহণ করতে হয়। তুমি কি জান না, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মেনদের জান-মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন।"

আমাদের আপনজনরা আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে শত্রু সংহার করে এবং জীবন দেয়। আল্লাহর দেয়া চির সত্য প্রতিশ্রুতি পালনে এরা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়, যে প্রতিশ্রুতিতে নেই সন্দেহ, সংশয়ের কোন অবকাশ। তবে কেন তাদের মৃত্যুতে মুসলমানরা আনন্দ করবে না? এই মহা সাফল্যে সবাই উল্লাস করুক এটাই তো উচিত।'

বৃদ্ধ আরো বল্লেন, 'বেটা! প্রত্যেক আফগানী মা বিলাপের তরল অশ্রু প্রবাহিত না করে নিজ পুত্রকে উপদেশ দেয়, তোমার জীবন দিয়ে হলেও জিহাদের ঝান্ডাকে উড্ডীন করে রাখবে। ইসলামী পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে কখনো দিবে না। পুত্রের শাহাদতে প্রত্যেক পিতা গর্বানুভব করে যে, আমি শহীদের পিতা হতে পেরেছি।

যুবকরা ব্যর্থতার অশ্রুর পরিবর্তে বন্দুকের গোলায় দুশমনের খুন ঝরিয়ে আত্ম প্রশান্তি লাভ করে। প্রত্যেক শিশুর যৌবনের স্বপ্ন হলো, সে পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করে শাহাদতলাভে ধন্য হবে।

আব্দুর রহমান এমন বিস্ময়কর কথা কেবল তার দাদার কাছে শুনতো। তার দাদা বলতেন, 'মুসলমানরা জিহাদে বের হলে কোনদিন পিছু হটতে জানে না, ব্যর্থতার গ্লানী তাদের কখনও হতাশাগ্রস্থ করে না, কাপুরুষের মতো চোখের পানিতে মুছে না জীবনের যন্ত্রণা।' আজ ঐ সব রূপকথার বাস্তব প্রমাণ আব্দুর রহমান নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছে যে, দাদার বর্ণনা কোন রূপকথা ছিল না, অবিশ্বাসীদের কাছে অসত্য হলেও মুসলমানদের ইতিহাসে এ ছাড়া ভিন্নরূপ নেই।

এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান ও আলীর মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। সময় পেলেই তারা পরস্পরে জীবনের নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় ডুবে যেত। একদিন আব্দুর রহমান বললো, সে ছিল তুর্কিস্তানের অধিবাসী। তাকে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে রুশ সরকার ভর্তি করে আফগান রণাঙ্গনে ঠেলে দেয়। আলীর জিজ্ঞাসায় সে রুশ মুসলমানদের অবস্থা সবিস্তারে বলতে লাগলোঃ

রুশ মুসলমানরা বহুদিন যাবত কম্যুনিষ্ট নির্যাতনে পিস্ট হচ্ছে। ছয় বছর আগে মৃত্যু বরণকারী আমার দাদা বলতেন, কম্যুনিস্টদের আগে রাশিয়ায় ছিল জার শাসক। প্রজাপীড়ন ও অত্যাচারী জালেম শাসক হিসাবে জারদের কোন উদাহরণ নেই। মুসলমানরা অত্যাচারী জার শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিল। কিন্তু শাসকদের তুলনায় মুসলমানদের সামরিক শক্তি মোটেই ছিল না, তদুপরি মুসলমানরা ছিল শতদলে বিভক্ত। বাইরের কোন মুসলিম দেশও তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। ফলে আস্তে আস্তে মুসলমানদের সকল এলাকা জার শাসকদের কব্জায় চলে যায়। রাশিয়ানরা মুসলমানদের সকল ভূ-সম্পত্তি দখল করে বাড়ী ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়, সকল মসজিদ মাদ্‌রাসা থেকে মুসলমানদের উৎখাত করে এবং তা ধ্বংস করে দেয়। ১৭৪২ সালে শুধু কাজান জেলাতেই ৫৪৬ টি মসজিদ ধ্বংস করে সে জায়গা খৃষ্টানদের দখলে ছেড়ে দেয়া

হয়। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে তাদের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করেছিল রাশিয়ানরা।

ইউক্রেন, আজারবাইজান ও তাজাকিস্তানের মুসলমানরা শাসনক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল বটে, তবে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ইমাম শামেল পৃথিবীর সর্ব প্রথম গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। তার এই গেরিলা যুদ্ধ ১৮৫৯ পর্যন্ত অব্যহত ছিল। তিন লক্ষ রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করেছিলেন তিনি। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত রুশ বাহিনী মোকাবেলায় অপরাপর মুসলিম শাসকবর্গের সাহায্য সহাযোগিতা না পাওয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি। ইমাম শামিলের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় সময়কন্দ, বুখারা, খাওয়ারেজম প্রভৃতি শহর রাশিয়া পদানত করে মযবুত দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

জার অপশাসনে সোভিয়েত রাশিয়ার মুসলমানরা নির্মম অত্যাচারে নিপিষ্ট হচ্ছিলো। নিরাশার আঁধারে তলিয়ে গিয়েছিলো মুসলমানদের মুক্তির স্বপ্ন । ১৯১৭ সালে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশ মুক্তির আশায় বুক বেধে ছিল। কারণ লেনিন কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ম্যানুফেষ্টে মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিলো যে, জারদের কবল থেকে মুক্তিলাভের পর তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। এই মিথ্যা আশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়ে বহু অদূরদর্শী মুসলিম নেতা লেনিনের বিপ্লবে শক্তি বর্ধন করেছিলেন। ক্ষমতার লৌহদন্ড কব্জা করার পর লেনিন ও তার কম্যুনিস্ট সহযোগীরা এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। বস্তুবাদী কম্যুনিস্টদের কাছে প্রতিশ্রুতির কোন গুরুত্ব নেই। লেনিনকে যখন তার কৃত প্রতিশ্রুতির কথা মুসলিম নের্তৃবৃন্দ স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন নাস্তিক লেনিন বললেন, 'প্রতিশ্রুতি! সে তো এক কাগুজে ব্যাপার। এসবের কি মূল্য আছে?'

মুসলমানরা তাঁকে বুঝালেন, আমরা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে থাকি।

জবাবে লেনিন বলেছিলেন, 'তাহলে তোমাদের বাপ-দাদারাও ছিলো অজ্ঞ ও মূর্খ।'

কম্যুনিস্ট শাসকরা জার শাসকদের চেয়ে আরো ভয়ংকর জুলুমের দুঃশাসন জারি করলো। জার আগমনের পর যেটুকু সহায়-সম্পদ, ঘর-দোর, জায়গা জমি মুসলমানদের কব্জায় ছিল, কম্যুনিস্ট যাঁতাকলে তা-ও মুসলমানদের হাতছাড়া হলো। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা হলো। এক পর্যায়ে মুসলিম নের্তৃবৃন্দ কম্যুনিস্ট জালেমদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। কিন্তু ততদিনে সময় অনেক গড়িয়ে গেছে। কম্যুনিষ্ট শাসকরা একদল স্বার্থান্বেষী মুসলমানকে হাত করে নিজেদের পক্ষে প্রচারণায় লাগিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরালো। কেনা গোলামের মতো ঐসব মুসলিম দালালরা কম্যুনিজমকে ইসলামাইজড করার অপচেষ্টায় বহুলাংশে কৃতকার্য হলো। শক্তিশালী অস্ত্রধারী বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট বাহিনীর সাথে অল্প দিনেই পরাস্ত এবং প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো জিহাদরত মর্দে মুমিনদের সংগ্রামী কাফেলা।

আব্দুর রহমান আরো বললো, কম্যুনিস্ট বিপ্লবের সময় আমার দাদা ছিলেন টগবগে তরুণ। স্বাধীনতার প্রেরণা এবং ইসলামী উজ্জীবনী শক্তিতে তার হৃদয়তন্ত্রী ছিলো টইটম্বুর। ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার মরণপণ জিহাদে আমার দাদাও অংশ নিলেন। স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ঈমানী শক্তি নিয়ে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বহু যুবক-তরুণ তাদের জিহাদী কাফেলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। ছেলে বুড়োরাও তাদের সর্ব শক্তি নিয়ে জিহাদে সহযোগিতা করেছে। জায়া-কন্যা-জননীরা কানের দুল, গলার হার, হাতের কাঁকন, আংটি খুলে দিয়েছিলো জিহাদের তহবিলে।

মুসলমানরা তুর্কিস্তানে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো; বুখারায়ও মুসলমানদের শাসন কায়িম হয়েছিলো। কিন্তু কম্যুনিস্ট পশুদের সহ্য হলো না মুসলমানদের স্বাধীনতা ও রাজ্য শাসন। শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সোভিয়েত কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের স্বল্পসংখ্যক বাহিনীর উপর আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে দিলো। অন্য দিকে কম্যুনিস্ট কুচক্রীদের কেনা দাসানুদাস মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও বিভ্রান্তি ছড়ালেন যে, কম্যুনিজম একটি অর্থনৈতিক বিপ্লব। হত দরিদ্র মানুষদেরকে পুঁজিবাদের কবল থেকে মুক্তি দেয়াই এর উদ্দেশ্য। ইসলাম তথা ধর্মের সাথে এর কোন সংঘাত নেই। একদিকে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত ও অনৈক্য, অন্যদিকে আধুনিক অস্ত্রের অভাবে সীমিত সংখ্যক মুজাহিদের শেষ তড়ফানী অল্পদিনের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে গেলো। মুসলিম সাম্রাজ্যের হৃৎপিন্ড চলে গেলো কম্যুনিস্টদের হাতের মুঠোয়।

কাবুলের রুশ শাসকরা এখন মুজাহিদদের লুটেরা, ডাকাত, সন্ত্রাসী হিসেবে প্রচার করছে এবং গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে অধিবাসীদের হত্যা, লুন্ঠন, ধর্ষণ ও বিতাড়িত করছে। এই দুস্কর্মের দায়ভার মুজাহিদদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তারা স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। এভাবে কম্যুনিস্ট রুশ শাসকরা তাজিকিস্তানের মুসলমান, মুজাহিদদের উপরও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিলো। রুশরা তাজিকিস্তানী মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের 'বিসমাচ' আখ্যা দিয়েছিলো। যার অর্থ 'লুটেরা'। কিন্তু রুশ মুসলমানরা এই অপবাদকে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা হিসেবে গ্রহণ করে তাদের আন্দোলনের নাম দিয়ে ছিল 'বিসমাচ' আন্দোলন।

আব্দুর রহমান বললো, তার দাদাও "বিসমাচ" আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কম্যুনিস্ট শাসকরা তাই দাদার পরিবার-পরিজনের ওপর অকথ্য নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালিয়েছিলো। তাদের বাড়ী-ঘর থেকে উৎখাত করে সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলো, এমনকি দাদার এক ভাই, দুই বোনও দাদা-দাদীকে ঘরে আবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো রুশ বাহিনী। কম্যুনিস্ট জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় দাদার এক বড় ভাইকে রুশ বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রের মুখে একটি কাগজে এই মর্মে দস্তখত নিতে চেয়েছিলো যে, "বিসমাচ" সন্ত্রাসীরা আমাদের ঘর জ্বালিয়েছে, মসজিদ গুড়িয়ে দিয়েছে, কুরআন শরীফের অবমাননা

করেছে। কিন্তু দাদার ভাই মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে অস্বীকার করলে তাকে জ্বলন্ত সিগারেট দ্বারা সমস্ত শরীর দগ্ধ করা হয়, নির্মমভাবে একটি একটি করে অঙ্গে ছুরি চালিয়ে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করে বাড়ীর কাছেই একটি নালায় তার লাশ ফেলে রেখে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী এক প্রতিবেশীর কাছে পরবর্তীতে দাদা এসব কাহিনী শুনেছিলেন।

দাদা আমাকে বলেছিলেন, দীর্ঘ দিন গেরিলা যুদ্ধের পর শেষ পর্যায়ে আমরা দুর্গম পাহাড়কেই আমাদের আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। সুযোগ পেলেই লাল বাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ করে ওদের পর্যুদস্ত করে দিতাম। যদিও রুশ বাহিনী সংখ্যায় বিপুল, অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত, আর আমাদের সেনাশক্তি, অস্ত্র ও রসদ ছিল খুবই সামান্য। যার ফলে বেশী দিন সীমিত রসদ ও পুরনো অস্ত্র দিয়ে আমাদের পক্ষে রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় অবিচল থাকা সম্ভব হলো না। আহারাদির অভাবে মুজাহিদদের গাছের ছাল-পাতা পর্যন্ত খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। আমাদের কমান্ডার ছিলেন একজন জানবাজ বীর পুরুষ। মাত্র দু'হাজার মুজাহিদ নিয়ে তিনি বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী রুশ বাহিনীর ঘেরাও ভেদ করে আমু দরিয়া পার হয়ে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। কিন্তু আফগান শাসকরা তাদের নিরাপত্তা না দিয়ে বরং ধোকা দিয়ে রুশ বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তখন আফগানের মাজারী শরীফের গভর্নর ছিলো রুশ শাসকদের অনুগত এক গাদ্দার।

এ সব কথা শুনে আলী অত্যন্ত মর্মাহত হলো।

সে জানতে চাইলো, সত্যিই কি তৎকালীন আফগান শাসকরা মুসলমানদের সাহায্য না করে রুশদের সাথে দোস্তী করেছিলো?

হ্যাঁ! আমার দাদা বলতেন, রুশ মুসলমানদের ওপর কম্যুনিস্ট শাসকরা যেমন অত্যাচার জুলুম করেছে তেমনি আফগান মুসলিম শাসকরাও রুশদের সাথে মিলে কম জুলম করেনি। তিনি আফসোস করে বলতেন, প্রতিবেশী আফগান সরকার যদি আমাদের সাহায্য করতো, তবে আমরা রুশ কম্যুনিস্টদের শুধু পতন ঘটিয়েই ক্ষ্যান্ত হতাম না, রাশিয়ায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব ছিল । কিন্তু দুর্ভাগ্য, যাদের কর্তব্য ছিল আমাদের সাহায্য করা, তারাই আমাদের দুশমনদের বন্দুকের নলের সামনে ঠেলে দিয়েছিলো।

আলী বললো, হ্যাঁ! যদি সেদিন আফগানিস্তানের শাসকরা এই মারাত্মক ভুল না করতো, তাহলে আজ তাদের বংশধরদের গোলামীর বেড়ীতে বাঁধা পড়তে হতো না।

আব্দুর রহমান বললো, অবশ্যই। আজ তোমরা আফগানিস্তানের পাহাড়ে যে যুদ্ধ করছো, তখন সাহায্য করলে আমরা রাশিয়ার পাহাড়েই এই রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করতাম। আফগানিস্তানে রুশ বাহিনী প্রবেশের দু'মাস পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পর দাদা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আমাকে বলেছিলেন, আফগানিস্তানের এই অবস্থা হবে সে আশংকা আগেই করেছিলাম। আফগানিস্তানের শাসকরা যখন

আমাদেরকে স্থান না দিয়ে পুনরায় আমাদেরকে রুশদের তোপের মুখে ঠেলে দেয়, তখন আমার এক সাথী-মুজাহিদ বলেছিলেন, হে আফগান ভাইয়েরা! আমাদেরকে দুশমনদের তোপের মুখে এভাবে নিক্ষেপ করো না। আমরা যে শুধু রুশ মুসলমানদের জন্য লড়াই করছি তা নয় বরং আফগানিস্তান ও সমস্ত দুনিয়ায় ইসলামের মর্যাদা ও মুসলমানদের আযাদী রক্ষার জন্যই আমরা লড়ে যাচ্ছি, সে কথা তোমরা কেন বুঝতে পারছো না?

সে ছিলো ইতিহাসের ছাত্র। সে ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলো, লাল কম্যুনিস্ট বাহিনীর আগ্রাসন যদি রাশিয়ার জমীনে দমন না করা য়ায়, তবে তা শুধু রাশিয়াকেই গ্রাস করবে না, পুরো দুনিয়াকেই নিজের কব্জায় নেয়ার চেষ্টা করবে, যে ষড়যন্ত্রের থাবা থেকে আফগানিস্তান কোনো ক্রমেই মুক্ত থাকতে পারবে না।

আলী বললো, আফগানিস্তানের বর্তমান মুজাহিদ নেতৃবৃন্দও বলছেন, তারা শুধু আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেই যুদ্ধ করছেন না, বরং পাকিস্তান, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তাও এই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের সাথে জড়িত।

এটা কোন অযৌক্তিক কথা নয়, বললো আব্দুর রহমান। সেদিন রুশ মুসলমানদের কথা আফগান শাসকরা বোঝার চেষ্টা করেনি, আজ যদি আফগানদের কথা অন্যান্য মুসলিম শাসক বুঝতে ভুল করে, তবে তাদেরও নিশ্চিত আফাগানদের ভাগ্য বরণ করতে হবে।

অনেক্ষণ চুপচাপ কেটে গেলো। কেউ কোন কথা বললো না। আলী নীরবতা ভেঙ্গে বললো, তুমি তোমার দাদার কথা বলেছিলে,তাকে গ্রেফতার করে রুশ বাহিনী নিয়ে গেলো। তার পর সেখানে কি ঘটেছিলো?

সেদিন যারা রুশ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলো তাদের মধ্যে কম সংখ্যকই মুক্তি পেয়েছিলো। কম্যুনিস্ট জালিমদের অবর্ণনীয় অত্যাচার-নিপীড়নে তিলে তিলে মৃত্যুর শীতল কোলে ঢলে পড়েছিলো বেশির ভাগ মুজাহিদ। অসহ্য নির্যাতনের পরও কিছু লোক বেঁচে ছিলো কারাগারে। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জার্মানীর নাজী বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোর প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। তখন সোভিয়েত শাসকরা কয়েদীদের সাথে এই বলে এক চুক্তি করল যে, তারা জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, এই শর্তে তাদের মুক্তি দেয়া যেতে পারে। সেই সুযোগে আমার দাদাও ছাড়া পেয়েছিলেন।

তবে দাদা ছাড়া পেয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলেন। তিনি খুবই মর্মাহত হন। তার অন্তরে রুশদের প্রতি প্রতিশোধের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। আজীবন তিনি রুশ কম্যুনিস্ট বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। যদিও বাহ্যত নিষ্ক্রিয় ছিলেন, কিন্তু সঠিক সময়ে তার মুখ থেকে কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ এবং ইসলাম ও মুসলিম নির্যাতনের জন্যে রুশদের নিন্দা জানাতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। যার ফলে বৃদ্ধ বয়সেও একবার তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিলো। তবে আমার

আব্বা স্থানীয় কম্যুনিস্ট দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়ার সুবাদে তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর রাশিয়ার বস্তুবাদী শাসকগোষ্ঠী ইসলামকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা ও হেয় প্রতিপন্ন করে অগণিত বই পুস্তক রচনা করেছে। মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে আস্তাবল, নাইট ক্লাব, নাট্যশালা, সিনেমা হল, যাদুঘরে রূপান্তরিত করেছে। মাত্র কয়েকটি মসজিদ-মাদ্রাসা সরকারী নিয়ন্ত্রণে খোলা রাখা হয়েছিল বহিঃর্বিশ্বকে ধোকা দেয়ার জন্যে। সেখানে সরকারী কম্যুনিস্ট মোল্লা-মৌলভীরা লোক দেখানো নামায ও তালিম করতো। এভাবে নতুন প্রজন্মকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিলো। তাদের জানার সুযোগ ছিলো না ইসলামী আদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আজো রাশিয়ায় খুব কম সংখ্যক মুসলিম পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরকে ইসলামী আদর্শ ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানদান করার সুযোগ আছে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলাম বিরোধী শিক্ষা দেয়া হয়। যার ফলে পারিবারিক অঙ্গনে কোন শিশু ইসলামী জ্ঞান লাভ করলেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে আপন ঐতিহ্যকে ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

ভাই আব্দুর রহমান! তোমার ভেতরে এ পরিবর্তন কি করে হলো, তুমি কিভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করলে? আলী জিজ্ঞেস করলো।

এ সবই আল্লাহর মেহেরবানী এবং আমার দাদার শিক্ষার ফল। তিনি আমাকে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমানদের সোনালী ইতিহাসের সাথেও পরিচয় করিয়েছেন। সেই সাথে জার ও কম্যুনিস্ট শাসকদের কুকীর্তি, জুলুম-অত্যাচার সম্পর্কেও আমাকে অবহিত করেছেন। কিন্তু তার পরও আমি যখন দশম শ্রেনীতে পড়ি তখন স্কুলের অনৈসলামিক রীতিনীতি, ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার আমার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধার জন্ম দেয়। তবে আল্লাহর শুকরিয়া যে, দাদা তখনও বেঁচে ছিলেন। যে কোন নতুন ভাবনার উদ্রেক হলেই আমি দাদার সাথে এ নিয়ে আলোচনা করতাম। আর দাদা আমার ভ্রান্ত ধারণাগুলো অকাট্য যুক্তি দ্বারা খন্ডন করে দিতেন। আমি সঠিক ধারণা পেতাম।

একদিন শ্রেণী কক্ষে একজন শিক্ষক তার ভাষণে বললেন, কার্লমার্কস বলেছেন, 'ধর্ম সাধারণ মানুষের জন্য আফিম স্বরূপ। আফিম যেমন মানুষের জীবন বিনাশ করা ছাড়া কোন উপকারে আসে না, ধর্মও সমাজ জীবনে কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, ধর্ম মানব জীবন উন্নয়নে একটি বড় বাধা, ধর্ম মানব জীবনের উন্নতির অন্তরায়, উত্তরণের প্রতিবন্ধক এবং ধর্ম মূর্খতার বিস্তার ঘটায়।'

স্কুল থেকে ফিরেই আমি দাদাজানের নিকট একথা বললাম। দাদাজান বললেন, 'বৎস! আফিম একটি নেশা। আফিম খোর রাস্তায় টাল হয়ে পড়ে থাকে; তার না থাকে নিজের কোন অনুভূতি না অন্যদের কোন খবর। নেশা মানুষের মধ্যে আলস্য ও কর্ম বিমুখতা আনে। হয়ত কোন ধর্ম নেশা গ্রহণকে সামাজিক বৈধতা দিয়েছে। কিন্তু

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। ইসলাম মানুষকে কর্মবিমুখ করে না, বরং কর্মে উৎসাহিত করে। যদি ইসলাম কোন নেশা হতো, তাহলে মুসলমানরা নেশাগ্রস্থের মতো টাল হয়ে রাস্তা-ঘাটে বেহুঁশ হয়ে থাকত। কোন মুসলমানকে তুমি এরূপ রাস্তা-ঘাটে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছো, কোন নেশাখোরকে কি কখনও যুদ্ধের ময়দানে তিনজনকে পরাস্ত করতে শুনেছো? কিন্তু বদর যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত শক্তিশালী এক হাজার বাহিনীকে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলো। এর পর দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানরা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার বৃহদাংশ জয় করে নিলো। কোন নেশাগ্রস্থ জাতি এমন ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করতে পারে কি?

বলা হয়, ধর্মের নামে পৃথিবীতে যতো নরহত্যা ও ধ্বংসলীলা হয়েছে অন্য কোন বিষয়ের আশ্রয়ে এমন হয়নি। ইসলাম সম্পর্কেও এমন ধ্বংসাত্মক কর্মের অভিযোগ করা হয়। ইসলামের সকল বিজয় হত্যা ও ধ্বংসের দ্বারা অর্জিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

আমার এ অভিযোগের জবাবে দাদা বললেন, তোমার আগের প্রশ্ন পরের প্রশ্নের সম্পূর্ণ বিপরীত। আগে বলা হয়েছে, ধর্ম সমাজ-সভ্যতার জন্য নেশা স্বরূপ। আর দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে, ধর্ম মানুষের মধ্যে যুদ্ধের উম্মাদনা সৃষ্টি করে। তুমি ইতিহাস খুলে দেখো, মুসলমান কখনও আগে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়নি। বদর, ওহুদ, হুনাইন, ইয়ারমুক কোনটিতেই মুসলমান আগে অগ্রসর হয়নি। তুর্কি ও পারস্যের যুদ্ধেও ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে পারসিক রাজন্যবর্গ আগে যুদ্ধ ঘোষণা করে, পরে ময়দানে তারা পরাস্ত হয়েছে। ভারতেও মুহাম্মদ বিন কাসিম তখনই এসেছিলেন, যখন ভারতে রাজা দাহির মানবতাকে পদদলিত করেছিলো, সেই সন্ধিক্ষণে মানবতার মুক্তিদূত হিসেবে ভারতের মাটিতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আগমন। নির্যাতিত মানুষ ভূত পূজারীদের জুলুম থেকে মুক্তির জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সাদরে গ্রহণ করেছিলো।

স্পেনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবে, তারেক বিন যিয়াদকে স্পেনের নির্যাতিত মানুষ অত্যাচারী শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যে সাহায্য করতে আবেদন জানিয়েছিলো। অন্য কোন ধর্মে এমন কোন নজীর নেই। একমাত্র ইসলামের বেলায় একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়, সারা বিশ্বে ইসলাম শান্তি-সুখের বার্তা নিয়ে এসেছে। যেখানেই ইসলামের বাণী নিয়ে মুসলমানরা আবির্ভূত হয়েছে, সেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচুর্য ও শান্তি-সুখের ঢল নেমেছে। রাশিয়ার অতীত ইতিহাস খুলে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে, ইসলাম আগমনের পূর্বে এখানকার মানুষ কত অন্ধকার ও অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত ছিলো, হিংস্রতাই ছিল এ সমাজের জীবনাচার। এখানে হত্যা, লুণ্ঠন, কাটাকাটি ধর্মের নামে নয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের কারণেই সংঘটিত হতো।

তুরস্কে যখন ইসলামের শুভাগমন হলো, তখন তুর্কীরা পেলো মুক্তি ও সান্তির স্বাদ, তুর্কীস্তান হলো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পীঠস্থান। জন্ম নিলো এ মাটিতে স্বরণীয় বহু মুসলিম

মনীষী। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযীকে বুকে লালন করে ধন্য হলো মধ্য এশিয়ার মাটি।

শিল্প-বিজ্ঞানে এ অঞ্চল অভাবনীয় সমৃদ্ধি অর্জন করলো। মুসলমানদের দ্বারাই এখানে গড়ে উঠেছিলো বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা ও জ্যোতিষসহ বহু বিদ্যাপীঠ। দার্শনিক খসরু, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনা, খাওরেজমী, আলবেরুনীর মতো মহামনীষীদের জন্ম এ ভূখন্ডে হয়েছে। ইসলামী চেতনা ও ধারণা লালন করেই তারা বিখ্যাত হয়েছেন। মোট কথা, ইসলাম আমাদেরকে মূর্খতার অন্ধ গলি থেকে বের করে আলোকোজ্জ্বল সোনালী পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছে।

দাদা বল্‌লেন, মুসলিম সেনাবাহিনী কখনও কোন নারী, শিশু ও বৃদ্ধ লোকের ওপর হাত উঠায়নি। জ্বালিয়ে দেয়নি কোন শস্যক্ষেত-ঘরবাড়ী। দুঃখের বিষয়, অমুসলিম, নাস্তিক, ইহুদী, খৃষ্টানরা ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। তারা বিগত দিনে কি করেছে, এরা নারী, শিশু, বৃদ্ধাদের নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ করেনি? এরা বাড়ীঘর, ফসল, শস্য ক্ষেত বিনষ্ট করেনি? এরাই তো ধর্মীয় গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। প্রকৃত পক্ষে ইসলামই শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধারক। ধর্মহীনতা তথা কম্যুনিজম জুলুম অত্যাচারেরই প্রতীক। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আখেরাতে জবাবদিহিতার ভয় থাকে, তারা কারো উপর জুলুম-নিপীড়ন চালাতে আল্লাহকে ভয় করে, কিন্তু কম্যুনিস্ট নাস্তিকদের এ ভয় নেই বলে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না।

আমি বল্‌লাম, দাদাজান! আমাদের শিক্ষক তো বল্‌লেন, আল্লাহ বলতে কোন মহাশক্তির অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টিকর্তা বলে কোন মহাশক্তি থাকলে অবশ্য তা দৃশ্যমান হতো। পৃথিবীর গাছ-পালা, জীব-জন্তু সব কিছুই প্রাকৃতিক বিবর্তনের সৃষ্টি, এগুলো কারো সৃষ্ট নয়।

দাদা বলেন, 'প্রিয় বৎস! কম্যুনিস্ট নাস্তিকরা বস্তুবাদী—দৃশ্যমান বস্তুতে বিশ্বাসী। এ জন্য ওরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। ওরা বলে, সকল বাস্তব বস্তুই দৃশ্যমান হওয়া জরুরী। কিন্তু ওদের এই খোড়া যুক্তি মিথ্যা। তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে, আমাদের ঘরে যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতকে তো আমরা দেখতে পাই না। তাই বলে কি বিদ্যুতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে?

দাদাজান! তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহমান বিদ্যুত দেখা যায় না বটে, তবে বৈদ্যুতিক তারে হাত লাগালে অনুভব করা যায় যে তারে বিদ্যুত আছে।

দাদাজান বল্‌লেন, প্লাষ্টিকের মোজা হাতে দিয়ে তুমি বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারে স্পর্শ করলে কি বিদ্যুতের প্রবাহ অনুভব করতে পারবে? মোটেই পারবে না। ঠিক তেমনি আল্লাহর অস্তিত্ব মানুষ তখনই অনুভব করতে পারবে, যখন মন-মগজ থেকে নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের আবরণ দূর করে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করবে। তারবাহিত বিদ্যুৎ যেভাবে বাল্ব জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করে দেয়, ঈমানের জ্যোতি হৃদয়ে

প্রবেশ করলে সকল নাস্তিকতার আঁধার তখন দূর হয়ে যায়, তখন পৃথিবীর সব কিছুতেই সে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে।

বেটা! কম্যুনিস্টরা বলে, পৃথিবীর সব কিছু প্রাকৃতিক বিবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে। আমি যদি বলি, উঠোনে রাখা তোমার আব্বার মটর সাইকেলটা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে কি তুমি তা বিশ্বাস করবে?

কখনও না। মটর সাইকেল কি আর এমনিতেই তৈরী হয়। এটাকে মটর ইন্ডাস্ট্রিতে ইঞ্জিনিয়াররা তৈরী করেছে।

এবার দাদাজান বললেন, এই ছোট্ট একটি গাড়ি যদি ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া তৈরী না হয়, তবে এই বিশাল মহাবিশ্ব, সকল সৃষ্টি আর জটিল তন্ত্রীসমৃদ্ধ মানুষ কেমন করে সৃষ্টি হলো? যে মানব দেহের জটিলতা আবিষ্কার করে এখনও বড় বড় বিজ্ঞানীরা গলধঘর্ম হচ্ছেন। এসব জটিল, সূক্ষ্ম, দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুকে যে মহান সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন, তাকেই আমরা 'আল্লাহ' বলি। মটর সাইকেল দেখে তোমরা বিশ্বাস করো যে, এটা কোন ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করেছেন, কিন্তু আফসোসের বিষয়, এ বিশাল পৃথিবী ও সৃষ্টিজগত দেখেও বিশ্বাস করতে চাও না, এটার পিছনেও যে কোন কারিগর আছেন। এই বিশ্বের যদি কোন সৃষ্টিকর্তা বা নিয়ন্ত্রক না থাকতেন, তাহলে রোজ রোজ সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত হতো না, গ্রীস্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তের আগমন ঘটতো না নির্দিষ্ট সময়ে। বেটা! এই বিশাল বিশ্বকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যার কোন নিন্দ্রা-তন্দ্রা আসে না, যার শক্তি-সামর্থের সীমা-পরিসীমা নেই। সর্বময় ক্ষমতার যিনি একচ্ছত্র অধিকারী। আর সেই মহাশক্তির নামই 'আল্লাহ'। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

আমি বল্লাম, দাদাজান! আমাদের শিক্ষক একদিন বলেছেন, ধর্ম একটি অর্থহীন মতবাদ। ধর্মাচারে অনর্থক মানুষ সময় অপচয় করে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে জীবনের বহু মূল্যবান সময় মুসলমানরা ব্যয় করে ।

দাদাজান বলেন, এটা প্রশ্নের পাল্টা প্রশ্ন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সর্বমোট পৌনে এক ঘন্টা বা এক ঘন্টা সময় লাগে। চব্বিশ ঘন্টায় যদি আমরা আল্লাহর ইবাদতে মাত্র একটি ঘন্টা ব্যয় করতে না পারি তবে আমাদের বিরাট প্রাপ্য তো একেবারে সস্তা হয়ে যায়। যে নামাযের বিনিময় আল্লাহ আখেরাতে আমাদের দেবেন নেয়ামতে পূর্ণ সুন্দরতম জান্নাত। বিশেষ করে আল্লাহর দিদারের বখশিশ। বেটা! নাস্তিক কম্যুনিস্টরা দিন রাতের অধিক সময় টেলিভিশন, সিনেমা, ক্লাব, মদ্যশালায় কাটিয়ে দেয়, সেসব ওদের কাছে সময়ের অপচয় বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, কম্যুনিস্টরা আল্লাহকে মানতে চায় না, আল্লাহর কথা ওদের কাছে বিষময় লাগে, ভালো লাগে না।

এভাবে দাদাজান আমাকে তিল তিল করে ইসলামের আকীদা বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করেছেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বুঝিয়েছেন, ইসলামের কি আদেশ-নিষেধ রয়েছে।

একদিন আমার আম্মুর সাথে দাদাজানের ঝগড়া হলো। আম্মুর অভিযোগ ছিল, দাদাজান তার এক মাত্র ছেলেকে ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে না আবার কোন বিপদে ফেলে

দেন। তিনি জানতেন না যে, দাদাজান আমাদের ঘরোয়া আলোচনা ঘুণাক্ষরেও বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিতেন। তিনি বলতেন, বৎস! কখনও আমাদের দু'জনের কথাবার্তা বাইরের কারো কাছে বলবে না। আমি চাই না, তুমি কম্যুনিস্ট জালেমদের কোন ফাঁদে ফেঁসে যাও!

দাদাজানের প্রতিবাদে বললাম, ইসলামই যদি সত্য হবে, তাহলে সত্য আমরা চেপে রাখবো কেন, কম্যুনিস্ট জালেমদের কাছে সত্যের দাওয়াত দেয়া তো আমাদের কর্তব্য।

দাদাজান বললেন, বেটা! সংকল্প,বাস্তবতা আর কৌশল এ গুলোর ক্ষেত্র এক নয়। নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশিত পথই আমাদের সর্বোত্তম অবলম্বন। নবীজী (সাঃ) প্রথম দিকে ক'বছর প্রতিকূল পরিবেশে সংগোপনে দাওয়াতের কাজ করেছেন। তদ্রূপ আসহাবে কাহফের ঘটনাও আমাদের জানা। তারা জালিম শাসকের অত্যাচারে নিজেদের দ্বীন-ধর্ম নিরাপদ রাখার জন্য গুহাবাসী হয়েছিলেন। আমাদের এখনও প্রকাশ্যে কাজ করার সময় আসেনি। এখন আমরা অত্যাচারী কম্যুনিস্টদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নই। তদুপরী প্রতিকুল পরিবেশেও আমাদেরকে ঈমান ও ইসলাম বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকতে হবে, জেনে বুঝে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া উচিত হবে না। অপেক্ষা করতে হবে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সময়ের, যখন আমরা রুশ ভল্লুকদের বিষদাত ভেঙ্গে দিতে পারবো, মুসলমানরা সরাসরি কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার মতো শক্তিতে বলিয়ান হবে।

আব্দুর রহমান জানালো, সে তার বিজ্ঞ দাদার পরামর্শে কম্যুনিস্ট ছাত্র সংগঠন 'কসমোসল' এ যোগদান করে। তার দাদা বলেছিলেন, রাশিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে অন্ততঃ প্রকাশ্যে তোমাকে কমুনিস্ট সাজতে হবে। ইচ্ছা থাকলে কম্যুনিস্ট সংগঠনে যোগ দিয়েও তুমি মুসলমানদের সাহায্য করতে পারবে, কমুনিস্ট পরিচয়ের আড়ালে মুসলমানদের সাহায্য করা অনেকাংশে তোমার পক্ষে সহজ হবে।

'কসমোসল' সম্পর্কে আলী জানতে চাইলে আব্দুর রহমান বললো, 'কসমোসল হলো কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় সব চেয়ে বড় ছাত্র সংগঠন। কসমোসল সদস্যদের লেখা পড়া শেষে চাকুরী পেতে তেমন বেগ পেতে হয় না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ওদের কোন সময় সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় না।

নিজ জীবনের ঘটনা জানাতে গিয়ে আব্দুর রহমান বলল, তখন ১৯৮৪ সাল। একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে কোর্স শেষ করেছি মাত্র। তখন আমাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার আহবান করা হলো। এক বছর কঠোর ট্রেনিং দেয়ার পর আমাদের বলা হলো, 'তোমাদেরকে আফগানিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। পাকিস্তান, চীন, আমেরিকার আগ্রাসী সেনাবাহিনী সেখানের নিরস্ত্র নাগরিকদের খুন ঝরাচ্ছে, তোমরা আফগান নাগরিকদের সাহায্যের জন্য যাচ্ছো। ভিডিও ফিল্মে আমাদের দেখানে হলো যে, আফগানিস্তানে বিদেশী সৈন্যরা সাধারণ নাগরিকদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে।

আমি কখনও রুশদের এসব কথা ও ভিডিও দৃশ্য বিশ্বাস করিনি। আমার দাদা কমুনিস্টদের সকল ষড়যন্ত্র, অপকৌশল এবং প্রতারণা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছিলেন। আফগানিস্তান পাঠাবার সিদ্ধান্তে কম্যুনিস্টদের গড়া জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতির জন্য আমি সুখানুভব করছিলাম। কিন্তু এ ভেবে দুঃখবোধও হচ্ছিল, কখন না জানি আমার বুলেটে কোন মুসলমানের জীবন ঝরে যায়। আমার একটা কৌতূহল ছিলো যে, মুসলমান মুজাহিদদের জীবনযাত্রা নিজ চোখে দেখব এবং সম্ভব হলে মুসলমানদের সহযোগিতা করব, আর সুযোগ পেলেই মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে যাব। দাদাজানের সে কথা ও নির্দেশনা আমি অতি সংগোপনে হৃদয়ে পুষে আসছিলাম, এগুলো এখন আমার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ায় আমার এই আগুন কোনভাবেই প্রকাশ করতে পারছিলাম না। অতএব, আফগানিস্তানই হবে আমার উত্তম ঠিকানা।

আফগানিস্তানে যাওয়ার আগে তিন দিনের ছুটি নিয়ে আমি বাড়ী এলাম। সাধারণতঃ এ সময়ে ছুটি দেয়া হয় না। কসমোসলের নেতা হওয়ার কারণে আমি ছুটি পেয়েছিলাম। সেই ছুটিতে বাড়ী এলে দাদাজানের কথা আমার বেশী করে মনে পড়লো। দাদাজান চার বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে আফগানিস্তান সম্পর্কে আমাকে অনেক অজানা ইতিহাস জানাতেন। আমার এখনও মনে আছে, প্রথম যখন সোভিয়েত সৈন্যরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করে তখন তিনি বলেছিলেন, এ যুদ্ধে রুশদের খুব চড়া মূল্য দিতে হবে। সাদাসিধে আফগানী মুসলমানদের কেউ কোন দিন জয় করতে পারেনি। আর এটা ১৯১৭ এর যুগ নয়। তিনি ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, আফগানিস্তানের আযাদী পুরো তুর্কী সালতানাতের আযাদীর দ্বার খুলে দেবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্রের আযাদী নিজ চোখে দেখার সৌভাগ্যও তোমাদের হতে পারে। যদি এমনটি হয়েই যায়, অবশ্য আমার একান্ত বিশ্বাস তাই হবে, তবে তোমরা হবে রাশিয়ার সৌভাগ্যবান মুসলমান। বেটা! আমরা তো আজীবন আযাদীর স্বপ্ন নিয়েই মৃত্যুর দিকে চল্লাম, স্বাধীনতার সূর্যালোক দেখার সৌভাগ্য হলো না।

বিদায় নেয়ার আগে আমি আম্মুর কক্ষে গেলাম। দেখি তিনি কাঁদছেন, দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তাঁর। আমাকে বুকে জড়িয়ে আম্মু বললেন, বেটা! তুমি আমাদের কম্যুনিস্ট মনে কর। কিন্তু না তোমার আব্বু কম্যুনিস্ট, না আমি কম্যুনিজমে বিশ্বাস করি। কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরকে নাস্তিকতার মুখোশ পরতে হচ্ছে। আমরা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী হলে তোমার দাদা তোমাকে ইসলামী শিক্ষা দিতে পারতেন না। বেটা! তোমাকে বিদায় করতে আজ আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। জানি না জীবনে আর কোন দিন আমাদের দেখা হবে কিনা -----

বেটা, আফগানের কোন মুজাহিদ যেন তোমার বুলেটের নিশানা না হয়। ওরা তোমার মুসলিম ভাই। মাতৃভূমির আযাদী ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে তারা যুদ্ধ করছে। যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করবে। রুশ কম্যুনিস্টরা শুধু তোমার দাদার পূর্ব

পুরুষদের সাথেই জুলুম করেনি, রাশিয়ার কোন মুসলমান রুশদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি। আমার নানার বংশের বিশ জন লোককে রুশ কম্যুনিস্টরা জবাই করে হত্যা করেছিলো। আমার আম্মার যখন রুশ নরপিশাচদের ঐ হত্যাকান্ডের কথা স্মরণ হতো, তিনি চীৎকার করে কাঁদতেন। আজীবন তিনি রুশ কম্যুনিস্টদের জুলুমের যন্ত্রণা নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন, কখনও কম্যুনিস্টদের প্রতি প্রসন্ন হতে পারেননি।

আম্মু দু'হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন, জীবনে প্রথম আল্লাহর দরবারে হাত তুলে আম্মুকে দু'আ করতে দেখার আনন্দে আমার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। আম্মু বলছিলেন, 'আল্লাহ তুমি আমাদের অক্ষমতা জানো। আমরা এখানে তোমার দ্বীনের জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমাদের ক্ষমা করো। আমাদের একমাত্র সন্তান, তোমার কাছে সোপর্দ করছি, তাকে শক্তি-সাহস দান করো, যাতে আমার সন্তান তোমার পথে জিহাদরত মুজাহিদদের সহযোগী হতে পারে। তাকে আখেরাতে আমাদের মুক্তির উসিলা বানাও। আমীন'

আম্মুর দু'আর সময় অবচেতন মনে আমি তাঁকে ঝাপটে ধরে কাঁদছি। আম্মু আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'বেটা! তোমাকে ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিতে হবে। তোমাকে সামনে অনেক কঠিন কাজ করতে হবে।'

আমি বললাম, আম্মু! আপনি ভাবছেন, আমি ভীরু, কাপুরুষ। আমি আজ পরম আনন্দে কাঁদছি। জিহাদী উদ্দীপনায় উজ্জীবিত মায়ের ছেলে হতে পেরে আমি গর্বিত। আমার এ অশ্রু আনন্দাশ্রু।'

রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে সামান-পত্র গুছিয়ে আমার কক্ষে আব্বুর আগমনের অপেক্ষা করছি। এমন সময় আম্মু ঘরে ঢুকে বললেন, 'পাশের ঘরে তোমার আব্বু অপেক্ষা করছেন, তার সাথে কথা বলো।'

আব্বু তার ঘরে উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করছিলেন। তিনি আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বেটা! আজ তোমার দাদুজান বেঁচে থাকলে তিনি যে কথা বলতেন, আমি তোমাকে সে কথাই বলতে চাচ্ছি। বেটা! একথা স্বরণ রেখো! আমাদের মত রাশিয়ার অধিকাংশ মুসলমান নিরুপায় হয়ে কম্যুনিজম গ্রহণ করেছিলো। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমরা এজন্য কসমোসলে যোগ দিয়েছিলাম, যাতে করে প্রাণে বেঁচে থেকে গোপনে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনাবোধ জাগ্রত ও জিহাদী প্রেরণা উজ্জীবিত করতে পারি। ভবিষ্যতে যেন স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য মুসলমানরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি। কারণ রুশ গোয়েন্দা বিভাগ ছিল দেশের পরতে পরতে বিস্তৃত। কেজিবি'র এজেন্টদের ভয়ে এখানে পিতাও পুত্রকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তোমার দাদাজান তোমাকে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুনের ভিত্তিতে গড়ে না তুললে আমিও তোমাকে আজ এসব কথা বলার সাহস পেতাম না।

আমরা জানি, আফগানিস্তানে আমেরিকা, চীন, পাকিস্তানের কোনো সৈনিক যুদ্ধ করছে না। বেটা! আমার একান্ত বাসনা, যখনই তুমি সুযোগ পাবে মুজাহিদদের সাথে

যোগদান কর। আল্লাহ তোমাকে একটি মহৎ সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের জন্য দু'আ করবে।

কতক্ষণ নীরব থেকে আব্বু আবার বললেন, 'বেটা! আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আফগান সীমান্তবর্তী রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ জেলাগুলোর অবস্থা এখন খুব শোচনীয়। রাশিয়া এখন প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছে। ওরা মনে করছে, রুশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে আফগান মুজাহিদদের সহযোগিতার ফলে অবস্থা ক্রমাগত বিগড়ে যাচ্ছে। সীমান্তের কয়েকটি জেলা থেকে কম্যুনিস্ট নেতাদেরকে শুধু বরখাস্ত করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, অনেককে কারাগারেও প্রেরণ করেছে। রুশ গোয়েন্দা পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ওরা যেন মুসলমান কম্যুনিস্টদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখে।'

আমি বললাম 'আব্বু! কমুনিস্টদের এই ধারণা তো সত্যই মনে হয়। রাশিয়ার অভ্যন্তরে স্থানীয় মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া মুজাহিদরা কোনো অপারেশনে সফল হওয়ার কথা নয়।'

আব্বু, ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বললেন, 'বেটা! বাস্তব ঘটনা এমন নয়। এখানকার মুসলমানদের এমন দুঃসাহস নেই এবং তাদের কাছে এমন সরঞ্জামাদিও নেই, যা দিয়ে আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করতে পারে। যদিও আমাদের মন চায়, আমরা মুজাহিদদের সাহায্য করি। কিন্তু রুশ গোয়েন্দা বাহিনীর (কেজিবি) সদস্যদের কারণে আমরা কিছুই করতে পারছি না। যা কিছু হচ্ছে, আমাদের অনুসন্ধান মতে, রুশপক্ষ-ত্যাগী মুসলিম সৈন্যদের সহযোগিতায় হচ্ছে। রুশ গোয়েন্দা বাহিনী এখনও এ ব্যাপারটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পায়নি। মুসলমান কম্যুনিস্টদের শুধু এতটুকু কসুর যে, বিভিন্ন অপারেশনের খবর ওরা জানতে পারে, কিন্তু কখনও রুশ গোয়েন্দাদের তা জানায় না।

রাশিয়ার একটি বিমানে করে আমাদের কাবুলে নামিয়ে দেয়া হলো। কাবুল পৌঁছেই আমরা বুঝতে পারলাম, অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কাবুল বিমানবন্দরে রুশ সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরো বিমানবন্দরে রুশ সেনাদের কড়া প্রহরা চলছে।

প্রথম তিনমাস আমাকেও বিমানবন্দরে কর্তব্য পালন করতে হলো। ইতিমধ্যে মুজাহিদরা কয়েকবার কাবুল বিমানবন্দরেও অপারেশন চালিয়ে কয়েকটি বিমান ধ্বংস

ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে ফিরে গিয়েছে। বিমানবন্দরে দায়িত্বশীল রুশ কর্নেল যখন জানতে পারলো, আমি ফারসী ভাষা সাচ্ছন্দে বলতে পারি, তখন আমাকে পল্লী এলাকায় অপারেশন প্রোগ্রামে পাঠিয়ে দেয়।

একদিন গোয়েন্দা বাহিনীর অনুসন্ধানে জানা গেলো, কাবুলের পাশেই একটি গ্রামে মুজাহিদরা অবস্থান করছে। তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি ট্যাংক ও সাজোয়া যানসহ একদল রুশ বাহিনীকে সেই গ্রামে পাঠানো হলো মুজাহিদের গ্রেফতার করার জন্য। আমরা গ্রামটি ঘিরে ফেলার আগে ৬টি জঙ্গি বিমান থেকে গ্রামটির ওপর অতর্কিতে বোম্বিং করে পুরো গ্রাম তছনছ করে ফেলা হলো। বেপরোয়া বোমা হামলায় গ্রামের অধিকাংশ বাড়িঘর পুড়ে গিয়েছিলো। বিমানের বোম্বিং আর ট্যাংকের গোলায় গ্রামের আবাল, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, শিশু কন্যা কেউ রক্ষা পেলো না। মাত্র কয়েকজন প্রতিপক্ষ মুজাহিদকে গ্রেফতার করার জন্যে এমন নৃশংস ঘটনা এই প্রথম আমি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলাম।

ট্যাংক ও বোমা হামলার পর রুশরা যখন বুঝতে পারে, গ্রামে প্রাণী বলতে আর কোন কিছু বেঁচে নেই, তখন সাজোয়া যান ও ট্যাংক থেকে বেরিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলোতে তল্লাশি শুরু করলো। গ্রামের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েকটি ঘর অক্ষত ছিলো। তা ছাড়া পুরো গ্রামটির সকল বাড়ি-ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। মসজিদ মক্তবগুলোও বোমার আঘাতে পরিণত হয়েছিলো ধ্বংসস্তূপে। অক্ষত ঘরগুলোর দিকে আমি তাড়াতাড়ি পা বাড়ালাম। আমার ইচ্ছা ছিলো, যদি ও গুলোতে কোন মুজাহিদ লুকিয়ে থেকে থাকে তবে আমি তাদের বাঁচাতে সহায়তা করবো।

একটি ঘরে ঢুকে আমি দু'জন বৃদ্ধা আর একটি শিশু পেলাম। বৃদ্ধদ্বয় ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলো আর শিশুটি ছিলো ক্রন্দনরত। ঘরটি তল্লাশীর জন্য আমি এদিক ওদিক দু'টি কক্ষ দেখে নিলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি, একটি দরজা ভেজানো। যেই সেদিকে পা বাড়ালাম, ভয়ার্তভাবে বৃদ্ধাদ্বয় আমাকে বলতে লাগলেন, এখানে আমার কন্যারা আছে কোন পুরুষ এখানে নেই। বৃদ্ধার ভীত কণ্ঠস্বরে আমি নিশ্চিত হলাম, অবশ্যই মাটির নীচের পরিখায় কোন মুজাহিদ আত্মগোপন করছে, তবে ওদের বেশী ঘাটাঘাটি না করে বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিলাম, তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো, আমি তোমাদের সহযোগিতার জন্য এসেছি, আমিও তোমাদের মতই একজন মুসলমান।

এ ঘর থেকে বেরিয়ে আমি পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। সাথের ঘরটি তখন তল্লাশী হয়ে গেছে দেখে আমি তৃতীয় ঘরটিতে যখন ঢুকতে যাচ্ছি, তখন সে ঘর থেকে তল্লাশী শেষ করে শেখ ইসমাঈল বেরিয়ে এলো। ইসমাঈল রুশ পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদদের সাথে মিলিত হওয়ার দিন শহীদ হয়েছিলো। আগ বাড়িয়ে বললো, ও ঘরে কেউ নেই। আমি আর ও ঘরে না ঢুকে ফিরে এলাম। আল্লাহর মেহেরবানীতে সেই দিন জীবিত কোন মুজাহিদ রুশ বাহিনীর হাতে ধরা পরেনি। কিন্তু হানাদার রুশরা বোমাঘাতে ভস্ম গ্রামটির অক্ষত ঘরগুলোতে লুটপাট করতে দ্বিধা করলোনা।

কয়েকদিন পর অনুরূপ আরেকটি গ্রামে রুশ ফৌজ হানা দেয়। মুজাহিদরা একটি রুশ বিমান গুলি করে ভূপাতিত করলে তাতে একজন উর্ধ্বতন রুশ অফিসারসহ বেশ কয়েকজন সেনা নিহত হয়েছিলো। রুশবাহিনী খবর পেলো, বিমান ধ্বংসকারী মুজাহিদরা পাশের গ্রামে ক্যাম্প করেছে; তাই তারা বাড়ি তল্লাশীর নামে ব্যাপক লুটতরাজ করে। গ্রামের এক গাদ্দার এ সময় এসে রুশ লুটেরাদের জানালো, গ্রামের এক বুড়ি মুজাহিদদের খুব খাতির-যত্ন করে, বুড়ির ঘরে মুজাহিদদের খানা-পিনার ব্যবস্থা হয়। রুশ হানাদাররা শোনা মাত্র সেই বৃদ্ধাকে ধরে এনে মুজাহিদদের অবস্থান ও তথ্য জানার জন্য তার উপর অত্যাচার চালায়। ভয়ভীতি দেখানোর পরও যখন বৃদ্ধা মুজাহিদদের কোন খোঁজ দিল না, তখন এক রুশ সৈনিক তার চুলের মুটি ধরে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিলো, চালালো উপর্যপুরি লাথি-ঘুষি ও বেত্রাঘাত। অত্যাচারে পিষ্ট হয়েও বৃদ্ধার মুখ থেকে জালিমরা মুজাহিদদের কোন ঠিকানা না পেয়ে তার হাত কেটে দিলো, তারপরও কোন কথা বলেনি বৃদ্ধা। এরপর এদের ক্রোধ আরো বেড়ে যায়, বেয়েনেটের খোঁচায় এক সেনা বৃদ্ধার একটি চোখ উপড়ে ফেলে। এ সময় মহিলা চীৎকার দিয়ে কেঁদে ফেলে, কিন্তু মুজাহিদদের সম্পর্কে তবুও কোন কথা বলেনি। মহিলার মুখ থেকে মুজাহিদদের অবস্থান সম্পর্কে স্বীকারোক্তি বের করতে ব্যর্থ হয়ে এক রুশ সেনাঅফিসার মহিলার দু'টো পা কেটে ফেললো। মহিলা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো এবং অধিক রক্তক্ষরণের ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মহিলা শাহাদাত বরণ করলো। বিজয় হলো মুজাহিদ মহিলার। শাহাদাত ও ঈমানী দৃঢ়তার ফলে জালিমদের নিষ্ঠুর নিপীড়ন ও চেষ্টা ব্যর্থ ও পরাজিত হলো।

বৃদ্ধা মহিলার উপর অকথ্য অত্যাচার অসহায়ের মতো নীরবে সহ্য করতে হয়েছিলো আমার। বিপুল সংখ্যক রুশ অত্যাচারী সৈন্যের উপস্থিতিতে আমার পক্ষে বৃদ্ধাকে সাহায্য করার কোন সুযোগ ছিলো না। আত্ম-পীড়ায় দগ্ধ হচ্ছিলাম শুধু।

এমন আরো একটি মর্মন্তুদ অত্যাচারের ঘটনা আমাকে নীরবে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিলো। এক বাড়ীর আন্ডার গ্রাউন্ডে আত্মগোপনকারী মুজাহিদদের খুঁজে না পেয়ে রুশবাহিনী গৃহস্বামীকে ধরে এনে কয়েদখানায় আটকে তার শরীর চাকু দিয়ে কেটে তাতে লবণ ও মরিচ ভরে দিলো। দারুণ যন্ত্রণায় লোকটি চিৎকারে বাড়ি কাঁপিয়ে তুলছিলো, ক্ষণে ক্ষণে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু মুজাহিদদের অবস্থান সম্পর্কে সে একটি বাক্য বলেনি। নরপিশাচ রুশসেনারা স্বীকারোক্তি বের করার জন্য গৃহস্বামীর ছোট্ট ছেলেকে ধরে এনে বললো, তুমি যদি মুজাহিদদের তথ্য না দাও তবে এখন তোমার ছেলেটিকে মেরে ফেলব। শিশুটিকে বেয়েনেটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষ করছিলো, যাতে সন্তানের আর্ত চিৎকারে বাবা মুখ খুলে, কিন্তু গৃহস্বামী তাতেও বিচলিত হলো না। সন্তানের অসহনীয় চিৎকারেও যখন সে মুজাহিদ সম্পর্কে কিছু বললো না, তখন জালিমরা নির্মম আঘাতে আঘাতে শিশুটিকে পিতার সামনেই হত্যা করলো। বললো, এখনও যদি তুমি কথা না বল, তবে তোমার অন্য সন্তানদেরও এভাবে হত্যা করা হবে।

রুশ অফিসার গৃহস্বামী ও তার সন্তানদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, তা হায়েনাকেও হার মানায়। কোনো জংলী জানোয়ারও এভাবে শিকারের উপর চড়াও হয় না। অবশেষে সন্তানের শাহাদাতে গৃহস্বামী মুখ খুললো। অত্যাচারী অফিসার ভেবেছিলো, এবার হয়তো সে বলে দেবে মুজাহিদদের অবস্থান। গৃহস্বামী বললো, 'হে রুশ হায়েনার দল! তোদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তোরা জানিস না যে, আমি আমার আল্লাহর নিকট আমার জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি সব কিছুর বদলায় জান্নাতের সওদা করেছি। তোরা জানিস না, ইসলাম অনুসারীদের শরীর টুকরো টুকরো করে দিলেও তাদের মুখ থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বন্ধ করা যাবে না। যে মুজাহিদের সন্ধান পেতে আমার ওপর জুলুম করছিস, এরা আমার কাছে নিজ সন্তানের চেয়েও প্রিয়, ওরা প্রিয় মাতৃভূমির আযাদী ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় জিহাদ করছে। ওরা তোদের মতো হায়েনাদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তোরা আমার মুখ থেকে একটি শব্দও মুজাহিদদের অবস্থান সম্পর্কে বের করতে পারবি না।'

রুশ হায়েনারা গৃহস্বামীর কথায় আরো উত্তেজিত হলো। তার অপর দুটি শিশুকে আঘাতে আঘাতে নির্মমভাবে শহীদ করে দিলো। আমার পক্ষে এই দৃশ্য সহ্য করা ছিলো অসম্ভব। আমার হৃদয়ে জ্বলছিলো প্রতিশোধের আগুন। একবার ভাবছিলাম, উপর থেকে বোমা হামলা করে রুশ অফিসারদের ভস্ম করে দেব। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, তা করলে শুধু শুধু আমার জীবনটিই বিনাশ করা হবে, এতে সুদূরপ্রসারী কোন ফল দাঁড়াবে না। সেদিন থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ থেকে আমি পিছিয়ে না থেকে তল্লাশীতে সবার আগে থাকব, যাতে মুজাহিদদের উপকার করা যায়।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। একটি গ্রামে তল্লাশীর জন্য আমি একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের মাচাং-এ এক বুড়ো ছাগলের পালের কাছে বসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে অন্য কেউ আছে? বুড়ো জবাব দিলো, না। কিন্তু আমার মন বলছিলো, এখানে অবশ্যই মুজাহিদ আছে। বন্ধ একটি দরজা যেই না খুলতে যাচ্ছি, বুড়ো আমাকে আগলে ধরে বললো, ওখানে আমার মেয়েরা আছে, ও ঘরে যেয়ো না।

রুশ কমুনিস্টরা এ ধরনের ঘরে জোরপূর্বক প্রবেশ করে কন্যা -বধুদের ইজ্জত সম্ভ্রমহানী শেষে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করতো। আমি বুড়োকে বল্লাম, আমি জানি, ভিতরে মুজাহিদ আছে, আমি মুসলমান, আমি তাদের সাহায্য করতে এসেছি। তুমি যদি আমাকে ধোকা দাও তাহলে মুজাহিদদের মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিব। বৃদ্ধ আমার কথায় বিশ্বাস করলো। বললো, আমি কি করব! বল্লাম, বলো, কোন ঘরে মুজাহিদ আছে। আমার এ কথায় বৃদ্ধ ঘাবড়ে গেলো। ভাবলো আমি তাকে কোন চালে ফেলে দিয়েছি। তাই কোন কথা বললো না। দ্বিতীয়বার আমি তাকে আশ্বস্থ করলাম, কোন ক্ষতি করতে আমি এখানে আসিনি। তখন বৃদ্ধা বললো, পাশের ঘরে মুজাহিদ রয়েছে। চিন্তিত হলাম। যদি পাশের ঘরে অন্য কেউ ঢুকে থাকে তাহলে তো সর্বনাশ। মুজাহিদদের বাঁচানো তখন মুশকিল হয়ে পড়বে। কারণ অস্ত্র থাকলে মুজাহিদরা লড়াই

করতো। গোলাবারুদ থাকা অবস্থায় ওরা কখনও পিছু হটে না। কেবল অস্ত্র ও গোলা বারুদ না থাকা অবস্থায় ওরা আত্মগোপন করে। আমি বুড়োকে বললাম, যদি আমাদের অফিসার আসে তবে বলবে, মুজাহিদরা আমার কতগুলো বকরী জোর করে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে, কিছুক্ষণ আগে ওরা এদিকে এসেছিলো।

এরপর আমি বৃদ্ধকে বাইরে নিয়ে এসে পাশের ঘরে ঢুকলাম। তল্লাশীর নামে এ ঘরের সামনে ইসমাঈল দাঁড়িয়ে ছিলো। আমাকে দেখে ওর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তল্লাশী হয়েছে? ইসমাঈল বললো, হ্যাঁ, এখানে কোন মুজাহিদ নেই। আমি তার কথা শুনে চরম বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে, ইসমাঈলও তাহলে আমার মতো গোপনে মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করছে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

একদিন আমরা একটি গ্রামে তদন্ত করছিলাম। এক পর্যায়ে আত্মগোপনকারী মুজাহিদরা আমাদের ঘেরাও-এ পড়ে গেলো। রুশ কম্যুনিস্ট বাহিনী ছিলো ভারী অস্ত্রে সজ্জিত। আমি মুজাহিদদের সাহায্যের কোন পথ পাচ্ছিলাম না। তারা ছিলো ১০ জন। এদের ধরে যখন বাইরে আনা হচ্ছে, তখন অপরদিকে চেয়ে দেখি, অন্যান্য রুশ ফৌজ গ্রামের সাধারণ মানুষ ও বড় একটি মুজাহিদ দলকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসছে। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ আমি নিশ্চয়ই এদের সাহায্য করব। না হয় রুশ হায়েনারা এদের সবাইকে হত্যা করবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো। আমি চিন্তা করছিলাম, যদি এদের পালানোর সুযোগ করে দেয়া যায় তবে অন্তত অর্ধেক তো বাঁচতে পারবে। আমার কাছে চারটি হ্যান্ড গ্রেনেড ছিলো। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে সামনের মুজাহিদের পকেটে একটি গ্রেনেড পুরে দিলাম। মুজাহিদ ঘার ফিরিয়ে আমাকে দেখলো, আমি আস্তে করে কানে কানে বললাম, তোমাদের সাহায্য করছি। পাহাড়ের ঢালে রুশ ট্যাংক প্রস্তুত ছিলো। সকল মুজাহিদ ও আফগান জনসাধারণকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। ওদের হাত পিঠের দিকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছিলো। আমি গ্রেনেডধারী মুজাহিদের হাত আলতো ভাবে বেঁধে ছিলাম। যাতে সে ইচ্ছা করলে পকেটে হাত দিতে পারে। আমি তাকে যথা সময়ে গ্রেনেড ব্যবহার করার কথা ইঙ্গিতে বলে দিলাম। এদের ফায়ার করার জন্য রুশ সৈন্য কমান্ডারের নির্দেশের অপেক্ষা করছে, শতাধিক আফগানী নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যদি মুজাহিদ আমার চাল বুঝতে পারে তবে মুখোমুখি থাকা ঠিক হবে না, তাই আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কায়োমনোবাক্যে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছিলাম, যদি এ সময় একটু অন্ধকার নেমে যেতো তাহলে ওদের পালাতে সুবিধা হতো। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল পুরো আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, চতুর্দিক অল্পক্ষণের মধ্যে কেমন যেন ভূতুরে অন্ধকারে ডুবে গেছে। আমার নজর ছিলো ঐ গ্রেনেডধারী মুজাহিদের উপর। কমান্ডার যখন এসে নির্দেশ দিলো এদেরকে গুলী করে সাফ করে

ফেলো এবং নির্দেশ প্রাপ্ত সৈনিকটি যেই ট্রিগার টিপতে যাবে অমনি মুজাহিদের নিক্ষিপ্ত গ্রেনেড এসে বিস্ফোরিত হলো রুশ সৈন্যের বুকের উপর।

ইত্যবসরে সকল মুজাহিদ দৌড়ে পালালো। আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো। মাত্র বারোজন মুজাহিদ শহীদ ও সাতজন আহতাবস্থায় গ্রেফতার হলো। অন্যেরা জীবন বাঁচাতে সক্ষম হলো। নয় রুশ সৈন্য নিহত ও কুড়িজন আহত হলো। আমিও ভীষণভাবে আহত হলাম। আহত হওয়ার কারণেই রুশ তদন্তে সেদিন আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। ফলে তদন্ত অফিসার উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছিলো, কি করে হাত বোমা মুজাহিদের হস্তগত হয়েছিলো।

একদিন অনুরূপ একটি বস্তিতে তল্লাশী শেষে আমরা ক্যাম্পে ফিরে আসছি। পথে একটি আফগান শিশু দৌড়ে এসে একটি সিগারেট আমার হাতে দিলো। রুশ অফিসার আমার হাত থেকে সিগারেটটি ছিনিয়ে নিলো এবং শিশুটিকে খুশিতে আদর করলো। অফিসারটি যেই না আয়েশ করে সিগারেটটি মুখে পুরে অগ্নি সংযোগ করলো তখনই বিকট শব্দে সিগারেট বিস্ফোরিত হয়ে অফিসারের মুখ ঝলসে দিলো। শিশুটি অফিসারের ঝলসে যাওয়া চেহারা দেখে হাসতে লাগলো। অফিসার ক্ষুব্ধ হয়ে শিশুটিকে ধরার নির্দেশ দিলো। এক সৈনিক শিশুটিকে ধরে এনে তার উপর নির্মম নির্যাতন চালালো। কিন্তু শিশুটি কিছুতেই এই সিগারেট বোমার উৎস ও ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে কিছুই বললো না। আঘাতে শিশুটির শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল, দুটি দাত ঘুষি মেরে ভেঙ্গে ফেলেছিলো এক রুশ শয়তান। অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো, আব্দুর রহমান, তুমি এ যমটিকে গুলী করে হত্যা করো, ও আমার চেহারা বিগড়ে দিয়েছে। কিন্তু এ পাপিষ্ট একথা এ কবারও ভাবেনি যে, ওরা পুরো আফগানিস্তানের চেহারাই ঝলসে দিয়েছে এবং লক্ষ জনতা ও হাজার হাজার শিশু, কন্যা, মা-বোনকে হত্যা করেছে। তাদের ইজ্জত লুটে নিয়েছে।

আমি খুব ধীরে-সুস্থে ক্লাসিনকভ উঠালাম। এদিকে গুলির কথা বুঝে শিশুটি উঠে দিল দৌড়। অন্য সৈনিকরা গুলী করতে চাচ্ছিলো। আমি বল্লাম, আজ নিশানা আমি লাগাব। এক সৈনিক বললো; তাড়াতাড়ি কর ও তো পালিয়ে যাবে। বললাম, আমি উড়ন্ত পাখি শিকার করতে পারি, আর এতো মাটির উপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে মাত্র। আমি চাচ্ছিলাম, শিশুটি দূরে চলে গেলে নিশানা নেব। কিছুটা দূরে যাওয়ার পর ছেলেটির দু' পায়ের ফাঁকে আমি গুলী করলাম। ছেলেটির পায়ে লাগেনি কিন্তু ভয়ে সে পড়ে গেলো. পরক্ষণে উঠে আবার দৌড়াতে লাগলো।

সাথী রুশীরা অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো। বললো, বেশ তো তোমার নিশানা। বললাম, রাখো, আরেকটি লাগাতে দাও। আবার আমি ছেলেটির দু'পায়ের ফাঁকে গুলী করলাম, ভয়ে ছেলেটি আবার পড়ে গেলো। রুশরা হাসতে লাগলো। ভাবছিল, ছেলেটি এবার মরে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ছেলেটি দাঁড়িয়ে রুশ অফিসারের প্রতি লক্ষ্য করে চীৎকার দিয়ে বললো, 'তোমরা আমার বাপ-মার হত্যাকারী, আমি কখনও তোমাদের ক্ষমা করবো না, প্রতিশোধ নেবই'।

এই বলে দ্রুত ছেলেটি পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো। রুশ অফিসারের একটি প্রচন্ড থাপ্পড় আমার গালে পড়লো, সেই সাথে অকথ্য ভাষায় কতক্ষণ গালাগালি। কারণ, ওর দৃষ্টিতে আমি উচ্ছা করেই নিশানা ভুল করেছি। পাশেই ইসমাঈল দাঁড়ানো ছিলো, ও বললো, অনেক সময় ভালো নিশান্যবাজেরও ভুল হয়ে যায় স্যার। আর এখানে তো আব্দুর রহমানের কোন দোষ নেই।

কাবুল খায়েরখানা কালোনীতেও শিশু কর্তৃক ফৌজ আক্রমণের একটি ঘটনা ঘটেছিলো। সেখানে আফগান শিশুরা রুশীদের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস ফেরী করে বিক্রি করতো। অন্যধ্যে আমেরিকান সিগারেট ছিলো অন্যতম। শিশুরা যখন রুশ ফৌজদের সাথে খুব খাতির জমিয়ে ফেলতো, তখন আসল সিগারেটের বদলে রুশদেরকে বারুদ ভর্তি সিগারেট সরবরাহ করে ওরা দ্রুত সরে পড়ত। একবার সৈন্যদের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ধুমপানের ফল এ হলো যে, সিগারেট বোমার আঘাতে ১১০/১১৫ জন সৈন্যের চেহারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। শিশুদের এই আক্রোশ ছিলো এরই বহিঃপ্রকাশ যে, অত্যাচার ও নির্যাতনের দ্বারা রুশ বাহিনী তাদের কচি মনেও ক্রোধ ও প্রতিশোধের বীজ বপন করেছিলো।

আমাকে এক আফগানী ফৌজ বলেছিলো, প্রাথমিক পর্যায়ে আফগানিস্তানে রুশ সৈন্য আসার পর প্রাইমারী স্কুলসমূহে রাশিয়া থেকে দুধ দেয়া হতো, কিন্তু শিশুরা দুধ নিতো না। ওরা দুধ গ্রহণ না করে প্রতিবাদ করতো রুশদের। বলতো, তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও, আমরা তোমাদের দুধ খাব না।

কাবুলে মুজাহিদরা প্রতি রাতেই গেরিলা হামলা চালাতো। ওরা যদি কোন রুশ সৈন্যকে হত্যা করতো, তাহলে মৃত দেহে বিভিন্ন শ্লোগান লিখে ক্ষোভ প্রকাশ করতো। আমি নিজে দেখিছি, রুশ সৈন্য হত্যার পর তারা গায়ে লিখে রেখেছেঃ "রুশদের কবরস্তান ,আফগানিস্তান।" 'আফগানিস্তান সমরকন্দ বুখারা নয়, চির স্বাধীন আফগানিস্তান"

এসব শ্লোগান পড়ে আমার খুব ভালো লাগতো যে, আফগানরা সমরকন্দ, বুখারার ইতিহাসও ভালো জানে।'

আব্দুর রহমান থামলে আলী জিজ্ঞেস করলো, ইসমাঈল কবে কিভাবে তোমার সাথে যোগ দিয়েছিলো?

আব্দুর রহমান বললো, এটা সেদিনের ঘটনা, যেদিন বালকটির সিগারেটে অফিসারের মুখ ঝলসে গিয়েছিলো। ইসমাঈল আমার তাবুতে এসে তাবু থেকে দূরে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে বললো, তুমি জেনে বুঝে ইচ্ছা করে সেই বালকটিকে কেন গুলী করলে না? আমি বুঝলাম, তাকে রুশ অফিসার তদন্তের জন্য গোয়েন্দা হিসেবে পাঠিয়েছে। বললাম, আমি টার্গেট করেছিলাম কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। সে বললো, আমার সাথে মিথ্যা বলো না, আমি তোমাকে এর আগেও মুজাহিদদের সাহায্য

করতে দেখেছি। যেদিন মুজাহিদদের পকেটে গ্রেনেড ঢুকিয়ে দিয়েছিলে, সেদিন আমার সহযোগিতার কারণে রেজিষ্ট্রারে গ্রেনেডের কমতি ধরা পড়েনি, তদুপরি ঐ দিন বৃদ্ধাকেও তুমি শিখিয়ে দিয়েছিলে, অফিসার এলে বলবে, মুজাহিদরা আমার ছাগল নিয়ে পাহাড়ে চলে গেছে, অথচ মুজাহিদরা তার ঘরেই লুকিয়ে ছিলো।

ইসমাঈলের কথা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। বুঝলাম, ইসমাঈল সব কিছুই জানে। সবকিছু জেনেও যদি এ পর্যন্ত অফিসারের কাছে কিছু না বলে থাকে তাহলে হয়তো সেও আমার মতো গোপনে মুজাহিদদের সাহায্য করে। আমি বললাম, ভাই ইসমাঈল! আমি নিরাপরাধ আফগানীদের ওপর গুলী ছুড়তে পারি না। আমাকে চীন, আমেরিকা ও পকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো হয়েছিলো, কিন্তু এখানে তো আমরা নিষ্পাপ শিশু ও নিরাপরাধ মানুষের ওপর গুলী চালাচ্ছি। এই শিশু বালকটি আর কত বড় অপরাধ করেছে, যেখানে তার মা বাপ ভাই বোন সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। যদি সিগারেটে বারুদ ভরে রুশ অফিসারের মুখ জ্বালিয়ে দিয়ে অপরাধ করে থাকে, তবে রুশরা মুজাহিদদের গ্রেফতার করে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করছে তার শাস্তি কি হবে? তুমি যদি গোপন তদন্ত বা গোয়েন্দাগিরির লক্ষ্যে এসে থাকো, তবে শোন, আমি পরিস্কার বলে দিচ্ছি, গিয়ে অফিসারকে জানাতে পারো, আমি সব কিছুই জেনে বুঝে করেছি, ইচ্ছা করেই বালকটিকে হত্যা করিনি। আমিও একজন তুর্কি মুসলমান। আমি নিরাপরাধ মুসলিম আফগানীদের উপর জুলুম করতে পারবো না, আমি রুশদের অত্যাচারের বিপক্ষে, মজলুমদের পক্ষে। বলতে পারো, ওরা আমাকেও যেন জ্বালিয়ে ফেলে না হয় জেলখানায় বন্দী করে।

আমি নীরব হলে ইসমাঈল বললো, ভাই আব্দুর রহমান। আমিও তোমার সাথী। আমিও তোমার মতো রুশদের বিরোধী। ওরা আমাদের মাতৃভূমি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এখন আফগানীদের মাতৃভূমিও ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে ।

আসার সময় আমার আব্বা বলে দিয়েছেন, 'আফগানীদের ওপর কোন গুলি চালাবে না, ওরা তোমাদের ভাই।' আমি যথাসম্ভব সেই উপদেশ মেনে চলছি এবং মুজাহিদদের সাহায্য করছি। কিন্তু তোমার মতো এমন বোকামী করিনি। শোন, গত মাসে যে রুশ অফিসার নিজ কক্ষে জ্যান্ত পুড়ে মরেছিলো তাকে আমিই মেরেছিলাম। ওই বদমাশ এক আফগানী মেয়েকে জোর করে ধরে এনেছিল ধর্ষণ ও ইজ্জতহানীর জন্য। আমি দেখলাম, ওর কাছে থেকে এই মেয়েকে কোনভাবেই উদ্ধার করতে পারব না এবং মেয়েটির ইজ্জতও রক্ষা করতে পারব না। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই করেছি যে, সেই হতভাগী সহ কাপালিকও দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। বিস্ফোরক সিগারেট বানানোর কৌশল আমিই এক আফগান সেনাকে শিখিয়েছিলাম যখন বুঝতে পেরেছিলাম, সে নিশ্চিতভাবেই মুজাহিদদের সাথী। সেও রুশ অফিসার হত্যার সময় আমার সাথে ছিলো। বিভিন্ন জায়গায় সিগারেট বোমার ব্যবস্থা ও পরিচালনা সে-ই করেছিলো।

এ কথা বলে ইসমাঈল নীরব হয়ে গেলো। অনেক্ষণ কি যেনো চিন্তা করে বললো, আব্দুর রহমান! শীঘ্রই আমরা মুজাহিদদের দলে যোগ দেব। কারণ অনেক সময় রুশদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে তা সহ্য করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে বাধ্য হয়ে আমাদেরও অন্যায়ভাবে গুলী চালাতে হয়। এতে আমি খুবই আত্মপীড়ায় ভুগি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাকী জীবন ইসলামের খিদমতে ব্যয় করবো। আফগানিস্তান বিজয়ের পর মাতৃভূমি উদ্ধারে জিহাদ করবো। দেশ ত্যাগ করার সময় আমার আব্বা বলেছিলেন, 'আফগানিস্তান অচিরেই স্বাধীন হবে, এরপর দেখবে রাশিয়া তুর্কিস্তানকে গোলামির জিঞ্জিরে বেশী দিন আটকে রাখতে পারবে না।'

ইসমাঈলের কথা শুনে আনন্দে আমার মন ভরে গেলো। আমি যেনো সমমনা আমার আপন একটি ভাইয়ের সাথে মিলিত হলাম। আমার আব্বু ঠিকই বলেছিলেন যে, সকল রুশ কম্যুনিস্ট নয়, জীবন বাঁচানোর জন্যেই অনেকে কম্যুনিস্টদের লেবাস পরেছে।

আমি অজ্ঞাতসারে ইসমাঈলকে জড়িয়ে ধরলাম, আনন্দে আমাদের উভয়ের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। হাতেহাত রেখে আমরা শপথ নিলাম, আমরা উভয়ে মুজাহিদ দলে যোগ দিয়ে পায়ের লাল জিঞ্জির ছিড়ে ফেলব। জীবিত থাকলে আফগান বিজয়ের পর মাতৃভূমির আযাদী পর্যন্ত রুশদের বিরুদ্ধে লড়ে যাব।

কাঙ্খিত সুযোগ আমাদের অচিরেই মিলে গেলো। রুশ সুপ্রিম কমান্ডার যখন মুজাহিদ ঘাঁটির ওপর কব্জা করতে চাইলো, তখন আমরা মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। সেদিন আমাদেরকে হেলিকপ্টার দ্বারা নামিয়ে দেয়া হলো মুজাহিদদের ক্যাম্প অবস্থিত পাহাড়ের কাছে। আমাদের দলের ত্রিশজনের পনেরজন ছিল রুশ আর ১২ জন আফগানী। রশ সেনা অবতরণের সাথে সাথেই অধিকাংশকে মুজাহিদরা হত্যা বা গ্রেফতার করে ফেলেছিলো, দৈবক্রমে কেবল আমাদের গ্রুপটি আক্রান্ত হয়নি। অবতরণের পরেই আমরা দ্রুত ব্যাংকার তৈরী করে চার পাশে মাইন পুঁতে ফেলেছিলাম। রাতের বেলায় কমান্ডারের ইঙ্গিত পেলেই আমাদের উপর নির্দেশ ছিলো মুজাহিদ ক্যাম্পে আক্রমণ করার।

এখানে অবতরণের পর আমার সাথে ইসমাঈলের কথা হলো, রাত্রে আমরা পুরো ব্যাংকার জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাব। রাত বারোটা বাজার পরই আমরা নিজেদের গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করলাম। ইসমাঈল এভাবে গুলী ছুড়তে ছিলো যে, মনে হয়েছিলো মুজাহিদরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। ইত্যবসরে আপনারাও আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। আল্লাহ এভাবেই আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন।

আপনাদের উপস্থিতি নিকটে টের পেয়ে সকলের মন ছিলো সে দিকে। আপনাদের ভয়ে সকল রুশ সৈন্য ছিলো ভীত। তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছিলো, অগ্রসর হয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে না ব্যাংকারে বসে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেবে। আমি এই

সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সকল অস্ত্র ধ্বংস করে দিয়ে রুশ সৈন্যদের ওপর বোমা হামলা করলাম। তিন আফগানী আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো আর দু'জন ওদের সাথে নিহত হয়েছিলো। অন্যদের কোন হদীস পাওয়া যায়নি।

সকল রুশ সেনাদের হত্যা করার পর আমরা এদিকে অগ্রসর হলাম। এমন সময় ইসমাঈল একটি মাইন বিস্ফোরণে জিহাদ ও স্বাধীনতার নিঃসীম আকাঙ্খা নিয়ে শাহাদত বরণ করলো। একজন পরম বন্ধুর সান্নিধ্য থেকে আমি বঞ্চিত হলাম। ও ছিল শুরু থেকেই মুজাহিদদের সুহৃদ। রুশরা কোথাও পরাজিত হলে বা পালিয়ে আসলে সে ভীষণ খুশি হতো।

আব্দুর রহমান ও আলী হাতে হাত রেখে শপথ করলো, 'আমরা সকলে মিলে শহীদ ইসমাঈলের অসমাপ্ত মিশন চালিয়ে যাবো। দেখবে, একদিন না একদিন আফগানিস্তানের সাথে সাথে তুর্কিস্তানও স্বাধীনতা লাভ করবে। পৃথিবীর আযাদী-পাগল মজলুম মুসলমানেরা প্রাণ ভরে দেখবে, বিশাল তুর্কিস্তানে স্বাধীনতার নির্মল বাতাসে পতপত করে দুলছে ইসলামের কলেমা লেখা সবুজ পতাকা।'

একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। মুজাহিদ হেড কোয়ার্টারে জমায়েত হচ্ছে সকল মুজাহিদ। চীফ কমান্ডারের অফিসে সভা বসেছে। সকল মুজাহিদ কমান্ডার নিজ নিজ সেক্টরের অবস্থা তুলে ধরছেন চীফ কমান্ডারের কাছে। সেক্টর কমান্ডাররা জানাচ্ছে, শত্রুপক্ষের তুলনায় আমাদের বেশী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি না, এ অবস্থায় কি ভাবে আমরা শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করব।

যুদ্ধেক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো। চীফ কমান্ডার সব শুনে বললেন, সমস্যাসংকুল সেক্টরে আলীকে পাঠানো যেতে পারে। আলী যদিও তরুণ তবে সে বুদ্ধিমান। তীক্ষ্ণ মেধা খাটিয়ে সে নতুন কোন সমাধান বের করতে পারবে। কিন্তু তোমাদের সবাইকে নির্দ্বিধায় তার কমান্ড মেনে চলতে হবে। তোমরা তার সহযোগিতা না করলে যতো ভালো কৌশল সে অবলম্বন করুক সফল হবে না। তরুণ বলে তার নির্দেশের যথাযথ গুরুত্ব না দিলে সে কিছুই করতে পারবে না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসা সকল কমান্ডার ও সহযোদ্ধারা চীফ কমান্ডারকে আশ্বাস দিলো, আলী সম্পর্কে তাদের কোন আপত্তি নেই, তারা আলীর সকল নির্দেশ মেনে চলবে।

আলোচনা সভা শেষ হলে চীফ কমান্ডার আলীকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালো। তিনি অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারদের সাথে আলীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আলীকে

তার নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত করালেন। কতক্ষণ ভেবে আলী বিনীতভাবে চীফ কমান্ডারকে বললো, 'মুখোমুখী যুদ্ধক্ষেত্রের বর্তমান পরিস্থিতি ও গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই, অভিজ্ঞ কমান্ডারগণ থাকাবস্থায় আমি কি তাদের চেয়ে বেশী ভালো করতে পারবো?'

চীফ কমান্ডার বললেন, 'আমি ভেবে-চিন্তেই তোমাকে নির্ধারণ করেছি। তুমি ফিল্ডে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারপর পরিকল্পনা তৈরী করবে। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।'

দ্বিতীয় দিন চীফ কমান্ডারের সাথে আলীর দেখা হলে চীফ কমান্ডার বললেন, তুমি অপারেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকো। জুমআর পরই তোমাদের রওয়ানা হতে হবে।

আলী বললো, আপনি যদি আব্দুর রহমান, দরবেশ খান, ফারুখ খান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহকে আমার সাথে যাওয়ার অনুমতি দিতেন, তাহলে এদের সাহচর্যে আমার মনোবল বৃদ্ধি হতো।'

চীফ কমান্ডার মুচকি হেসে প্রস্তাবিত ব্যক্তিদেরকে আলীর সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

শুক্রবার জুমআর নামাজের সময় প্রায় হয়ে গেছে। আলী সব প্রস্তুতি সেরে চীফ কমান্ডারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্য-পানীয় দু'টি খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে দফতরের সামনে বেঁধে রাখা হলো।

আলী গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। তার চেহারা বিমর্ষ। চীফ কমান্ডার এসে আলীকে চিন্তামগ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আলী! তোমাকে এতো বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

আলী বললো, ভাবছি, আপনি যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, তা কি যথাযথভাবে পালন করতে পারবো?

কমান্ডার বললেন, হ্যাঁ! চিন্তা করা ভালো তবে যে কোন সমস্যা সামনে এলে বিমর্ষ হওয়া ঠিক নয়। 'তোমরা আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে ময়দানে যাচ্ছো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে অতীতের যোদ্ধাদের মতো সাহায্য করবেন।'

অতঃপর আলী ও সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে চীফ কমান্ডার বললেন, আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে বেরুচ্ছেন। আপনাদের সফলতা নির্ভর করবে আপনাদের ঐক্য, সমঝোতা ও নিষ্ঠার ওপর। কোন বিষয়ে মতানৈক্য হলে কমান্ডারের ফয়সালা দৃঢ়চিত্তে মেনে নিতে হবে। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহর পথে জিহাদরত কোন মুজাহিদ শত কঠিন দুরাবস্থাতেও ধৈর্য হারা হবে না, ঘাবড়ে যাবে না, চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রেখে কাজ করে যেতে হবে। সব সময় আল্লাহর সাহায্যের জন্য,বেশী বেশী দু'আ করবে। তিনি সকল সমস্যার সমাধানকারী ও শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

চীফ কমান্ডারের দিক নির্দেশনার পর সকল মুজাহিদ সাথী দু'আ করলো। চীফ কমান্ডার বিদায়ী মুজাহিদদের সাথে বিদায়ী কোলাকুলি করলেন। 'আল্লাহু আকবার' 'নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব' শ্লোগান মুখরিত পরিবেশে দশ সদস্যের মুজাহিদ কাফেলাটি মহান মিশন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

মারকাজ থেকে রওয়ানা হয়ে আসার তিনদিন পর মুজাহিদ কাফেলাটি একদিন সকাল ন'টায় তাবু গুটিয়ে এগুচ্ছিলো। মুজাহিদ কাফেলা পাহাড় অতিক্রম করে সংকীর্ণ একটি নালা পেরিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিলো। এমন সময় আলী পাশের পাহাড়ে দেখতে পেলো, মুজাহিদ সদৃশ একটি লোককে ঘিরে রেখেছে কিছু মানুষ। আলী তৎক্ষণাৎ কাফেলা থামিয়ে নিজেই এগিয়ে গেলো দাঁড়ানো লোকগুলোর জটলার দিকে। জানতে পারলো, এরা সকলে মুজাহিদদের সমর্থক ও সাহায্যকারী। আলী আরো জানতে পারলো, এক বৃদ্ধ লোক পাহাড় খনন করতে চাচ্ছেন। কিন্তু অন্যেরা তাকে পাহাড় খনন থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে। বৃদ্ধ তাদের কথা না মেনে কোদাল দিয়ে পাহাড় খনন শুরু করলে সবাই তাকে তিরস্কার করছে।

আলী উৎসুক ব্যক্তিদের বললো, এখানে কি ঘটেছে? আপনারা কেন এই বৃদ্ধকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন?

জটলা বাধা লোকদের একজন বললো, এই বুড়ো পাগল হয়ে গেছে। সে বলে, তার স্ত্রী-সন্তান নাকি এই পাহাড়ে চাপা পড়েছে। আমরা তাকে খুব বুঝিয়েছি, তোমার স্ত্রী, সন্তান পাহাড়ে চাপা পড়লেও তারা আর বেঁচে নেই। কাজেই পাহাড় খুড়ে তোমার কি লাভ হবে? কিন্তু বুড়ো আমাদের কথা শুনছে না।

আলী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা! আপনি কেন পাহাড় খুড়তে চাচ্ছেন? আপনার স্ত্রী সন্তানরা এখানে চাপা পড়লেও তো তারা আর বেঁচে নেই। এছাড়া একাকী আপনার পক্ষে পাহাড় খনন করা-ও তো সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ বললেন, বেটা! এরা জ্যান্ত না মৃত কথা সেটা নয়। আমি এদের এখান থেকে নিয়ে নিজের কবরস্তানে দাফন করতে চাই। কিন্তু এরা সহযোগিতার পরিবর্তে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। এদের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত ব্যথিত।

আলী বল্লো, বাবা! আপনি ঘটনা খুলে বলুন, কি করে আপনার স্ত্রী-সন্তানরা এই পাহাড়ে চাপা পড়লো?

বৃদ্ধ কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, বেটা! আমার জীবন কাহিনীও অন্যান্য আফগান মজলুমদের চেয়ে ভিন্ন নয়। এখান থেকে দু'মাইল উত্তরে পাহাড়ের বিপরীত দিকের গ্রামেই আমার বাড়ী। আজ থেকে তিন বছর আগে খুব সুখেই ছিলাম আমরা। আমাদের গ্রামটি ছিলো আংগুর, আখরোট, ছেব ইত্যাদি ফলের সব ছেয়ে উর্বর ভূমি। সারা গ্রামের মানুষ সুখ-সাচ্ছন্দেই ছিলো। এমতাবস্থায় রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালালো। তারপরও কয়েকবছর আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ

নিরাপদ। তবুও আশে-পাশের কয়েক গ্রামের লোক রুশ হানাদার বাহিনীর জুলুম অত্যাচারের কাহিনী শুনে ভয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলো। তারা আমাদেরকেও বললো, রুশ হানাদার বাহিনীর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, কবে কোন গ্রামের উপর হামলা করে বসে, আমাদের সাথে তুমিও পাকিস্তান চলো। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিলোনা, এতো সুন্দর বাগান, চারণভূমি, নিজের সাজানো ঘর-দোর ফেলে বিদেশে চলে যাবো!

বৃদ্ধ কতক্ষণ নীরব থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বললো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো। হঠাৎ একদিন আধাডজন বোমারুবিমান গ্রামটির উপর বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ শুরু করলো। পুরো গ্রামটি পরিণত হলো মৃতপুরীতে। সাজানো সুন্দর বাগান, গোছানো ঘরবাড়ী সব বিনাশ হয়ে গেলো। যারা বেঁচে ছিলো, বোমারু বিমান চলে যাওয়ার পর তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো। আমার এক ছেলে ও পুত্রবধু নিহত হলো। ছোট দু' সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে আমি এখানে আশ্রয় নিলাম।

এ পাহাড়ে ছোট একটা গর্ত ছিলো। আমি তাদের সেখানে বসিয়ে গ্রামে চলে এলাম আহতদের সেবা এবং নিহতদের দাফন করার জন্য। গ্রামের জায়গায় জায়গায় তখনও আগুন জ্বলছিলো। আমি অন্যান্যদের সাথে নিয়ে আহত ও মৃতদের ধ্বংসাবশেষের নীচ থেকে উদ্বার করছিলাম। ধ্বংসাবশেষ থেকে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে নিহতদের দাফন-কাফন শেষ না করতেই আবারো রুশ বিমানের বোম্বিং শুরু হয়ে গেলো।

আমরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাহাড়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। যে যেদিকে পারলো দৌড়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলো। ঘরবাড়ী শস্যক্ষেত-বোমার আঘাত থেকে কোন কিছুই রক্ষা পেলো না। আমি পরি মরি করে প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে ছিলাম। হঠাৎ করে আমার পাশেই বিস্ফোরিত হলো এক বিশাল বোমা। দূরে ছিটকে পড়লাম। এরপরে কি হলো, কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। আমার যখন হুঁশ ফিরে এলো, দেখলাম, আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, আমার গ্রাম ও পাড়ার পরিচিত আরো কয়েকজন আহতাবস্থায় যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে। স্ত্রী পুত্রদের কথা মনে পড়লো আমার। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কিছুই বলতে পারলো না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে জানালো, তোমাকে যে সৈনিক হাসপাতালে নিয়ে এসেছে, কাল সে আসবে, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো। পরদিন সৈনিকটি এলে আমার প্রশ্নের জবাবে সে বললো, যেখানে তুমি আহত হয়ে পড়েছিলে সেখানে আমি কোন শিশু বা মহিলা দেখিনি। ওর কথা শুনে আমি শুকনো ঠোঁট জিহবা দিয়ে ভিজিয়ে বললাম, আল্লাহর শোকর! জালেমদের হাত থেকে আমার স্ত্রী-পুত্ররা বেঁচে গেছে। আমার ধারণা ছিলো, বোম্বিং থেকে রেহাই পেয়ে ওরা পাকিস্তান চলে গেছে।

দু'মাস হাসপাতালে পড়ে থাকার পর কিছুটা সুস্থ হলাম। কিন্তু জালেম রুশবাহিনী আমাদের জেলখানায় চালান করলো। জেলখানায় স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য চললো অত্যাচার। সে অত্যাচার-জুলুমের কথা স্মরণ হলে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। অবর্ণনীয় অত্যাচার করে জিজ্ঞেস করা হতো, বলো মুজাহিদদের সাথে তোমার কি

সম্পর্ক। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমার সামনেই ক'জন শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে প্রত্যেক কয়েদির উপরই চলতো হায়েনার আক্রমণ। বৃদ্ধ আলীকে নিজের হাত দেখিয়ে বললো, বেটা! এই দেখ জালেমরা আমার নখের নীচ দিয়ে গরম সুই ফুটিয়ে সবগুলো আঙ্গুল নষ্ট করে দিয়েছে। ওরা কয়েদীদের শরীরের গোশত কেটে তাতে লবণ-মরিচের গুড়ো মেখে দিতো। দেখো, এখনও আমার শরীরের গর্তগুলো ভরাট হয়নি। অসহ্য যন্ত্রণায় যখন আসামীরা তড়পাতে থাকতো তখন ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। কয়েকমাস কয়েদখানায় আমাকে এভাবে শাস্তি দিয়েছিলো।

গ্রেফতারীর আড়াই বছর পরে একদিন কয়েদখানার রুশ অফিসার আমাকে ডেকে পাঠালো। মুখোমুখী হলে আমাকে এই বলে প্রস্তাব দিলো যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কাজ করতে রাজী হলে ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে। আমি মুখের উপর 'না' বলে দিলাম। আবার আমাকে নিক্ষেপ করলো কারাগারে। জেলখানার সাথীরা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, এই শর্ত মেনে নিয়ে হলেও আমি যেনো মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু আমি তাতে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। যারা আমাদের অসহায় স্ত্রী-পুত্র ও দেশের মানুষের দুর্দিনে ঠাই দিয়েছে, তাদের নিরাপরাধ শিশু-পুত্র-কন্যাদের উপর আমি বোমা নিক্ষেপ করতে পারবো না। পারবো না অকৃতজ্ঞের মতো নিস্পাপ শিশুদের খুনে হাত রাঙ্গাতে। এভাবে আরো তিন মাস কেটে গেলো। হঠাৎ একদিন জানি না কি কারণে আমাকে ছেড়ে দিলো। হয়তো এমনও হতে পারে যে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, ওদের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে আর তেমন কিছু করা সম্ভব নয়, তাই অকারণে ওদের চাল-ডাল খাইয়ে আমার মত অকর্মণ্য বুড়ো কেন পালবে। এ জন্যেই হয়তো মুক্তি পেয়েছি।

মুক্তি পাওয়ার পরে আমি সোজা পাকিস্তান গিয়ে উঠি। সেখানে দীর্ঘ দু'মাস পর্যন্ত আমার স্ত্রী-পুত্রদের খোঁজ করেও কোন হদিস পাইনি। অনেক প্রতিবেশী পরিচিতদের দেখা হয়েছে, কিন্তু তারা কেউ আমার স্ত্রী-পুত্রদের পাকিস্তান যেতে দেখেনি বলে জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমি আবার আফগানিস্তানের পথে পা বাড়ালাম। এখানে পৌঁছে দেখি, পাহাড়ে আগে যে গর্তটি ছিলো সেটি এখন নেই। প্রথম প্রথম আমার সন্দেহ হচ্ছিলো হয়তো পাহাড়টি আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার স্মৃতিশক্তি এতো দুর্বল হয়নি যে, আমার গ্রামের পাশে অবস্থিত পাহাড়টি আমি চিনব না। যদিও এটির পূর্ব আকৃতি বোমার আঘাতে হানাদার বাহিনী বিগড়ে দিয়েছে, বোমার আঘাতে সেই গর্ত মুছে গেছে এবং ওপর দিকটায় ঝোপ-ঝাড় সৃষ্টি হয়েছে।

পাহাড়ের বিকৃতি ও পরিবর্তন দেখে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ওরা হয়ত এখানেই নিহত হয়েছে। আর পাহাড় খুড়ে কি হবে এখানেই থাক। কিন্তু আমার সন্দেহ হলো, যদি ওরা এখান থেকে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে এখনও বেঁচে আছে এবং আমার অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমার সন্ধান পাচ্ছে না। এসব সন্দেহ দূর করার জন্য শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি পাহাড় খুঁড়ে দেখব। যদি পাই তবে তো নিশ্চিত হলাম, না হয় ওদের খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব লোক আমাকে সাহায্যের

পরিবর্তে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। বেটা! তুমিই বলো, এখন আমি কি করবো? গর্ত খুঁড়ে ওদের না পেলে আমি খুঁজে ফিরব, না হয় এই ভেবে শান্ত হবো যে, ওরা মরে গেছে?

বৃদ্ধের হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে সেখানে দাঁড়ানো অনেকের চোখে অশ্রু ছলছল করছিলো।

আলী বললো, 'বাবা! আপনার যন্ত্রণায় আমরাও ব্যথিত। আফগানিস্তানের অধিকাংশ পিতার জীবন এমনই দুঃখজনক ঘটনায় ভারাক্রান্ত। কেউ সন্তান হারিয়েছে, কেউ হারিয়েছে মা-বাপ। ঠিক আছে, পাহাড় খুঁড়তে আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

আলী ও সাথী মুজাহিদরা গর্তের মুখ থেকে মাটি সরাতে লেগে গেলো। তাদের দেখাদেখি স্থানীয়দেরও কেউ কেউ শরীক হলো।

সকাল দশটা থেকে মাটি সরানো শুরু হলো আর দুপুর একটা পর্যন্ত চললো, কিন্তু তখন পর্যন্ত কোন মৃত মানুষের আলামত চোখে পড়লো না। সাথী মুজাহিদরা জোহরের নামায ও আহারের বিরতি দিলো। নামায সেরে তারা গতকালের অবশিষ্ট শুকনো রুটি খেয়ে আবার মাটি খুঁড়তো লেগে গেলো। আলী বিরামহীনভাবে মাটি সরাতেছিলো। আসরের নামাযের সময় হয় হয় অবস্থা এমন সময় বুড়ো চীৎকার দিয়ে বললো, 'এই তোমরা থামো থামো! পেয়েছি! পেয়েছি!!!

বৃদ্ধার আওয়াজ শুনে সবাই তার দিকে অগ্রসর হলো। বৃদ্ধা বললো, এই দেখো আমার মেয়ে গুলজানের হাত।

সবাই গভীরভাবে খেয়াল করে বুঝতে পারলো, ঠিকই একটি ছোট্ট হাতের আঙ্গুল দেখা যায়।

এরপর আলীর নির্দেশে সকলেই সতর্কতার সাথে অল্প অল্প মাটি সরাতে লাগলো। অল্পক্ষণ পরেই প্রকাশ হয়ে গেলো পুরো ঘটনা।

দেখা গেলো, এক বৃদ্ধা একটি ছেলে ও মেয়ের উপস্থ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তখনও এদের কাপড় সম্পূর্ণ অক্ষত, অক্ষত তাদের লাশ। এদের অবস্থা এমন ছিলো যে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, বৃদ্ধা মহিলা গর্তের বাইরে কাউকে দেখে ভারী কাপড়ের পর্দা দিয়ে নিজের চেহারা ডেকে ফেলেছিলো, কাছেই ছেলে ও মেয়েটির দিকে তার দৃষ্টি ও হাত প্রসারিত। ছেলের মাথায় টুপি এবং মেয়েটির মাথার চুল গ্রামীণ আফগানী নিয়মে বেণী পাকানো। উভয়েই তার মার দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। মনে হয় মৃত্যুর সময় এরা সবাই একে অন্যের সাহায্যে হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলো, আর এ অবস্থায়ই শীতল মৃত্যু এদের অভিনন্দন জানায়।

মা, মেয়ে ও ছেলের মৃত্যুদৃশ্যটি এমন ছিলো যে মনে হচ্ছিলো টেলিভিশনে কোন এ্যাকশন দেখানো হচ্ছিলো, এমতাবস্থায় স্থির হয়ে গেলো চিত্র।

কাছে থেকে অবলোকনকারীরাও ভাবতে পারেনি যে ওরা মরে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিলো, হয়তো এখনি হেসে উঠবে মা মহিলাটি। তিন বছর পরও তাদের লাশগুলো

মোটেও বিকৃত হয়নি। না তাদের কাপড়গুলো নষ্ট হয়েছে না তাদের শরীর পচন বা কীটে খেয়েছে। এ দৃশ্য যেমন ছিল ঈমানদীপ্ত ঠিক তেমনই ছিল রুশ বাহিনীর নির্মম জুলুমের জ্বলন্ত সাক্ষী। সে হত্যাযজ্ঞ দেখে যে কোন পাষাণের চোখেও অশ্রু ঝরবে।

বৃদ্ধ ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতে লাগলো। উপস্থিত ব্যক্তিদের চোখেও নেমে এলো অশ্রুরবন্যা। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধের কান্না থামলে তিনি তার কন্যার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, একদিন জুমআর নামাযের পূর্বে ইমাম সাহেব জিহাদের ওপর উজ্জীবনীমূলক বক্তৃতায় বলেন, রুশ হানাদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক আফগানী নাগরিকের ওপর ফরয। আমার এ মেয়েও ইমাম সাহেবের বক্তৃতা শুনেছিলো। রাতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা জিহাদ কি? আমি বললাম, বেটী! দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধি ও নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধ করার নামই জিহাদ।

মেয়েটি আমার গলা ধরে আদুরে স্বরে বললো, বাবা! ইমাম সাহেব তো বলেছেন, কাফেররা আমাদের পাশের মসজিদ ধ্বংস করেছে, মানুষ মেরেছে, তারপরও তুমি ওদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো না কেন?

আমি তাকে বললাম, বেটী! যাবো, অবশ্যই যাবো।

বাবা! আমাকেও কিন্তু সাথে নিয়ে যেয়ো। মেয়েটি বললো, 'বাবা! যদি আমি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হই, তাহলে আল্লাহ খুশী হয়ে আমাকে বেহেশত দিয়ে দিবেন তাই না?' এই বলে বৃদ্ধ আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

বৃদ্ধের কথা শুনে আলীরও তার বোন সায়মার কথা স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। সেও দূরে গিয়ে হাটুতে মাথা লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার মনে পড়লো, বাড়ী থেকে আসার সময় আলী প্রতিজ্ঞা করেছিলো, আমি বোন সায়মার রক্তের প্রতিটি ফোঁটার প্রতিশোধ নেব। কিন্তু রুশ জালেমরা এখানে অগণিত নারী ও শিশু হত্যা করে যে রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছে, সকল রুশ হানাদার বাহিনীকে হত্যা করলেও এর প্রতিশোধ নেয়া হবে না। আলী মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা করলো, 'আমি শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত রুশ জালেমদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো।'

আলী নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে বৃদ্ধকে শান্ত করলো এবং তিনটি লাশ নিয়ে বৃদ্ধের পারিবারিক কবরে দাফন করে এখানেই তাবু গেড়ে রাত কাটিয়ে দিলো।

সকাল বেলা নাশতা সেরে আলী রওয়ানা হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলো, বৃদ্ধ এসে বললো, আমিও তোমাদের সাথে যাবো। আর কিছু করতে না পারি তোমাদের খানা তো পাকাতে পারবো। আলী বৃদ্ধকেও সাথে নিয়ে এলো।

মুজাহিদ কাফেলাটি রওয়ানা হয়ে তখনও দু'ঘন্টার পথ অতিক্রম করেনি। হঠাৎ শত্রুবাহিনীর চারটি হেলিকপ্টার এসে বোমা নিক্ষেপ করতে লাগলো। আলী দ্রুত সাথীদের পাহাড়ে চড়ে নিরাপদ স্থানে পজিশন নেয়ার নির্দেশ দিলো। খচ্চর দু'টিকে গাছের পাশে আড়ালে দাঁড় করিয়ে রাখলো। হেলিকপ্টারে আঘাত হানার মতো কোন

অস্ত্র আলীর বাহিনীর নিকট ছিলো না। তাই কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে ইচ্ছে মতো বোমা নিক্ষেপ করে হেলিকপ্টারগুলো চলে গেলো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে চলে এলো জঙ্গীবিমান। জঙ্গী বিমানের বোম্বিং ছিলো খুবই ভয়াবহ। আলী ও সাথীদের সমূহ ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিলো। গাছের সাথে বেঁধে রাখা খচ্ছর দু'টি ভয়ে দড়ি ছিড়ে পাশের পাহাড়ের কাছে চলে গিয়েছিলো। রুশবাহিনী এ দু'টিকে লক্ষ্য করে অগণিত বোমা নিক্ষেপ করে চলে গেলো। খচ্চর দু'টি বোমার আঘাতে মারা গেলো। বোমারু বিমান আকাশে চক্কর দেয়া অবস্থায়ই ট্যাংক সজ্জিত সাজোয়া যান এসে উপস্থিত। আলী তাড়াতাড়ি মুজাহিদদের পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করার নির্দেশ দেয়। পাহাড়ের চূড়ায় ঝোপ-ঝাড় গাছ-গাছালির আড়ালে সকল মুজাহিদ একত্রিত হলো। খচ্চর মারা যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সামগ্রী তাদের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে হয়েছিল। সব মুজাহিদকে একত্রিত করে আলী পরামর্শ চাইলো, উদ্ভূত সমস্যায় কি করা যায়।

বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন, গতকাল আমরা যখন গর্ত খুড়ছিলাম তখন সেখানে হয়তো কোন চর ছিলো। সে রুশ বাহিনীক আপনাদের উপস্থিতির খবর দিয়েছে। অন্যথায় এদিকে পাঁচ দশ গ্রামে কোন মুজাহিদক্যাম্প বা সেনাছাউনী নেই।

আলী বললো, যদিও আমাদের হাতে মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র নেই, তবু যেগুলোই আছে তা' দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মোকাবিলা করে যাবো। দু'জন দু'জন করে গ্রুপ তৈরী করে আলী তাদের কয়েকটি জায়গায় বসিয়ে দিলো। রুশ বোমা হামলায় যেসব গর্ত হয়েছিল, মুজাহিদরা এ সবের মধ্যে পজিশন নিয়ে লুকিয়ে থাকলো।

শত্রু বাহিনীর সাজোয়া যান তখন পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছে গেছে। ওরা কোন নিশানা ঠিক না করে পাহাড়ের দিকে এলোপাথাড়ি ফায়ার করতে লাগলো। দীর্ঘ সময় গোলা নিক্ষেপের পর তারা উপরের দিকে উঠতে লাগলো। বিরাট এক শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবেলায় মাত্র কয়েকজন প্রায় অস্ত্রহীন মুজাহিদের যুদ্ধ ও জীবন দেয়া-নেয়ার খেলা জমে উঠলো। যে খেলা লোমহর্ষক ও আশ্চর্যজনক।

ট্যাংক ও সাজোয়া যান থেকে নেমে রুশ সেনারা পাহাড় ঘিরে ফেললো। মুজাহিদদের আক্রমণের ভয়ে ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপর দিকে উঠতে লাগলো ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে। এমতাবস্থায় মুজাহিদদের আক্রমণ করা ছাড়া বিকল্প পথ ছিলোনা। সামান্য গোলা বারুদ যা ছিলো তা ছুঁড়তে শুরু করলো। মুজাহিদদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য রুশ বাহিনী গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো আর কিছু সংখ্যক নীচের দিকে দৌড়ালো।

ফায়ার করার ফলে রুশ বাহিনীর কাছে মুজাহিদ দলের অবস্থান চিহ্নিত হয়ে গেলো। এখন সকল রুশ সেনা অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে পাহাড়ে চড়তে লাগলো। রুশ বাহিনীর ধারণা, মুজাহিদদের কাছে গোলা-বারুদ তেমন নেই। এজন্য যখনই

মুজাহিদরা গুলী করত ওরা গাছের আড়ালে না হয় ট্যাংকের আড়ালে চলে যেত। এভাবে এগুতে এগুতে প্রায় মুজাহিদ অবস্থানের কাছে পৌঁছে গেলো রুশ বাহিনী। তখন মুজাহিদদের বুলেট প্রায় শেষ।

রুশ বাহিনীর প্রথমে এ ধারণা ছিলো যে, মুজাহিদরা সংখ্যায়ও অত্যন্ত কম। কিন্তু পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে ফায়ার করার কারণে রুশ বাহিনী প্রকৃত সংখ্যা আন্দাজ করতে পারছিলো না।

রুশ কমান্ডার মেগাফোন দিয়ে মুজাহিদদের হাতিয়ার ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিলো। রুশ কমান্ডার বললো, আমরা জানি তোমরা সংখ্যায় কম এবং তোমাদের হাতে গোলাবারুদ নেই। তোমাদেরকে আধা ঘন্টা সময় দেয়া হলো। এর মধ্যে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পন করো। এটা ছিলো মুজাহিদদের ভীত-সন্ত্রস্থ করার জন্য রুশ কমান্ডারের একটি চাল।

আলী ক্রোলিং করে প্রত্যেক মুজাহিদ গ্রুপের কাছে গিয়ে দেখলো, হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি করে গুলী এক এক গ্রুপের কাছে অবশিষ্ট আছে। প্রত্যেক মুজাহিদকে আলী এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিলো,যাতে সবাই মিলে পরামর্শ করে নতুন কোন পন্থা বের করা যায়। একটা ঝোপের আড়ালে বোমার আঘাতে সৃষ্ট গর্তে সকল মুজাহিদ মিলিত হলো। আলী তাদের বললো, এই মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি?

বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন, 'মরতে একদিন হবেই। তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে কারো মৃত্যু আসে না। বন্দী হয়ে নির্যাতনে কাতরানোর চেয়ে এবং শত্রু বাহিনীর বন্দীশালায় অসহ্য কষ্ট ভোগ করার চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুবরণ সাহসিকতার পরিচায়ক এবং অত্যন্ত সম্মানজনক।' সকল মুজাহিদ বৃদ্ধের কথায় সায় দিলো।

আলী বললো, আমরা এখন যে সংকটে পড়েছি এমন সংকট থেকে বহুবার আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করেছেন। আল্লাহ্ আমাকে রুশ বন্দীশালা থেকেও বাঁচিয়ে এনেছেন, গর্তের কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহ আমাদের মদদ করেছেন। নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। আল্লাহ অবশ্যই কোন না কোন পথ আমাদের জন্য খুলে দেবেন।

মুজাহিদদের সাহস বৃদ্ধির জন্য আলী বললো, আমার মনে পড়ে, আমার দাদা বলতেন, ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধে একদিন তারা শত্রু সৈন্যের বেষ্টনিতে আটকে গেলেন, তখন তাদের পানাহার, গোলাবারুদ সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবুও মুজাহিদরা মনোবল হারায়নি। সাহায্যের জন্য সকলেই দু'আ করলো। হঠাৎ ভীষণ তুফান ও শিলা বৃষ্টি শুরু হলো। প্রচন্ড তুফান ও শিলা বৃষ্টিতে বহু শত্রুসেনা নিহত এবং আহত হলো। আর বাকীরা ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। সেদিন মুজাহিদরা সরাসরি আল্লাহর সাহায্যে মুক্তি পেয়েছিলো। এসো ভাইয়েরা! আমরাও আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করি, তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

সকল মুজাহিদ আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলো, 'আয় মাবুদ! মৃত্যুতে আমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু আমরা এ সংকটেও তোমার দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধির লড়াই অব্যাহত রাখতে চাই। তুমি আমাদের সাহায্য কর।

আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের পূর্বসূরী মুজাহিদদের যেভাবে সাহায্য করেছো অনুরূপ আমদেরও সাহায্য কর।

হে মা'বুদ! আবরাহা বাহিনীকে আবাবীলের দ্বারা যেভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছো, সে ভাবে ওদেরও ধবংস করে দাও। আমাদের ধৈর্য বৃদ্ধি করে দাও, দৃঢ় থাকার তৌফিক দাও।

দু'আর পর মুজাহিদদের মানোবল চাঙ্গা হলো। তাদের উদ্বিগ্নতা কেটে গেলো। আলী দুরবীনে রুশ সেনাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলো। দেখতে পেলো রুশ বাহিনীর সাজোয়া যান ও ট্যাংক বহরের পাশেই দু'টি অ-বিস্ফোরিত বোমা পড়ে রয়েছে। সে আব্দুর রহমানের হাতে দুরবীনটি দিয়ে বললো, দেখো তো, ও-গুলো কি অক্ষত বোমা না অন্য কিছু? আব্দুর রহমান বললো, 'বোমা-ই-তো দেখা যায়। তবে এতে আমাদের লাভ হবে কি।'

আমরা যদি এগুলোর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি তাহলে দেখবে, দুশমনের পুরো কনভয় ধ্বংস হয়ে যাবে। আলী বললো।

আমরা কিভাবে এগুলোকে ব্রাস্ট করবো। বিমান থেকে নিক্ষেপ করার পরও যেহেতু এগুলো ফাটেনি আমরা এখানে বসে ভাবলেই কি তা ফাটবে? আব্দুর রহমান বললো।

আলী বললো, চেষ্টা করে দেখি।

আলী নিজের ক্লাসিনকভটি নিয়ে নিশানা ঠিক করছিলো, সে মুহূর্তে মেগাফোনে আবার ভেসে এলো শত্রু কমান্ডারের নির্দেশঃ আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে, এখনও হাতিয়ার ফেলে দাও। না হয় আমরা ফায়ারিং করব। তোমরা কেউ প্রাণে বাঁচতে পারবে না।

আলী চীৎকার করে বললো, আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর। দেখবে, আমার আল্লাহ কিভাবে তোদের মৃত্যুদূতের হাতে তুলে দেন।

অন্যান্য মুজাহিদরা আলীকে উদ্দেশ করে বললো, এটা তুমি কি করলে, এখন তো ওরা আমাদের অবস্থান জেনে ফেলেছে। এখন এক বুলেটেই সবাইকে খতম করে দেবে।

'বন্ধুরা! কোন চিন্তা করো না! দেখবে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করবেন এবং দুশমনদের নিঃশ্চিহ্ন করে দেবেন। দেখো, দু'টি অক্ষত বোমা শত্রুবাহিনীর কাছে পড়ে রয়েছে, এগুলো আল্লাহ আমাদের সাহায্যের জন্য অক্ষত রেখেছেন। দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হলেই দেখবে দুশমন ঠান্ডা মেরে গেছে। আলী সবাইকে সান্ত্বনা দিলো।

আলীর কথা শেষ না হতেই নীচ থেকে রুশ বাহিনীর চীৎকার ভেসে এলো, 'আমরা না তোমাদের প্রভুকে বিশ্বাস করি, না তোমাদের ফেরেশতায় বিশ্বাস করি। যদি তোমাদের কোন খোদা থেকে থাকে তবে তাকেও ডেকে নিয়ে এসো। আজ তোমাদের সাথে তাকেও 'বন্দী করে নিয়ে যাব এবং তোমাদের সাথে তোমাদের প্রভূর লীলাও সাঙ্গ করবো।'

এ কথা শুনে আলী ক্রোধে জ্বলে উঠল। সে চীৎকার করে দুশমনদের জবাবে বললো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমরা আমাদের প্রভূকেও বিশ্বাস করবে, ফেরেশতাকেও দেখতে পাবে। আমাদের প্রভূ সম্পর্কে যে ধৃষ্টতা তোমরা দেখিয়েছো এর সমুচিত সাজাও তোমাদের ভোগ করতে হবে।'

আলী মনে মনে দু'আ করলো, আয় আল্লাহ! আমি তোমার ভরসায় শয়তানের পুজারীদের চ্যালেঞ্জ করেছি। একমাত্র তুমিই পার আমার সম্মান রক্ষা করতে।

দু'আ শেষ করে আলী ক্লাসিনকভ নিয়ে বোমা টার্গেট করে গুলী ছুড়ল। প্রথম গুলীটি লক্ষভ্রষ্ট হল। আলী নিরাশ হলো না। আবার দ্বিতীয় একটি বুলেট ছুড়লো, তা-ও লক্ষ্য ভেদ করলোনা। এদিকে শত্রুবাহিনী ফায়ার শুরু করে দিয়েছে। গর্তে সমবেত মুজাহিদদের পাশেই এসে পড়ছে অসংখ্য বুলেট। আলী আল্লাহু আকবার ধ্বনী তুলে তৃতীয়বার গুলী ছুড়লো। নিক্ষিপ্ত বুলেটটি বোমায় আঘাত হেনেছে কিন্তু বিস্ফোরিত হলো না। আলীর কাছে আর কোন গুলী ছিল না। ততক্ষণে সাথী মুজাহিদরা বলতে শুরু করেছে, এখান থেকে বেরুতে চেষ্টা কর। যে যেভাবে পারো জীবন বাঁচানোর চেষ্টা কর।

আলী বললো, এখান থেকে জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। হয় মৃত্যু অথবা গ্রেফতার হতে হবে।

তৃতীয় বুলেটটি ব্যর্থ হলেও আলীকে হতাশা আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

আলী আব্দুর রহমানের কাছ থেকে ক্লাশিনকভটি নিজ হাতে নিয়ে বোমা ব্রাস্ট করার শেষ চেষ্টা করছে। আবার মনে মনে আল্লাহর করুণা ভিক্ষা চেয়ে আরেকটি বুলেট ছুড়ে দিলো। এবার শুধু লক্ষ্য ভেদই হলো-না বিকট শব্দে বোমাটি বিস্ফোরিত হল। আলী দূরবীন নিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলো, পুরো উপত্যকা ধূয়াচ্ছন্ন, আকাশে ধুলো-বালি ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। দূরবীন ঘন ঘন হাত বদল করে সবাই দৃশ্যটি দেখছিলো। শত্রু সেনাদের ফায়ারিং বন্ধ হয়ে গেলো। নিমিষেই সব নিঃস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পর ধূয়াচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলে পাহাড়ের নিম্নাঞ্চলে দেখা গেলো, সাজোয়া যানগুলো বোমা বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিধ্বস্ত ট্যাংকে আগুন জ্বলছে। কিছু সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। আলী সবার সাথে পরামর্শ করে নীচে নামার সিদ্ধান্ত নিলো।

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মুজাহিদরা সকলেই নীচে নেমে নিজেদের পজিশন স্থির করে নিলো। আলী একটি সাজোয়া যানের আড়াল থেকে হাঁক দিলো, 'যেসব রুশ সৈন্য জীবিত আছো হাতিয়ার ফেলে সামনে এসে আত্মসমর্পন করো।'

অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকা কয়েকজন রুশসৈন্য হাতিয়ার ফেলে হাত উঁচু করে দাঁড়ালো।

আলী দরবেশ খান ও আব্দুর রহমানকে নির্দেশ দিলো এদেরকে পিছন দিকে হাত মুড়িয়ে বেঁধে ফেলতে। এরা দু'জন রুশ বন্দীদের বাঁধার কাজ শেষ করলে আলী কয়েকজন মুজাহিদকে বিভিন্ন পয়েন্টে তল্লাশী করার কথা বললো। চার মুজাহিদ সাথীকে বললো, মনে হয় কিছু রুশ সৈন্য পালিয়েছে, এদের তাড়া করো। আলী তাদের আরও বললো, তোমাদের গুলী শেষ হয়ে থাকলে রুশদের ম্যাগজিন ও ক্লাসিনকোভগুলো নিয়ে যাও।

কোন মুজাহিদের কাছেই তখন বুলেট ছিলো না। রুশ সৈন্যরা যদি তা' বুঝতে পারতো তাহলে তখনও নিজেরা স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করতো না। সকল মুজাহিদ তখন আত্মসমর্পণকারী রুশসেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে পলায়নপর শত্রুসেনাদের তাড়া করলো।

বোমা বিস্ফোরণে রুশ বাহিনীর ট্যাংকবহর ও সাজোয়া যানগুলো ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত গোলা-বারুদে আগুন লেগে গিয়েছিলো। প্রায় ষাটজন রুশসেনার দেহ পেজা তুলার মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শতাধিক যখমী অবস্থায় ধরা পড়লো।

আলীর মুজাহিদ গ্রুপ সমস্ত সচল অস্ত্র গোলাবারুদ কুড়িয়ে নিচ্ছিলো। অন্যান্য মুজাহিদরা দশ জন রুশ সেনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলো। বিস্ময়কর এ বিজয়ে সকল মুজাহিদ প্রাণ ভরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো।

আলী তীব্রভাবে অনুভব করছিলো যে, খুব তাড়াতড়ি এ স্থান ত্যাগ করা দরকার। কিন্তু বন্দী রুশ সেনাদের ব্যাপারে সে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো।

আব্দুর রহমান ও বৃদ্ধ মুজাহিদ বললো, আমরা এদের সাথে নিয়ে যেতে পারি না, আবার এদের ছেড়ে দেওয়াও সমিচীন নয়, কাজেই এদের হত্যা করা দরকার।

আলী বললো, বন্দীদের সাথে ইসলাম এমন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। তাছাড়া মামলা দায়ের ও ইসলামী আদালতের সিদ্ধান্ত ছাড়া আমরা এদের হত্যা করব কিভাবে!

বৃদ্ধ মুজাহিদ বললো, এসব জালেম রুশরা বন্দী-মুজাহিদদের সাথে কম জুলুম করে না। ওরা তো মুজাহিদদের হাত-পা বেঁধে শিকারী কুকুরের সামনে ফেলে দেয়।

জালেম রুশদের মতো আমরাও যদি শাস্তি দেই তবে তো আমরাও ওদের মতোই হয়ে গেলাম। তাহলে ইসলাম ও কম্যুনিজমের তফাৎ থাকলো কেই। আমরা এদেরকে হাত পা বেঁধে এখানেই রেখে যাব, ক্ষুৎপিপাসায় কাতরাতে কাতরাতে মরবে, না হয় বেঁচে যাবে।' মুজাহিদদের কেউ কেউ প্রথমে ভিন্নমত পোষণ করলেও শেষ পর্যন্ত আলীর কথা সবাই সমর্থন করলো।

আলী ও তার সাথীরা রুশ বাহিনীকে ফেলে মাত্র উপত্যকার নিম্নভূমি অতিক্রম করেছে, তখন রুশ জঙ্গীবিমান এসে বোম্বিং শুরু করলো। তাড়াতাড়ি মুজাহিদরা আড়ালে চলে গেলো। ওদিকে রুশ জঙ্গীবিমান হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকা রুশ

সৈন্যদেরকে মুজাহিদ মনে করে এদের উপর উপর্যপুরি বোমা নিক্ষেপ করে সবগুলোকে ভস্ম করে দেয়। বোমারু বিমান বোম্বিং করে চলে যাওয়ার পর আলী দু'জন মুজাহিদকে পাঠালো রুশ বন্দীদের পরিণতি দেখতে।

কিছুক্ষণ পর মুজাহিদ এসে জানালো যে, সকল রুশবন্দী নিহত হয়েছে, এদের মৃত দেহ সমস্ত উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আলী বললো, আল্লাহর বিচার খুব সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। হয়তো আমরা এদেরকে এতো কঠিন শাস্তি দিতে পারতাম না, যতটুকু কঠিন শাস্তি ওরা নিজ দলের পক্ষ থেকে পেয়েছে। ওদের এই শাস্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর হবে দোযখের শাস্তি। সেখানে ওরা ফেরেশতাকেও দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে তখন আল্লাহ কতো শক্তিশালী।

মুজাহিদরা অকল্পনীয়ভাবে আল্লাহর সাহায্যে বেঁচে যাওয়া ও বিজয় বরণে আবারো আল্লাহর দরবারে সবাই সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। অপ্রত্যাশিত এই বিজয় মুজাহিদদের প্রেরণা ও শাহাদাতের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে তুললো।

আটদিন আগে আলী এই ছোট্ট মুজাহিদ দলটি নিয়ে বেরিয়েছিলো। মারকাজে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় তারা ঘন পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হলো। এলাকাটি মুজাহিদদের দখলে ছিলো। নির্ভয়ে তারা পথ চলছিলো। পাহাড়ের আড়ালে অবস্থিত মুজাহিদক্যাম্প থেকে আওয়াজ এলো, দাঁড়াও!

আলী ও সাথী মুজাহিদরা উঁকি দিয়ে দেখলো, দু'জন লোক ঝোপের আড়াল থেকে তাদের ডাকছে, সাথীসহ আলী থেমে গেলো।

দু'জন লোক এসে আলীকে বললো, আমাদের কমান্ডার আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

আগন্তুক দু'জন যে মুজাহিদ সদস্য সে কথা নিশ্চিত হওয়ার পর আলী সবাইকে নিয়ে তাদের অনুসরণ করলো।

একটা ছোট্ট ক্যাম্পে ২০/২২ জন মুজাহিদ নিজেদের চাদর বিছিয়ে কেউ শুয়ে কেউ বিশ্রাম করছিলো। আলী ও তার সাথীদের দেখে তারা উঠে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালো। উভয় দলের মুজাহিদরা কোলাকুলি করে পরস্পরে পরিচিত হলো।

এখানে গ্রুপ কমান্ডার মাহমুদ খান আলীকে জানালো যে, সামনের রাস্তা বন্ধ। এ পথটির পাহারায় যে মুজাহিদক্যাম্প ছিলো গতকাল সেটি শত্রু বাহিনীর দখলে চলে গেছে। আলী বললো, হঠাৎ করে এ ক্যাম্পটি শত্রুবাহিনীর দখলে চলে গেলো কি করে? তিন দিন আগেও তো এ পথে মুজাহিদরা নিরাপদে চলাফেরা করেছে।'

মাহমুদ বিস্তারিত ঘটনা বললো। তিন দিন আগে ক্যাম্পটি আমাদের দখলেই ছিলো। তিন দিন আগে যে দলটি এ পথ অতিক্রম করে চলে গেছে বলে আপনি বলছেন, তারা আমাদের ক্যাম্পেই সকালের নাস্তা করেছিলো। চলে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা

পর আসরের নামাযের সময় শত্রুবাহিনীর এক ঝাঁক জঙ্গীবিমান এসে বোমা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এ পাহাড়ের নীচের চেকপোস্টে কমান্ডারসহ পচিশজন মুজাহিদ ছিলো। পাহাড়ের উপরের ক্যাম্পে ছিলো পঞ্চাশ জন, মারকাজে ছিলো শতেক মুজাহিদ।

শত্রু বাহিনী অনেক উপর থেকে শিলাবৃষ্টির মতো পাহাড়ের উপর বোমা নিক্ষেপ করছিলো। আমাদের হাতে ছিলো একটি মাত্র বিমান-বিধ্বংসী কামান। এদিয়ে আমরা একটি বিমান ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। জঙ্গী বিমান চলে যাওয়ার পর এলো জঙ্গী হেলিকপ্টার। ওগুলো খুব নীচ দিয়ে উড়ে যেতো আর সন্দিগ্ধ স্থানে গোলা ও বোমাবর্ষণ করত। তদুপরী ঘন্টাখানেক সময়ের মধ্যে আমরা রকেট ছুড়ে শত্রু বাহিনীর তিনটি হেলিকপ্টার ধ্বংস করে দেই। কিন্তু প্রচন্ড বোমা ও কামানের গোলায় আমাদের বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ ও পাঁচজন আহত হয়। আহতদের আমরা মারকাজে নিয়ে আসি। দুশমনদের গ্যাসবোমায় আমাদের অধিকাংশ মুজাহিদ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তাড়াতাড়ি কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে পরামর্শ চাইলাম। তিনি পিছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারের সুযোগে আমরা পিছনে সরে আসলাম। পাহাড়চূড়া থেকে মাত্র মাঝামাঝি নীচে নেমেছি। তখন প্রায় ডজনখানেক হেলিকপ্টার এলো। ওরা কোন বোম্বিং করল না। বুঝতে পারলাম, ছত্রী সেনা নামিয়েছে। আমরা এখানে মাত্র পঁচিশজন জীবন নিয়ে আসতে পেরেছি। বাকী সবাই শহীদ হয়েছে। এর ওপর গত দুই দিন যাবৎ সম্পূর্ণ অনাহার। খাদ্যদ্রব্য কিছুই নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। এখান থেকে বেরুনোর পথও পাচ্ছি না। কেন্দ্র থেকে আমাদের সাহায্যে রসদ, লোক পাঠানোর কথা কিন্তু তারাও এখনও এসে পৌঁছেনি।

কমান্ডার মাহমুদের কথা শেষ হলে আলী জিজ্ঞেস করলো, কমান্ডার শেরদিল খান ও সাথীদের অবস্থা কি?

কিছুই জানি না। মাহমুদ জবাব দিল।

আলী কমান্ডার মাহমুদ খানকে বললো, আগে আমরা আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি, পরে বাকী কথা বলবো।

আলীর মুজাহিদ গ্রুপের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পানীয় ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই খানা তৈরী করে আহার পর্ব শেষ করলো।

আলী মাহমুদ খানকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা মাহমুদ ভাই! পাহাড়ের ওদিকটায় মুজাহিদক্যাম্পে কোন্ ধরনের অস্ত্র ও গোলা বারুদ ছিলো।

মাহমুদ বললো, কমান্ডার শেরদিল খানসহ পচিশজন মুজাহিদ ছিলো সেখানে। পাহাড়ে দুটি ব্যাংকার এবং একটি তাবু ছিলো। ক্লাসিনকভ ছাড়া একটি মর্টার তোপ আর একটি রকেটলাঞ্চার ছিলো।

আলী জিজ্ঞেস করলো, কতক্ষণে হেড কোয়ার্টার থেকে সাহায্যকারী দল পৌঁছাতে পারে বলে মনে করেন?

মাহমুদ বললো, এতক্ষণে এসে পড়ার কথা, কিন্তু এখনও পৌঁছলো না কেন বুঝতে পারছি না।

আলী অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললো, আপনাদের এখানে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা ঠিক নয়, শত্রু সেনাদের কব্জা থেকে হৃত ঘাঁটি উদ্ধার করা দরকার। হতে পারে যে, হেড কোয়ার্টারে এখানে পাঠানোর মত মুজাহিদ নেই। আপনি জবাবী হামলা করতে বিলম্ব করলে শত্রুবাহিনী পাহাড়ে মজবুত ঘাঁটি ও ব্যাংকার তৈরী করতে সক্ষম হবে। একবার শত্রুবাহিনী আসন গেড়ে বসতে পারলে ঘাঁটি উদ্ধার করা কঠিন হবে। সন্ধ্যায় হয়তো হেড কোয়ার্টার থেকে সাহায্য পৌঁছে যেতে পারে। ততক্ষণে আপনার হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা উচিত। আমার সকল সাথী আপনাদের সাথে থাকবে।

সকল মুজাহিদ আলোচনা ক্রমে হৃতক্যাম্প পুনরুদ্ধারে আলীকে কমান্ডার নিযুক্ত করলো। আলী আব্দুর রহমান, মাহমুদ খান ও দু'জন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে শত্রু বাহিনীর অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লো। তারা ক্রোলিং করে গাছের আড়াল থেকে আবার কখনও গাছে চড়ে শত্রু বাহিনীর অবস্থান যথাসম্ভব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে এলো।

দূরবীণ দিয়ে দেখ গেলো, পাহাড়ের ওপর শত্রু বাহিনী পাঁচটি চেকপোস্ট মোতায়েন করেছে। আলী তার দেখা পয়েন্ট ও সেনা অবস্থানের নক্সা তৈরী করলো এবং মাহমুদের সাথে কথা বলে স্থানগুলো সম্পর্কে পরামর্শ করে নিলো, কারণ মাহমুদ এ এলাকা সম্পর্কে বেশী অবগত।

পাহাড়ের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা নেয়ার পর আলী পাহাড়ের বিপরীত দিকের অবস্থা জানার জন্য সাথীদের নিয়ে অগ্রসর হলো। অনেক কষ্ট করে শত্রু সেনাদের টহল এড়িয়ে তারা পাহাড়ের বিপরীত দিকটি পরিস্কার দেখা যায় এমন স্থানে পৌঁছলো।

এখান থেকে পাহাড়ের বিপরীত এলাকা, দিক ও পরিস্থিতি অবলোকন করা যায়। আলী দেখলো, পাহাড়ের ঢালুতে বেশ কয়েকটি শত্রু ছাউনী রয়েছে। অসংখ্য ট্যাংক ও সাজোয়া যানে ভর্তি নিম্নাঞ্চল। তার মানে হলো, শেরদিল খান হয়তো শহীদ হয়েছে না হয় বন্দী হয়েছে। আলী মাহমুদ খানের সহায়তায় এই এলাকাটির একটি মোটামুটি চিত্র এঁকে ক্যাম্পে নিয়ে এলো।

ক্যাম্পে বসে আবদুর রহমান ও মাহমুদ খানকে সাথে নিয়ে আলী হারানো মুজাহিদ ক্যাম্প উদ্ধার করার প্লান করার জন্য তার পর্যবেক্ষণ নক্সাটি মেলে ধরলো।

নক্সাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আলী আব্দুর রহমান ও মাহমুদ খানকে বললো, হেড কোয়ার্টার থেকে সহযোগিতা পেলে আমাদের পুনরুদ্ধার কাজ খুবই সহজ হবে। তবে যদি কোন অসুবিধার জন্যে হেড অফিস আমাদের সহাযোগিতা করতে না পারে

তবুও আজকেই আমাদের অপারেশন চালাতে হবে। কারণ, শত্রু বাহিনী তাদের ব্যাংকার ও ছাউনী তৈরীতে ব্যস্ত। শত্রু বাহিনী নিজেদের অবস্থান মজবুত করার আগেই ওদের স্বপ্ন-সাধ গুড়িয়ে দিতে হবে। ওদের অবস্থান দৃঢ় হলে আমাদের অপারেশন হবে আরো বেশী কষ্টকর। ওদের লোকবল দু'শর চেয়ে বেশী হবে না। যদিও আমরা ওদের তুলনায় সংখ্যায় খুবই কম, তবুও আমার ধারণা, আমরাই বিজয়ী হব।

মাহমুদ খান আলীর চিন্তার সাথে একমত হতে পারছিলো না। তার ধারণা, অপারেশন চালানোর জন্যে কমপক্ষে দু'শ মুজাহিদের দরকার, অথচ তাদের মোট মুজাহিদ সংখ্যা মাত্র একত্রিশ।

মাহমুদ বললো, হেড কোয়ার্টার থেকে সাহায্যকারী দল এসে পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

আলী ও আব্দুর রহমানের যুক্তিনির্ভর পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত মাহমুদ খান মেনে নিলো।

মাহমুদ খানকে আলী বললো, সন্ধ্যার আগেই আমাদের কাছে যতো টায়ার, পুরনো কাপড় এবং জ্বালানী তৈল আছে সব এক জায়গায় জমা করে রাখা দরকার।

সহযোগী মুজাহিদরা আলীর নির্দেশ মতো টায়ার, পুরনো কাপড় ও জ্বালানী তৈল এক জায়গায় জমা করে রেখে দিলো।

আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো, এশার নামায যথাসময়ে আদায় করে সাথে সাথে যেন সকল মুজাহিদ ঘুমিয়ে যায়। রাতের শেষ প্রহরে হামলা শুরু করা হবে। তখন অধিকাংশ শত্রুসেনা ঘুমিয়ে পড়বে। আমরা যদি পাহারাদারদের কাবু করতে পারি, তবে অপারেশনে সহজেই সফল হতে পারব।

সকল মুজাহিদ শুয়ে পড়লো। আলী, আব্দুর রহমান এবং মাহমুদ খান তখনও জেগে জেগে হামলা পরবর্তী সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করছে।

আলী বললো, আমরা যদি টহলদার সৈন্যদের থেকে দু'চারজনকে অপহরণ করতে পারি তাহলে এদের কাছ থেকে আজ রাত ও আগামী রাতের শত্রু বাহিনীর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা জেনে নিতে পারব। কারণ, শত্রু সেনাদের রাত্রিকালীন সময়ে একটি নির্দিষ্ট সংকেত থাকে, যাদ্বারা সহজেই তারা নিজেদের এলাকায় কোন অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্ত করে ফেলে। প্রতি রাতেই তাদের পাহারাদার পরিবর্তন হয়ে থাকে।

কোন পাহারাদারকে অপহরণ করে দিয়ে আসা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়, তবে সে পর্যন্ত যাওয়ার পূর্বেই তো শত্রু বাহিনী আমাদের আক্রমণ আঁচ করে ফেলতে পারে, মাহমুদ বললো।

আলী মাহমুদ খানের যুক্তি খন্ডন করে বললো, কয়েকজন মুজাহিদ আমাদের মূল আক্রমণ শুরুর আগেই দু'একজন পাহারাদারকে তুলে নিয়ে আসতে পারে।

মাহমুদ বললো, হ্যাঁ, এ ব্যাপারটিকে ভেবে দেখা যেতে পারে। রাতের শেষ প্রহরে পাহারাদাররাও একটু ঝিমিয়ে পড়ে। আমার মতে উত্তর দিকের পাহারাদারকেই অপহরণ করার চেষ্টা করা উচিত, এদিকটাই আমাদের সব চেয়ে কাছে। এর খুব কাছে কোন সেনাচৌকিও নেই, ওদের দ্রুত সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও কম।

সম্ভাব্য সকল বিষয়ের উপর সমন্বিত সিদ্ধান্ত শেষে আলী, আব্দুর রহমান ও মাহমুদ খানও শুয়ে পড়লো। রাত তিনটায় উঠে সবাইকে জাগিয়ে দেয়া হলো। আলী সব মুজাহিদকে বললো, ওযু করে সকলে তাহাজ্জুদ পড়ে সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে মুনাজাত করো।

তাহাজ্জুদের পর আলী সকল মুজাহিদের উদ্দেশে বললো, 'বন্ধুগণ! একটু পরই আমরা শত্রু বাহিনীর কাছ থেকে আমাদের হৃতক্যাম্প পুনরুদ্ধারের জন্য আক্রমণ শুরু করব। আমাদের সকলেরই একথা জানা আছে যে, শত্রু বাহিনী আমাদের থেকে অস্ত্রও জনবলে বলীয়ান। তবে আল্লাহ অধিকাংশ সময় ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনীর হাতে জনবলে শক্তিশালী বৃহত্তর অমুসলিম বাহনীকে পরাস্ত করেছেন। মূলতঃ বিজয় ও সফলতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেন, "বিজয় সম্পূর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়; যে আল্লাহ বিজয়ী ও বিচক্ষণ।"

তিনি আরো বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যদি তোমাদের বিজয়ী করেন, তবে কেউ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আর আল্লাহ যদি তোমাদের বিপর্যস্ত করেন তবে কোন শক্তিই তোমাদের পতন ঠেকাতে সক্ষম হবে না।"

আল্লাহ আরো ঘোষণা করেছেনঃ "চিন্তা করো না, হাতাশ হয়োনা। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকার মু'মিন হও।"

'বন্ধুগণ! আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এই জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি আশা করি, আমাদের কোন সাথীর মধ্যে বিন্দু পরিমাণও শত্রু-সম্পদের লোভে যুদ্ধ করার ইচ্ছে নেই। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আমাদের পূর্বসূরী মুজাহিদদের মতো মদদ করবেন। তবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো দৃঢ়ভাবে শত্রুর মোকাবেলা করা।' বক্তব্য দেয়ার পর আলী দু'হাত তুলে দু'য়া করলোঃ

'হে প্রভু! তুমি মুজাহিদদেরকে এই অপারেশনে বিজয়ী করো। তুমি মুজাহিদদের মনোবল মজবুত করো এবং শত্রু বাহিনীর কূটচাল বুমেরাং করে তাদের বিরুদ্ধেই তা কার্যকর করে দাও। ওদের লজ্জিত ও অপদস্ত করো। আয় আল্লাহ! তুমি জানো, তুমি ছাড়া আমাদের কোন সাহায্যকারী নেই, তুমি তোমার দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো।'

দু'আ শেষে আলী মুজাহিদদেরকে ছয় গ্রুপে ভাগ করলো। প্রথম দলের দশজন মুজাহিদকে দায়িত্ব দেয়া হলো, তারা পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পজিশন নেবে। এবং সংকেত পাওয়া মাত্রই জ্বালানী তৈলমাখা কাপড় জড়ানো টায়ারগুলোতে আগুন ধরিয়ে শত্রু ছাউনীতে নিক্ষেপ করবে।

অবশিষ্ট মুজাহিদদেরকে চারজন করে এক একটি গ্রুপে ভাগ করে তাদের সামনে শত্রুঘাঁটির নকশাটি মেলে ধরে শত্রু সেনাদের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়ে বললো, তোমরা প্রত্যেক দলে দু'জন ডান দিকে আর দু'জন বাম দিকে ফায়ার করবে। তা হলে প্রত্যেক চৌকিতে দু'দিক থেকে হামলা হবে এবং প্রত্যেকটি গ্রুপ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এবং দু'জনের প্রতিটি গ্রুপ দু'দিন থেকে মিলে আবর চার গ্রুপে পরিণত হবে। এর দ্বারা শত্রু বাহিনী আমাদের প্রকৃত জনবলের আন্দাজ করতে ব্যর্থ হবে। সংখ্যায় কম হলেও শত্রুপক্ষ আমাদেরকে বিরাট বাহিনী মনে করবে।'

আলীর দিক নির্দেশনা শেষে প্রত্যেক মুজাহিদ দল নিজ নিজ হাতিয়ার সামীগ্রী নিয়ে ইঙ্গিত লক্ষ্যের দিকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো।

পাহাড়ের ঢালে গিয়ে আলী সকল মুজাহিদকে অপেক্ষা করতে বলে মাহমুদ খানের দলকে অগ্রগামী দল হিসেবে পাঠিয়ে দিলো কোন পাহারারত শত্রুসেনাকে অপহরণ করে নিয়ে আসতে। মাহমুদকে বলে দিলো, তোমরা যদি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হও, তাহলে পাহাড়ী (এক প্রকার নির্দিষ্ট) পাখীর স্বরে আমাদের সংকেত দেবে। তখনই আমরা হামলা শুরু করে দেব।

মাহমুদ খান নিজ দল নিয়ে চলে গেলো। আলী অবশিষ্ট মুজাহিদদের অবস্থান ও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আবারো বুঝিয়ে দিলো।

প্রায় ঘন্টাখানিক পর মাহমুদ খান ও তার সাথীরা ফিরে এসে বল্লো, আমরা আমাদের ইঙ্গিত উদ্দেশ্যে সফল হয়েছি। আমরা এক পাহারাদারকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে এসে ওর কাছ থেকে যাবতীয় তথ্য জেনে নিয়েছি। পাহরাদার বলেছে, পাহাড়ের উপর শত্রু বাহিনীর সংখ্যা একশ'র বেশী হবে না। পাহাড়ের বিপরীত দিকেও শত্রু সংখ্যা ষাটের উপরে নয়। পাহাড়ের উপরে আফগানী সেনা ও নীচের বিপরীত দিকে রুশ সেনারা অবস্থান নিয়েছে।

পাহারাদার আজ রাতের সংকেত সম্পর্কে জানিয়েছে যে, টহলরত সৈন্যরা অন্য কাউকে দেখলে 'দ্রেশ' বলবে। এর অর্থ হলো 'থামো'। এর পর পাহারাদার ঐ সৈন্যকে জিজ্ঞেস করলে সংকেতে সৈন্য বলবে 'মুরস্'। টহলদারকে সংকেতের জবাবে ঐ সৈনিক জিজ্ঞেস করবে আজকের জবাবী সংকেত। টহলদার বলবে, 'ক্লাসিনকভ'। পাহারাদার আরো জানিয়েছে, শেরদিল খান শত্রু বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করে শহীদ হয়েছেন। আর জীবিতদেরকে সেনাবাহিনী বন্দী করে নিয়ে গেছে। শহীদ ও জীবিতের সংখ্যা সম্পর্কে টহলরত ঐ সেনা অজ্ঞাত বলে জানিয়েছে। তবে সে বলেছে, মুজাহিদদের হাতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রুশ সেনা নিহত হয়েছে।

আলী সকল মুজাহিদকে বললো, 'আজ রাতের সংকেত ও জবাবী সংকেত ভালো করে মুখস্ত করো। ক্লাসিনকভ কখনও নীচে রাখবে না। কারণ, যদি টহলদার সেনার দেয়া তথ্য ভুল প্রমাণিত হয় তবে যেন তোমার হাতিয়ার ব্যবহারে এক মুহূর্তও দেরী না

হয়। তোমরা প্রথমে পাহারাদারকে চাকু দিয়ে এ ভাবে আঘাত করবে যাতে কেউ চীৎকার দেয়ার আগেই সে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং ছটফট করার সুযোগও যেন না পায়।

সেনা ছাউনীতে প্রবেশ করে আগে গোলাবারুদ কব্জা করবে এবং ঘুমন্ত শত্রুদের জীবন লীলা সাঙ্গ করে দেবে। পূর্ব পরিকল্পনা মতো দু'দিক থেকে গুলী করার আর প্রয়োজন নেই। তবে সতর্ক থেকো, যদি পাহারাদারের দেয়া তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবেও আমাদের অপারেশন এত দ্রুত চালাতে হবে যে, শত্রু বাহিনী মৃত্যু মুখে পৌঁছার আগে আমাদের বিরুদ্ধে যেন কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নিতে পারে।

টায়ারধারী মুজাহিদদেরকে আলী বললো, আমি যখন শিস দেব তখন তোমরা টায়ারে অগ্নি সংযোগ করে পাহাড়ের উপর থেকে নীচের সেনা ছাউনীতে নিক্ষেপ করবে।

আলীর পুনঃ দিক নির্দেশনার পর মুজাহিদরা নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেল। অপহরণকৃত টহলদার শত্রুসেনার বর্ণিত তথ্য সত্য ছিলো। যার ফলে টহলরত শত্রু সেনাদের কাবু করতে মুজাহিদদের কোন বেগ পেতে হয়নি। টহলদার শত্রু সেনাদের খতম করে মুজাহিদরা এতো তীব্র বেগে শত্রু ছাইনীতে ঢুকে গেলো যে, শত্রু বাহিনী মোকাবেলায় দাঁড়ান তো দূরে থাক ঘুমন্ত অবস্থায়ই অধিকাংশ শত্রু সেনা মুজাহিদদের গুলীতে চিরতরে ঠান্ডা হয়ে গেলো।

ঘন্টাখানিক সময়ের মধ্যে সকল চৌকিতে মুজাহিদদের দখল প্রতিষ্ঠিত হলো এবং বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ তাদের হস্তগত হলো।

আলী সিটি বাজিয়ে টায়ারধাধী মুজাহিদদের পাহাড়ের টিলার উপর জড়ো করে বললো, তোমরা খুব সতর্ক থাকবে, বিপরীত দিক থেকে শত্রু বাহিনীর কোন জবাবী হামলা হতে পারে। নীচের রুশ সেনাছাউনীর দিক থেকে হামলা হওয়ার বেশী আশংকা ছিলো, কিন্তু তখনও ওদিক থেকে কোন হামলার আভাস পাওয়া গেলো না। আলী অত্যন্ত বিচলিতভাবে বার বার নীচের দিকে পর্যবেক্ষণ করছিলো এই ভেবে যে, ওরা গুলীর আওয়াজ শুনেনি এমনটাতো হতে পারে না।

টায়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুজাহিদদেরকে অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দিয়ে আলী চিন্তায় পড়ে গেলো। পাহাড়ের ঢালে যে পরিমাণ ঝোপঝাড় তা গড়িয়ে টায়ার নীচ পর্যন্ত পৌঁছা প্রায় অসম্ভব। আলী কায়মনোবাক্যে আর একবার দু'আ করলো, 'হে আল্লাহ! তুমি জানো, আমাদের সৈন্য ও অস্ত্রবল খুবই কম। শত্রু সেনাদের জনবল ও অস্ত্রের তুলনায় আমরা খুবই দুর্বল। তবে তুমি সাহায্য করলে আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। বিগত দিনের মতো আজো তুমি আমাদের নিক্ষিপ্ত টায়ার দ্বারা শত্রু বাহিনীর কনভয় ও গোলাবারুদ ধ্বংস করে দাও।'

দু'আ শেষে আলী ও সাথী মুজাহিদরা জ্বলন্ত টায়ারগুলো নীচের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিছু টায়ার মাঝ পথে ঝোপঝাড়ে আটকে গেলেও অধিকাংশ নীচের শত্রু

ছাউনী ও কনভয় পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্য শত্রু ছাউনী ও কনভয়গুলো লেলিহান আগুনের দখলে চলে গেলো। পরক্ষণে শোনা গেলো শুধু অগ্নিদগ্ধ শত্রু সেনাদের আর্তচিৎকার। নীচের শত্রু ছাউনীগুলোতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

এদিকে পাহাড়ের চূড়ায় এক বিজয়ী মুজাহিদের কণ্ঠে ধ্বনীত হলো ফজরের আযান।

আল্লাহর অপার সাহায্যে কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনীর চেষ্টায় হৃতক্যাম্প তাদের দখলে আসলো।

নামায শেষে সকল মুজাহিদ আল্লাহর দরবারে শুকরিয়ার সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। করুণাময়ের কাছে জানালো বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। শত্রু ছাউনী থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া গেলো। আলী দ্রুত নাস্তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে কিছু মুজাহিদকে কয়েক গ্রুপে বিভক্ত করে পাহারায় নিয়োজিত করলো। বললো, আমরা নাস্তা সেরেই এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবো।

সূর্য তখন অনেকটা উপরে উঠে গেছে। আলী সকল মুজাহিদকে ডেকে নীচে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলেন, এমন সময় শত্রু বাহিনীর বোমারুবিমান এসে এলোপাথারী বোমাবর্ষণ শুরু করলো।

মাহমুদ খান আলীকে বললো, কয়েক গজ দূরেই একটি গর্ত আছে, বোমার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সেখানে আশ্রয় নেয়া উচিৎ। মুজাহিদরা দ্রুত পাথরের আড়ালে আড়ালে ক্রোলিং করে সেখানে পৌঁছলো। বোমার আঘাতে ইতিমধ্যে দু'জন মুজাহিদ আহত হয়েছে।

রুশ বোমারুবিমান বিক্ষিপ্তভাবে বোমাবর্ষণ করে চলে গেছে। আলী মুজাহিদদের বললো, শত্রু সেনাদের লাশগুলো খোলা স্থানে রেখে দাও, মুজাহিদ মনে করে রুশ জঙ্গী বিমান এদের উপর বোমা বর্ষণ করবে।

মুজাহিদরা দ্রুত আলীর নির্দেশ পালন করলো। কিছুক্ষণ পরে আবার রুশ জঙ্গীবিমান থেকে বোমাবষর্ণ শুরু হলো। বিমানের পাশা পাশি কয়েকটি রুশ হেলিকপ্টার খুব নীচ দিয়ে চক্কর লাগাতে লাগলো এবং স্থানে স্থানে মর্টার সেল নিক্ষেপ করছিলো। একজন মুজাহিদ রকেটলাঞ্চার দিয়ে আঘাত হানলে তৎক্ষনাৎ একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়।

এক পর্যায়ে মুজাহিদদের উপর হেলিকপ্টার থেকে শুরু হলো গ্যাস বোমাবর্ষণ। বেশ কয়েকটি গ্যাস বোমা পরিখার সামনে ফাটলে গ্যাস পরিখার প্রবেশ করে। গ্যাসের ক্রিয়ায় কয়েকজন মুজাহিদ কাতরাতে লাগলো।

আব্দুর রহমান তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে মুখ মাটির সাথে মিশিয়ে রেখে মুজাহিদদের বললো, 'গ্যাসের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচতে হলে তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে মুখ মাটির সাথে মিশিয়ে রাখো। অন্যথায় আমাদের সবাইকে গ্যাসের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হবে।'

ততোক্ষণে দু' মুজাহিদ গ্যাসের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। যে বৃদ্ধ মুজাহিদ আলীর সান্নিধ্যে পেয়েছিলো জীবনে স্বস্তির সন্ধান সেও বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে শহীদ হলেন।

আলী ক্রোলিং করে আব্দুর রহমানের কাছে পৌঁছে বললো, আমাদের পরিখার প্রবেশ দ্বারে থাকা দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে, শত্রুবাহিনী কোন ছত্রীসেনা অবতরণ করায় কিনা। এমন হওয়া অমূলক নয় যে, কোন শত্রুসেনা পরিখার মুখে এসে সঙ্গিন উঁচিয়ে আমাদের সবাইকে আটকে ফেলবে। আমাদের আত্মরক্ষারও কোন পথ থাকবে না।

আব্দুর রহমান আলীর কথায় একমত হলো। আলী, আব্দুর রহমান ও আরো চারজন মুজাহিদ হামাগুলী দিয়ে পরিখার প্রবেশ দ্বারে পৌঁছুলো।

আলীর আশংকা সত্যে পরিণত হলো। গর্ত থেকে মুখ উঁচু করে দেখতে পেলো, হেলিকপ্টার থেকে শত্রুবাহিনীর ছত্রীসেনা অবতরণ করছে।

আলী ছত্রীসেনা অবতরণের কথা সাথীদের জানালো।

আব্দুর রহমান বললো, কমান্ডোদের নামতে দাও। যেই তারা পরিখার দিকে আসার চেষ্টা করবে অমনি আমরা এক সাথে ফায়ার করব। দুশমনের ধারণা বিষাক্ত গ্যাস বোমায় আমরা সকলে নিহত হয়েছি।

মাহমুদ খান বললো, বিগত হামলায়ও এভাবে শত্রুবাহিনী গ্যাস বোমা নিক্ষেপ করায় আমাদের অধিকাংশ সাথী অজ্ঞতাবশত মৃত্যুবরণ করে। তীব্র বিপরীত বাতাসের কারণে আমরা কয়েকজন যা-ও বেঁচে গিয়েছিলাম, তদুপরি আমাদেরকেও গ্যাস খুব যন্ত্রণা দিয়েছিল।

আব্দুর রহমান বললো, এ গ্যাস মাটি থেকে দু'ফিট উপরে ক্রিয়া করে। মাটির সাথে মুখ লাগিয়ে শুয়ে থাকলে এ গ্যাস মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে না। অন্যথা মুহূর্তের মধ্যে মানুষ গ্যাসের তীব্র বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আলী দুরবীন দিয়ে কমান্ডো অবতরণের দৃশ্য অবলোকন করছিলো। দেখলো, ষোলজন কমান্ডো হেলমেট ও গ্যাসমাস্ক পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করে সোজা এই গর্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

গর্তের কাছাকাছি পৌঁছলে কয়েকজন মুজাহিদের ক্লাসিনকভ অতর্কিতে গর্জে ওঠে। রুশ কমান্ডোদের অধির্কাংশ নিহত হলো আর বাকীরা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।

আলী আব্দুর রহমানের কাছে দূরবীন দিয়ে বললো, মুজাহিদ ও আহত কমান্ডোদের প্রতি খেয়াল রোখো, আমি দু'জনকে নিয়ে ওদের কাছে যাচ্ছি। যদি আহত কোন কমান্ডো আমাদের প্রতি গুলী করতে চায় এর আগেই তুমি ফায়ার করে ঠান্ডা করে দেবে।

আলী, মাহমুদ খান ও অন্য এক মুজাহিদ সাথী মাটির সাথে মুখ লাগিয়ে ক্রোলিং করে নিহত রুশ কমান্ডোদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো এবং একটু অগ্রসর হয়ে মাঝে

মাঝে মাথা উঁচু করে দেখে নিচ্ছে কতটুকু পথ তারা সামনে এসেছে। নিহত রুশ কমান্ডোদের কাছে পৌঁছে শুয়ে শুয়েই মৃত এক রুশ কমান্ডোর পরিধেয় গ্যাসমাস্ক হেলমেট খুলে তা নিজে পরে দাঁড়িয়ে গেলো। সাথীরাও তার অনুসরণ করলো। দ্রুত তারা সব কয়টি গ্যাসমাস্ক খুলে নিয়ে চলে এলো। গ্যাসমাস্ক খুলে নেয়ার কারণে আহত রুশ কমান্ডোরা অল্পক্ষণের মধ্যে মারা গেলো।

বারোটি গ্যাসমাস্ক সহজেই মুজাহিদদের হস্তগত হলে গ্যাস হামলা থেকে মুজাহিদদের আত্মরক্ষার কিছুটা ব্যবস্থা হলো। আলী এগারোজন মুজাহিদকে গ্যাসমাস্ক পরিয়ে বাকীদের গর্তে মাটির সাথে নাক লাগিয়ে শুয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। দু'জন করে ছয়টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকলো।

আলী ও তার সহযোদ্ধারা তখনও ঠিক মতো পজিশন নিয়ে স্থির হতে পারেনি, ততক্ষণে রুশ বাহিনীর চারটি হেলিকপ্টার কমান্ডো নামাতে শুরু করেছে। মুজাহিদরা দু'দিক থেকে রুশ হেলিকপ্টারের উপর রকেটলাঞ্চার ও কমান্ডোদের উপর ক্লাসিনকভের অগ্নি বর্ষণ করতে শুরু করলো। দু' হেলিকপ্টার ভূপাতিত হলো, দু'টি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। কমান্ডোদের অধিকাংশ নিহত হলো, কিছু আহত হলো, বাকিরা অস্ত্র ফেলে হাত উঁচু করে সারেন্ডার করলো।

আলী পাঁচজন মুজাহিদকে নিয়ে নিহত শত্রুসেনাদের গ্যাসমাস্ক ও হেলমেট খুলে নিলো। বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আলী হেলমেট ও গ্যাস মাস্কগুলো দ্রুত গিরিগুহায় অবস্থানকারী মুজাহিদদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। গ্যাসমাস্ক ও হেলমেট মুজাহিদদের গুহায় পৌঁছা মাত্র এ গুলো পরে তারা বাইরে বেরিয়ে এসে অন্যান্য মৃত রুশ সৈন্যদের মুখ থেকে গ্যাস মাস্ক সংগ্রহে দ্রুত লেগে গেলো।

জীবিত রুশ কমান্ডোরা দু'হাত জোর করে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছিলো। আলী ধমক দিয়ে বললো, 'তোমাদের ছেড়ে দেয়া পাগলা কুকুরদের ছেড়ে দেয়ার নামান্তর। তোমাদের মতো নিচু, কাপুরুষ কখনো সৈনিক হওয়ার উপযুক্ত নয়। মুজাহিদদের তোমরা নির্মম-নৃশংস ভাবে হত্যা করে সাফল্যের উন্মাদনায় উল্লাস প্রকাশ কর পৈচাশিক হাসি হেসে। এ বিষাক্ত গ্যাসবোমা তোমাদেরই নিক্ষিপ্ত। এর যাতনা তোমাদেরই ভোগ করতে হবে। সাথী মুজাহিদরা রুশ সেনাদের মুখ থেকে গ্যাসমাস্ক ও হেলমেট খুলে নিলে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়তে লাগল। আলী ওদের দাঁড় করিয়ে রাখার নির্দেশ দিলো। ওরা বুঝুক বিষাক্ত গ্যাস কত যন্ত্রণাদায়ক। কিভাবে মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয় দের নিক্ষেপিত এই গ্যাস।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সকল জীবিত রুশকমান্ডো রক্তবমি করে মরে গেলো। মুজাহিদরা এদের গা থেকে উর্দী, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ খুলে নিয়ে গিরিগুহায় রেখে দিলো।

আলী সাথী মুজাহিদদেরকে গিরিগুহা থেকে অনতি দূরে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে নিয়ে গেলো। মাটির সাথে শুয়ে একটা মাস্ক খুলে পরীক্ষা করে দেখলো যে, এখানে

গ্যাস নেই। সে হেলমেট ও গ্যাসমাস্ক খুলে ফেললো। তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য মুজাহিদরাও হেলমেট গ্যাসমাস্ক খুলে ফেলল।

আলী মুজাহিদদের বললো, আমার ধারণা, শত্রুবাহিনী দ্বিতীয়বার আর বেশী সংখ্যক কমান্ডো পাঠানোর মত ভুল করবে না। বড়জোর ওরা জঙ্গী বিমান থেকে বোম্বিং করবে। গ্যাস-মাস্ক দ্বারা আমাদের গ্যাসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। আমার মনে হয়, এখানে আমরা দশজন থেকে যাই, বাকিরা নীচে চলে যাওয়া ভালো হবে। যদি শত্রুবাহিনী কমান্ডো অবতরণ করে তাহলে তোমরা ক্লাসিনকভ চালিয়ে ওদের খতম করে দিবে, আর বাকীরা নীচে চলে যাবে।'

নীচে যাওয়ার জন্য আলী আঠারোজন মুজাহিদকে তিন ভাগে ভাগ করে দিয়ে বললো, ভিন্ন ভিন্ন পথে তোমরা নীচে নামবে, যাতে কোন গ্রুপ শত্রু বেষ্টনিতে পড়ে গেলে অন্যরা তাদের সাহায্য করতে পার।

মুজাহিদরা নীচে নেমেই দেখতে পেলো, নীচে রুশ বাহিনী হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলীর পরিকল্পনা এমন সূক্ষ্ণ ছিলো যে, রুশরা মুজাহিদদের প্রকৃত সংখ্যা কখনো বুঝতে সক্ষম হয়নি। মুজাহিদদের তিনটি গ্রুপ তিন দিক থেকেই সমানভাবে শত্রু সেনাদের ওপর গোলাবর্ষণ করছিলো। সম্মুখ মোকাবিলায় টিকতে না পেরে রুশবাহিনী পিছু হঠতে চাচ্ছিলো। আলী অন্য দু' গ্রুপের কাছে দ্রুত খবর পাঠালো, তোমরা শত্রুদের ওপর বেশী করে গোলা বর্ষণ কর, আমি ওদের পালানোর পথ রুদ্ধ করতে পাহাড়ের পেছনে চলে যাচ্ছি।

মুজাহিদরা ঝোপ-ঝাড় ও পাথরের আড়াল থেকে ক্রমশ শত্রু বাহিনীর উপর হামলা আরো তীব্র করলো। আলী ক্ষীপ্র গতিতে রুশ বাহিনীর পালানোর পথ আটকে ওঁৎপেতে ছিলো। শত্রু সেনারা সেখানে পৌঁছা মাত্র এক সাথে তাদের সবকটি ক্লাসিনকোভ গর্জে উঠলো। নিশ্চিদ্র বেষ্টনীতে পড়ে শত্রু সেনারা হাতিয়ার ফেলে স্যারেন্ডার করলো। আলী এদের দু'হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে মাহমুদ খান ও আব্দুর রহমানকে গোলা বর্ষণ বন্ধ করতে ইশারা করলো।

সব মুজাহিদ নীচে নেমে এলো। রুশদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা গেলো, ধৃত মুজাহিদদের নিয়ে শত্রু বাহিনীর একটি সাজোয়া যান পালিয়ে যাচ্ছে।

আলী মাহমুদ খানকে বললো, 'তুমি তোমার গ্রুপ নিয়ে দ্রুত চলে যাও। যেভাবেই হোক, শত্রুযান কব্জা করে গ্রেফতারকৃত মুজাহিদদের মুক্ত করো।

বন্দী আঠারজন রুশ সেনাকে আলী গিরিগুহার ভেতরে আটকে রেখে একজন সশস্ত্র মুজাহিদকে গুহামুখে দাঁড় করিয়ে রেখে মুজাহিদদের নিয়ে অন্য একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করলো। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে যখন নিশ্চিত হলো, গুহাভ্যন্তরে কোন বিস্ফোরক নেই, তখন সাথীদের নিয়ে পরামর্শে বসলো।

আলী তখনও সাথীদের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনায় মগ্ন, এমন সময় মাহমুদ খান গ্রেফতারকৃত মুজাহিদদের মুক্ত করে নিয়ে এলো। মাহমুদ জানালো, রুশরা

পালিয়ে গেছে, আমরা ওদের বন্দী করতে পারিনি। কমান্ডার শেরদিল খান ছিলেন আহত। শেরদিল খান ছাড়াও আরো পাঁচজন মুজাহিদ আহত হয়েছিলো। বাকী পনের জনকে রুশরা শহীদ করে দিয়েছিলো। আহত মুজাহিদদের জখমে দ্রুত ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হলো।

শেরদিল খান জানালো, শত্রু বাহিনী আকস্মিক আমাদের ওপর হামলা করায় আমরা ওদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হইনি। মাহমুদ খান পশ্চাৎপদ হওয়ার পর আমরাও পিছু হটে আসার চিন্তা করছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে চতুর্দিক থেকে আমরা শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়ি। একদিক থেকে কমান্ডো বাহিনী আর অন্য দিক থেকে ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান নিয়ে শত্রুরা আমাদের উপর হামলা করে। মুজাহিদরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করছিলো কিন্তু গোলা-বারুদ খুবই কম থাকায় পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি। আমরা শত্রুদের হাতে বন্দী হলাম।

আমাদের ধারণা ছিলো, মাহমুদ খান তড়িৎ পুনরুদ্ধার আক্রমণ করবে, কিন্তু দু'দিন চলে যাওয়ার পর সকলেই নিরাশ হয়ে পড়ে। আজ সকালে যখন গোলাগুলীর আওয়াজ শুনতে পাই, তখন মুক্তির আশায় প্রহর গুণতে থাকি। আপনারা যখন তিন দিক থেকে প্রচন্ড আক্রমণ পরিচালনা করছিলেন, তখন শত্রুরা আমাদেরকে ক্যাম্প থেকে বের করে নিয়ে যায়। আমাদের সৌভাগ্য যে, ওরা বেশী দূর না যেতেই মাহমুদ সাথীদের নিয়ে আমাদের উদ্ধারের জন্য হাজির হয়েছিলো।

রুশবাহিনী পাহাড়ের উপর তাদের সাথীদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না কেন। আলী শেরদিল খানের কাছে জানতে চাইলো।

শেরদিল খান বললো, একেতো পাহাড়ের ওপর বেশীর ভাগ ছিল আফগান বাহিনী, দ্বিতীয়ত, পাহাড়ের বিপরীতে গিয়ে মোকাবেলা করা ছিলো ওদের জন্য আত্মহত্যার নামান্তর। এ নাজুক অবস্থার কথা ওরা হেডকোয়ার্টারে ওয়ার্লেস করে জানিয়ে দিলে হেড কোয়ার্টার ওদের সাহায্যে হেলিকপ্টার ও ট্যাংকবাহিনী পাঠায়। তবে ওরা যদি মুজাহিদদের সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত জানতো, তাহলে হয়তো মোকাবেলা না করে পিছু হটতো না।

শেরদিল খান ও আলী পরস্পর কথা বলছে। এমন সময় এক মুজাহিদ এসে শেরদিল খানকে জানালো যে, এক রুশ সেনা মাওলানা আব্দুল ওদুদ খানের মাথায় ক্লাসিনকোভ ঠেকিয়ে তাকে জব্দ করে রেখেছে। আমরা ওকে বহু ভয়ভীতি ধমক দিলেও সে কোন মতেই অস্ত্র নামাতে রাজী হয়নি, সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়।'

শেরদিল খান আহত অবস্থায়ই খুড়িয়ে খুড়িয়ে বাইরে এলো। আলী ও মাহমুদ খানও সাথে সাথে বেরিয়ে এলো। আলী দেখলো, রুশ সেনাটি ভীষণ ক্ষুব্ধ। শেরদিল খানকে দেখেই সে মাওলানাকে এমন জোরে ধাক্কা দিল যে, ধকল সামলাতে না পেরে মাওলানা পড়ে গেলো। রুশসেনার আচরণে শেরদিল খান রাগত স্বরে বললো, 'ক্লাসিনকোভ ফেলে দাও।'

রুশসেনা ক্লাসিনকোভ ফেলে দিলো। সে মাওলানা ওয়াদুদকে ঘাড়ে ধরে শেরদিল খানের কাছে নিয়ে এসে কি যেন বললো। কিন্তু কেউই রুশীর কথার মর্ম উদ্ধার করতে পারলো না। মুজাহিদরা ওকে ধরে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো, কিন্তু কেউ ওর কথার অগ্র পশ্চাৎ কিছু বুঝলো না।

মাওলানা দাঁড়িয়ে শেরদিল খানকে বললেন, 'কমান্ডার সাহেব! ওকে জলদি গুলী করে হত্যা করুন, নয়তো এ দুশমন আমাকে ও আপনাকে হত্যা করবে। ও বলে, আমি রুশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়েছি, যার ফলে ওর সাথীরা নিহত হয়েছে। সে ইসলাম ও আল্লাহকেও জঘন্য ভাষায় গালি দেয়।'

রুশী হয়তো মাওলানার কথা বুঝে ফেলেছিলো, এজন্য সে এতো উত্তেজিত হয়ে মাওলানার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলছিলো যে, বোঝা যাচ্ছিলো প্রকৃতই সে মাওলানাকে হত্যা করতে উদ্যত। কিন্তু রুশ ভাষা উপস্থিত মুজাহিদদের মধ্যে কারো জানা ছিলো না বলে কারো পক্ষেই রুশসেনার ক্রোধের কারণ উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছিলো না।

মাওলানা আঃ ওয়াদুদ আবার বললেন, 'কমান্ডার সাহেব! আপনি শুনছেন তো, সে আবার আমাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে, অনুগ্রহ করে আপনি গুলী করে ওকে উড়িয়ে দিন।'

মাহমুদ খানও মাওলানার কথায় সায় দিলো। উপস্থিত মুজাহিদরা মাওলানার পক্ষাবলম্বন করে রুশ সেনাকে গুলী করে মারার দাবী তুললো।

শেরদিল খান মুজাহিদদের আগ্রহে গুলী চালাতে নির্দেশ দিলো। একাধিক মুজাহিদ ক্লাসিনকোভ তাক করে ধরলো।

গুলী চালানোর পূর্ব মুহূর্তে আলী শেরদিল খানকে বললো, 'ইসলামের দৃষ্টিতে রুশ সেনাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া ইনসাফ ও সুবিচারে দাবী।' এ দিকটি হয়তো আপনি খেয়াল করেননি যে, রুশসেনা যদি মাওলানাকে হত্যা করতেই চাইতো তবে মাওলানাকে সে এখানে নিয়ে আসবে কেন। ওর হাতেই তো ক্লাসিনকোভ ছিলো। সে আপনাকেও হত্যা করতে পারতো, কিন্তু আপনি নির্দেশ দেয়া মাত্র অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হয়, এ সবের অন্তরালে রহস্য লুকিয়ে আছে।'

আলী কথা শেষ করতে না করতেই মাওলানা সাহেব আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে শেরদিল খানকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, 'কমান্ডার সাহেব! তার কথা মানবেন না। আমার মনে হয় সেও রুশদের অনুচর। রুশরা কি কখনো মুজাহিদদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়? রুশরা জালেম, কাফের আর কাফেরদের হত্যা করা ওয়াজিব।'

শেরদিল খান মাওলানার কথায় মুচকি হাসলো। মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো গুলী না করতে। আলীর দিকে ফিরে শেরদিল খান বললো, আলী! তোমার কথা ঠিক। কিন্তু এখানে তো কেউ রুশ ভাষা জানে না। ব্যাপারটি আমরা কি ভাবে সুরাহা করতে পারি?'

আলী কিছু বলার আগেই মাওলানা বলে উঠলো, 'কমান্ডার সাহেব! আপনি বিষধর সাপকে জীবিত ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি আলেম। ওর (আলীর) চেয়ে ইসলাম সম্পর্কে আমি অনেক বেশী জানি। প্রত্যেকটি রুশ সৈন্য মুসলমানদের শত্রু। শত্রুকে নিপাত করা ওয়াজিব।'

'মাওলানা সাহেব! আমি আলেম নই তবে এতটুকু জানি যে, কমান্ডার সাহেব নির্দেশ করেছেন যে, রুশীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কমান্ডার সাহেবের নির্দেশ মানাও ওয়াজিব।' আলী মাওলানাকে উদ্দেশ করে কথা কয়টি বলে শেরদিল খানকে বললো, 'আব্দুর রহমান রুশী। সে রুশ ভাষা জানে।'

কমান্ডার শেরদিল খান আব্দুর রহমানকে ডেকে পাঠানোর নির্দেশ দিলো।

আব্দুর রহমান দূর থেকে রুশ সেনাকে দেখেই চিনতে সক্ষম হলো। তার স্কুল সহপাঠী মুহাম্মদ ইসলাম। রুশ সৈন্যও আব্দুর রহমানকে দেখা মাত্র দৌড়ে গিয়ে ঝাপটে ধরলো। দু'জন গভীর ভালোবাসায় পরস্পর আলীঙ্গণাবদ্ধ হলো।

মাওলানা ওদের কোলাকুলি দেখে আর নীরব থাকতে পারলো না, বলে উঠল, 'কমান্ডার সাহেব! দেখলেন তো, এক রুশী আরেক রুশীকে কি ভাবে ঝাপটে ধরেছে, এটা আমার কথারই প্রতিফলন যে, কাফের কোন সময়ই মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, 'কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের বাপ-ভাইদেরও মিত্র বানিও না যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে ভালবাসে। তোমরা যদি তাকে সুহৃদ মনে করো তবে জুলুম করবে।'

এজন্যই বলছি, কামান্ডার সাহেব! আব্দুর রহমান যদিও মুসলমান তবুও সে রুশ শত্রুদের বন্ধু। সে রুশ বাহিনীতে চাকুরী করেছে। রুশ সৈন্য কখনও আমাদের মিত্র হতে পারে না। আমরা এদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করলে আল্লাহর নির্দেশ মতো আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

মাওলানার কথা শুনে আলী আর তার ক্রোধ সামলাতে পারলো না। মাওলানাকে ধমকিয়ে বললো, 'মাওলানা! আব্দুর রহমান সম্পর্কে আর একটি কটূক্তি করলে আমি আপনাকে জ্যান্ত রাখব না।'

আলীর কথা শুনে সাথীরা ক্লাসিনকোভ তাক করে ধরল।

দেখলেন, কমান্ডার সাহেব! আমি আগেই বলেছিলাম এও (আলী) রুশ অনুচর।

মাওলানা আলীর বিরুদ্ধে এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করলে শেরদিল খানও ক্রুদ্ধ হলো। বললো মাওলানা! মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কটূক্তি না করে চুপ থাকাই তোমার জন্যে মঙ্গল, আমাদেরকে বিষয়টি বুঝতে দাও।

যেহেতু তোমরা আমার কথা মানলে না তাহলে আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না। মাওলানা রাগত স্বরে একথা বলে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

মুহাম্মদ ইসলাম আব্দুর রহমানকে কি যেন বলল।

আব্দুর রহমান শেরদিল খানকে বলল, মুহাম্মদ ইসলাম মাওলানাকে গ্রেফতার করার জন্য বলছে। সে জানাচ্ছে, মাওলানা রুশ বাহিনীর একজন দক্ষ দালাল।

শেরদিল খান মাওলানাকে ডেকে দাঁড়াতে বললো, মাওলানা না দাড়িয়ে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলো।

আলী হাঁক দিলো, মাওলানা! দাড়ান।

কিন্তু মাওলানার দৌড়ের গতি আরো বেড়ে গেলো। আলী গুলী করলো। গুলি মাওলানার হাটুর নীচে আঘাত হানলে সে পড়ে গেলো। মুজাহিদরা দৌড়ে গিয়ে মাওলানাকে ধরে নিয়ে এলো।

মুহাম্মদ ইসলাম রুশ ভাষায় মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদের দালালির কথা বিস্তারিত বললে আব্দুর রহমান পশ্‌তু ভাষায় মুজাহিদদের বুঝিয়ে বললো, 'এই রুশ সেনার নাম মুহাম্মদ ইসলাম। একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। শুরু থেকে মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করে আসছে। সে বলছে, মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ রুশ বাহিনীর নিয়মিত বেতনভুক্ত লোক। সে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তথ্য পাচারে নিয়োজিত। এই আব্দুল ওয়াদুদই মুজাহিদ সামিউল্লাহ, আসাদ উল্লাহ, কমান্ডার আব্দুল হাকীমকে অপহরণ করে রুশদের হাতে সোপর্দ করেছিলো। এ মুজাহিদ ক্যাম্পের নক্সা এবং যাবতীয় তথ্য সে-ই রুশদের হাতে তুলে দিয়েছিলো। আজ রুশবাহিনী যখন আপনাদের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিলো, তখন ইচ্ছে করেই আমি রুশ সৈন্যদের থেকে পৃথক হয়ে এদিকে আসছিলাম মুজাহিদদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে। পথে মাওলানা ওয়াদুদের দেখা পেয়ে আমি তাকে ধরে নিয়ে এসেছি। এই জ্ঞানপাপী অন্তত বিশজন সুদক্ষ মুজাহিদের হন্তারক।'

মাওলানা ওয়াদুদের গাদ্দারীর কাহিনী শুনে শেরদিল খান, আলী ও অন্যান্য মুজাহিদদের হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হলো, শেরদিল খান রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে শুধু কাঁদছিলেন, তার মন বলছিলো যে, এই জ্ঞানপাপী মাওলানার একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত শিকারী কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করা, যেন কুকুরগুলো তার তাগড়া শরীর থেকে সব গোশ্‌ত খুবলে খুবলে ছিড়ে খায়। অন্যান্য মুজাহিদরাও মাওলানাকে ধিক্কার দিচ্ছিলো।

শেরদিন খান আলী ও মাহমুদ খানের সাথে পরামর্শ করে মাওলানা ওয়াদুদকে গুলী করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'হে শয়তান ও দৌলতের পূজারী! তুমি মুসলমানদের কলংক। মাওলানা হওয়ার পরও তুমি মুসলমান জাতির সাথে যে বেঈমানী করেছো তা সমগ্র জাতির জন্য লজ্জাক দৃষ্টান্ত। তুমি মুসলমানদের ওপর যে জুলুম করেছো তা জাতির ললাটে এক আমোচনীয় কালীমা হয়ে থাকবে। তোমাকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে মারলেও অপরাধের তুলনায় শাস্তি কম হয়ে যায়। ইসলামে নির্যাতনের মাধ্যমে বেঈমানদের খতমের অনুমোদন নেই, সেজন্যে তোমাকে শুধু মৃত্যুদন্ড দিচ্ছি। হে ঈমান বিক্রেতা! জেনে রেখো, তোমার লাশ শহরের চৌরাস্তায় বিদ্যুতের খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। মুসলমানদের মধ্যে তুমি একটি অভিশপ্ত গাদ্দার—তা যেন মানুষ জানতে পারে।'

মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ কমান্ডার শেরদিল খানের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইতে লাগলো। সে তার ছোট ছোট নিরাপরাধ ছেলে-সন্তানদের দোহাই দিতে লাগলো। শেরদিল খান রুঢ়কণ্ঠে বললে, 'আমি কোন জাতীয় বেঈমানকে ক্ষমা করে নিজের নাম গাদ্দারদের তালিকাভুক্ত করতে চাই না। তুমি এমন জঘণ্য অপরাধী যে, আসাদুল্লাহ, আব্দুল হাকিম ও সামিউল্লাহর মতো বীর মুজাহিদদের তুমি হত্যা করেছ। তোমাকে হাজার বার জিন্দা করে হত্যা করলেও উচিৎ শাস্তি হবে না, তুমি উপযুক্ত শাস্তি পাবে আখেরাতে জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে।'

মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদকে গুীল করে হত্যা করা হলো।

চার মুজাহিদকে দায়িত্ব দেয়া হলো ওর লাশ রাতের বেলা শহরের চৌরাস্তায় ঝুলিয়ে দেয়ার জন্য, যা দেখে জাতির হতভাগ্য বেঈমানরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

আসর নামাজের জন্যে আলী ও সাথীরা যখন ঘুম থেকে উঠলো, তখন তারা দেখতে পেলো ক্যাম্পে হাজার হাজার মুজাহিদ।

কমান্ডার শেরদিল খান বললেন, হেডকোয়ার্টার থেকে কিছুক্ষণ আগে মুজাহিদরা এসেছে। এ মুজাহিদদের মধ্যে আমাদের সংগঠন ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের মুজাহিদও আছে। ক্যাম্প পুনরুদ্ধার করার জন্য সকল মুজাহিদ সংগঠন সম্মিলিতভাবে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল।

আসর নামাজের পর কমান্ডার শেরদিল খান নবাগত মুজাহিদদের কাছে আলীর পরিচিতি পর্যায়ে বললেন, 'এ যুবক সে-ই বীর মুজাহিদ যে মাত্র একত্রিশজন সাথী নিয়ে শুধু এ ক্যাম্পই পুনরুদ্ধার করেনি বরং শত্রুদের শতাধিক ছত্রীসেনা হত্যা করেছে এবং আঠারজন রুশসেনাকে জীবিত বন্দী করে এনেছে। আমাকে এ ক্যাম্প উদ্ধারের কথা বলা হলে আমি কমপক্ষে পাচ'শ মুজাহিদ ছাড়া এক পা-ও অগ্রসর হতাম না।'

নবাগত মুজাহিদ দলের কমান্ডার বললেন, নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে, মাত্র একত্রিশজনের একটি ক্ষুদ্র মুজাহিদ দল কিভাবে এক বিরাট ক্যাম্প শত্রুদের কাছ থেকে পুনর্দখল করতে পারে। নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে, আলীর মতো মুজাহিদরাই প্রতিটি অপারেশনে শত্রুদের নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে। আমি আলী ও সাথী মুজাহিদদেরকে এই বিস্ময়কর বিজয়ে অভিনন্দন ও মোবারকব্যাদ জানাচ্ছি।

অভিনন্দনের জবাবে আলী বললো, আমি কমান্ডার শেরদিল খান ও নবাগত কমান্ডার সাহেবের শুকরিয়া আদায় করছি। তবে একথা বলা ঠিক হবে না যে, এই ক্যাম্প শুধু

আমার কৃতিত্বে পুররুদ্ধার করেছি, যদি আল্লাহ তা'আলা সাহায্য না করতেন তাহলে কিছুতেই বিজয় অর্জন করা সম্ভব হতো না। আমাদের সকল পরিকল্পনাই ভেস্তে যেতো। এই অবিস্মরণীয় বিজয় আল্লাহর সাহায্য এবং আমার সাথীদের মরণপণ লড়াইয়ের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমাদের উচিৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আল্লার শুকরিয়া আদায় করা।

পরদিন শহীদ মুজাহিদদের দাফন সম্পন্ন করে কয়েদীদেরকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আহত মুজাহিদদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলো পেশওয়ারে। বিজিত ক্যাম্পে দু'দিন থাকার পর আলী ও তার সাথী মুজাহিদরা কমান্ডার শেরদিল খানের কাছে বিদায় চাইলো।

কমান্ডার শেরদিল খান আলীর বিদায়ের পূর্বে নানা প্রসঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় দু'জন টহলদার মুজাহিদ এসে কমান্ডার শেরদিল খানকে জানালো, গত রাতে রুশ বাহিনী বিমান থেকে পাহাড়ের চতুর্দিকে অসংখ্য মাইন ছড়িয়ে দিয়েছে। ক্যাম্প থেকে বাইরে যাওয়ার সকল পথ মাইনে ভরপুর। সকাল বেলা মাইন বিস্ফোরণে চারজন মুজাহিদ আহত হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, রুশদের ছড়ানো এসব মাইন দেখতে অবিকল পাথরের মতো। পাথরসমৃদ্ধ পাহাড়ে কোনটি পাথর কোনটি মাইন সনাক্ত করা দুরুহ। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত হলেও এসব মাইন বিস্ফোরিত হয়নি।

আলী জিজ্ঞেস করলো, টহলরত মুজাহিদরা কি বুঝতে পারেনি যে রুশবিমান মাইন নিক্ষেপ করছে? প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কেন?

মুজাহিদদ্বয় বললো, রাতের বেলা বিমানবিধ্বংসী কামান সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। কারণ কামানের বিচ্ছুরিত আগুনে কামানের অবস্থান বিপক্ষের কাছে চিহ্নিত হয়ে যায়। শত্রু হামলার আশংকা থাকে। যে কারণে রাতে রুশ বিমান প্রতিরোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

রুশ বাহিনীর মাইন ছড়ানোর কথা শুনে শেরদিল খান আলীকে বললো, দু'একদিনের জন্যে যাত্রা মুলতবি করো। পথ মাইনমুক্ত হলেই তোমাকে জানানো হবে।

কথা শেষ করে আলী, শেরদিল খান, মুহাম্মদ ইসলাম, মাহমুদ খান এবং নবাগত কমান্ডার মাইন পর্যবেক্ষণ করে দেখলো। ক্যাম্পের চারপাশে রুশ বাহিনী অসংখ্য মাইন ছড়িয়ে পুরো এলাকা বারুদের ডিপোতে পরিণত করেছে। মাইন অপসারণ করে যাতায়াতের রাস্তা নিরাপদ বানানো যথেষ্ট কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে আলী বললো, এত বিপুল পরিমাণ মাইন ছড়ানোর উদ্দেশ্য হলো, রুশ বাহিনী আমাদের গতিবিধি ক্যাম্পে সীমিত করে দিতে চায়। কারণ দ্রুত গতি পরিবর্তনের ওপরই নির্ভর করে আমাদের গেরিলা আক্রমণের সফলতা-ব্যর্থতার বিষয়। যে, মাইন রুশ বাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছে তা পরিস্কার করতে আমাদের সপ্তাহ লেগে যাবে, তার পরও হয়তো আমরা মাইন থেকে শংকামুক্ত হতে পারবো না। এমতাবস্থায় রুশ বাহিনী আমাদের ওপর ট্যাংক ও সাজোয়া বহর নিয়ে চড়াও হলে

আমরা ক্যাম্পের সীমিত বলয়ে বন্দী হয়ে পড়বো। বিনা প্রতিরোধে আমাদের ক্যাম্পে আটকা পড়ে মরতে হবে। তাই আমাদেরকে আগে পথ মাইনমুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

মাইন বিস্ফোরণের ভয়ে মুজাহিদদের বাইরে বেরুনো প্রায় বন্ধ। প্রতিটি কদম তাদের অতি নিরীক্ষণ করে সামনে ফেলতে হচ্ছে। এত সাবধানতার পরও দুপুর পর্যন্ত আরো চার মুজাহিদ আহত হলো মাইন বিস্ফোরণে।

জোহর নামায শেষ হলো। সকল মুজাহিদ চিন্তামগ্ন। আলী প্রস্তাব করলো, 'মাইন অবরোধ থেকে মুক্তির জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দু'য়া করি। আল্লাহ তা'আলা সকল শক্তির আধার, সকল সমস্যার সমাধানদাতা, মানুষের যখন সকল ক্ষমতা রহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ বিস্ময়করভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করে দেন।'

আলীর প্রস্তাবে সকল মুজাহিদ আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে মুনাজাত করলো। অনুরূপ আসর, মাগরিব ও এ'শার নামাযের পরও দু'য়া করা হলো।

রাতে সকল মুজাহিদ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন । পূর্ব কোণ থেকে ঘন মেঘ উঠে সারাটা আসমান অন্ধকারে ছেয়ে ফেললো। একটু পড়েই শুরু হলো প্রচন্ড তুফান, বিজলী ও বৃষ্টি। বাতাসের তীব্র ঝাপটায় সমানে পাহাড়ী গাছ উপড়ে পড়তে লাগলো। বজ্রপাতে এমন বিকট শব্দ হচ্ছিলো যে, কাণের তল ফেটে যাওয়ার উপক্রম। মুজাহিদদের তাবুগুলো তীব্র-তুফানে তছনছ হয়ে গেলো। প্রচন্ড ঝড়ো-বাতাস কোন কোন তাবু উড়িয়ে নিয়ে গাছের আগায় রেখে দিলো। কামানগুলো উল্টিয়ে উল্টিয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেলো অনেক দূর পর্যন্ত। ঘুমন্ত মুজাহিদরা জেগে কলেমা তায়্যিবা পড়তে পড়তে গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় নিলো। যারা গুহাভ্যন্তরে ছিলো তারা জেগে ভীত বিহবল হয়ে পড়লো।

তুফান একটু কমে এসেছে, এবার শুরু হলো মুষলধারায় শিলা বৃষ্টি। বিশাল পাথরের মতো শিলা পড়ে স্তূপ হয়ে গেলো, যেন আসমান ভেঙ্গে পড়ছে পৃথিবীতে। তুফান, শিলা বৃষ্টি ও বজ্রপাতে এমন এক ভয়াবহ শব্দের সৃষ্টি হলো যে, নিজের চীৎকার নিজেই শোনা যাচ্ছিলোনা। আফগানিস্তানের ইতিহাসে মুজাহিদরা এমন শিলাবৃষ্টি হতে আর দেখেনি। বজ্রের গর্জন ও বিজলীর ঝিলিক এমন ভয়াবহ ছিলো যে, মনে হতো বজ্রটা বুঝি আমাদের ওপরই পড়লো।

দীর্ঘ দু'ঘন্টা একাটানা মুষলধারায় বৃষ্টি, তুফান, শিলাপাত ও বজ্রপাতের পর পরিস্থিতি শান্ত হলো। মুজাহিদরা শংকামুক্ত হয়ে আবার গুহাভ্যন্তরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোর বেলা মুজাহিদরা ঘুম থেকে জেগে দেখে, ক্যাম্পের কুড়িটি গাছ তুফানে উপড়ে গেছে। তাবুগুলো গাছের আগায় লটকে রয়েছে। গড়াতে গড়াতে বিমানবিধ্বংসী কামানগুলোও চলে গেছে নীচের ঢালুতে।

ফজর নামাযের পর সকলের মুখেই রাতের তুফানের কথা আলোচিত হচ্ছে। সবাই রাতের ভয়াবহ তুফানের বর্ণনায় মশগুল।

আব্দুল রহমান বললো, ভাই! আমার তো মনে হচ্ছিলো যে আর ক'মিনিট থাকলে আমাদের পাহাড়ই না তুফানে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

অপর এক মুজাহিদ বললো, আমার মনে হচ্ছিলো যে, বজ্রপাতে আমি মারাই যাচ্ছি। মুজাহিদদের এ ধরনের আলোচনার ভেতরেই পাহাড়ের ওপর থেকে দু'টহলদার মুজাহিদ এসে মোবারকবাদ জানালো। সমবেত মুজাহিদ কমান্ডারগণ বিস্ময়াবিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বিপদের সময় কিসের মোবারকবাদ?

টহলদার মুজাহিদরা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বললো, রাতের তুফান ও শিলাবৃষ্টিতে আমাদের যদিও বিপুল ক্ষতি হয়েছে কিন্তু শিলাপাতে সকল মাইন ফেটে গেছে, যা-ও বাকী ছিলো প্রবল স্রোতের টানে তা নিচের দিকে নেমে গেছে। এখন আমরা সম্পূর্ণ মাইন মুক্ত।

আলী ও কমান্ডার শেরদিল খানের বুঝে এলো পুরো ঘটনা। শেরদিল খান আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, 'আলী! তোমার পরামর্শ ছিল যথার্থ। আল্লাহ মানুষকে কখনো এভাবে সাহায্য করেন যে মানুষ তা ভাবতেও পারে না। একটু আগেও যে তুফানকে আমরা গজব ভাবছিলাম তাই এখন আমাদের জন্য রহমত বলে প্রমাণিত হলো। কয়েক সপ্তাহেও পুরো এলাকা মাইনমুক্ত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না; কিন্তু আল্লাহ মাত্র দু'ঘন্টায় কতো নিপুণভাবে মাইন অপসারণ করে আমাদেরকে বিপদমুক্ত করে দিলেন। গতকাল আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি, আল্লাহ দয়া করে আজই আমাদের সাহায্য করেছেন।'

বিস্ময়কর সাহায্যপ্রাপ্তিতে সকল মুজাহিদ মিলে দু'রাকাত শুকরিয়া নামায আদায় করলো।

পরদিন আলী ও তার সাথীরা ক্যাম্প থেকে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে, মুহাম্মদ ইসলামও তাদের সাথী হলো। কমান্ডার শেরদিল খান এসে আলীকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে বললেন, 'আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে, তুমি যেখানেই যাবে বিজয় তোমার পদচুম্বন করবে। আমরা তোমার সফলতা কামনা করি।'

সকল মুজাহিদ "আল্লাহু আকবার" তাকবীর ও "কমান্ডার আলী-জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়ে তাদের বিদায় জানালো। আলী ও সাথীরা ক্যাম্প ছেড়ে নিজ ক্যাম্পের দিকে যাত্রা করলো।

দু'সপ্তাহের পথ পাড়ি দিয়ে আলী ও সাথীমুজাহিদরা তাদের নিজস্ব ক্যাম্পে পৌঁছলো। পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তৃর্ণ জায়গা নিয়ে আলীদের ক্যাম্প। পাহাড়ের বিপরীতে বিশাল মাঠ। তবে সমতল নয়, জায়গায় জায়গায় পাহাড়ী টিলা, ঝোপ-ঝাড়,

কোথাও সারিবদ্ধ গাছের পাতলা বন, কোথাও ঘন গাছ-গাছালি জঙ্গল। কিছুদূর পর পরই রয়েছে পাহাড়ী নালা ও প্রবাহিত ঝরণাধারা। আলীদের ক্যাম্প থেকে ১০ মাইল দূরে জেলা সদর, ৩০ মাইল দূরেই প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টার। আলীদের ক্যাম্পটি ছিল তিন জেলার সীমান্তের সব চেয়ে জুৎসই জায়গায়। মুজাহিদরা ক্যাম্পের পাশের জমিতে সারিবদ্ধ গাছ লাগিয়ে সবুজ-শ্যামল মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। অবস্থানগত দিক থেকেও ক্যাম্পটি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকাংশ মুজাহিদ তাবুতেই থাকতো, মাটি ও পাথরের মিশ্রণে তৈরী বেশ কঁটি ঘরও ছিলো। চারশ'র মতো মুজাহিদ ছিলো এ ক্যাম্পে। দীর্ঘ যাত্রাপথের ক্লান্তি কাটাতে ক্যাম্পে পৌঁছে আলী কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও ঘুমানোর পরে ক্যাম্পের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বেরুলো। এ দিনটি তার ক্যাম্পের অবস্থান পর্যবেক্ষণেই চলে গেলো। দ্বিতীয় দিন আব্দুর রহমান, মুহাম্মাদ ইসলাম, দরবেশ খান, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, আব্দুস সালাম, ক্যাম্পের অস্থায়ী দায়িত্বে নিযুক্ত প্রাক্তন কমান্ডার আহমদ গুল ও আরো চারজন বিজ্ঞ মুজাহিদ নিয়ে পরামর্শ সভায় মিলিত হলো। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, আলী ক্যাম্পের আশপাশ এলাকা একবার ঘুরে দেখবে। অতঃপর আলোচনাক্রমে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে।

অতি সংগোপনে এক মাসে আলী পুরো জেলার তিনটির ভৌগলিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলো। ভ্রমণে আলী তার অধীনস্থ ২০ টি মিনি ক্যাম্প ছাড়াও বিভিন্ন কমান্ডের অধীনে ১২টি ক্যাম্প পরিদর্শন করলো। প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টারসহ ১০/১৫টি বড় বড় শহরও দেখে আসলো। বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারের মুজাহিদ নের্তৃবৃন্দ, অন্যান্য এলাকার মুজাহিদ এবং মুজাহিদ সহযোগী ব্যক্তিদের সাথেও আলীর মতবিনিময় হলো। ভ্রমণ মিশনে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ, কমান্ডার আহমদ গুল ও আব্দুর রহমান ছিলো আলীর সঙ্গী। ভ্রমণে অন্যান্য মুজাহিদ কমান্ডার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ভৌগলিক অবস্থানের সাথে আলী ব্যাপক পরিচিত ও অবগত হলো। ক্যাম্পে ফিরে এসে সপ্তাহান্তে আলী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও কমান্ডারদের নিয়ে আলোচনা সভার আহবান করলো।

কমান্ডারদের মিটিং-এ আব্দুর রহমানকেও রাখা হলো। আব্দুর রহমান এক প্রস্তাবে বললো, 'চীন গণমুক্তি ফৌজের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস আমি পড়েছি। এখানে আমরা রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, চায়না মুক্তিফৌজও এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলো। তবে ওরা শত্রু বাহিনীর মোকাবেলায় বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে পাতাল ফাঁদ ও বিভ্রান্তিকারী সুরঙ্গ পথ নির্মাণ করেছিলো। এর দ্বারা সহজেই তারা শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হতো। পাতাল ফাঁদ এমন বিস্ময়কর মৃত্যু গহবর যে, অতি সহজ পথ মনে করে এখানে কেউ ঢুকে গেলে কারো পক্ষে আর দ্বিতীয়বার মুক্ত আকাশ দেখার ভাগ্য হয় না। বের হয়ে আসার পথ খুঁজতে খুঁজতেই মৃত্যুবরণ করে সে। আমরাও এ কৌশলটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি। আশা করি এতে আমরা সুফল পাবো।'

সর্বসম্মতিক্রমে আব্দুর রহমানের পাতাল ফাঁদ কৌশল আলোচনা সভায় গৃহীত হলো। তা ছাড়া এ ডিভিশনের অধীনস্থ মুজাহিদ ইউনিটগুলোকে আটটি জোনে ভাগ করে নেয়া হলো। প্রত্যেক জোনের নিয়ন্ত্রকরূপে এক একজনকে দায়িত্ব দেয়া হলো, যিনি 'আমীর' পদবীতে পরিচিতি হবেন। জোনের সকল কমান্ডার ও মুজাহিদদেরকে আমীর-এর নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হলো।

আলোচনা সভার শেষ পর্যায়ে আলী বললো, 'যে সব ক্যাম্প পাহাড়ী এলাকায় কিংবা পাহাড়ের ওপর, সে সব ক্যাম্পে গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র পাহাড়ে গর্ত করে তার ভেতরে রাখতে হবে, যাতে শত্রু বাহিনীর বিমান হামলায় অস্ত্র-শস্ত্রের কোন ক্ষতি না হয়। তবে পাহাড়ের ভেতরে স্টোর করার সময় লক্ষ্য রাখবে, প্রত্যেকটি গর্তের যেনো পেছন দিক থেকে অন্যটির সাথে সংযোগ পথ থাকে। সামনের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেলেও যাতে পেছন দিকের অন্য পথে মুজাহিদরা বেরিয়ে আসতে পারে।

অন্য একটি ব্যাপার হলো, ঝটিকা সফরে আমি লক্ষ্য করেছি, শত্রুসেনা অপেক্ষা আমাদের মুজাহিদ সংখ্যায় খুবই কম। মুজাহিদ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমি নিজেও বিভিন্ন স্থানে গিয়ে মিটিং করে মুজাহিদ রিক্রুটের চেষ্টা করবো।

আরেকটি জরুরী কথা হলো, শত্রুক্যাম্পে ও শহরাঞ্চলে আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে প্রত্যেক জোন, থানা, ক্যাম্প, ইউনিট ও জেলা অফিস থেকে নিজ নিজ দলের সহযোগী ও সমর্থকদের তালিকা দ্রুত মারকাজে পৌঁছে দেবে। ঝটিকা সফরের সময় আমি এসব লোকের সাথে মিলিত হয়ে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবো।

সবশেষে আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলবো, আমাদের কর্মকৌশল যতো সুন্দরই হোক না কেন, যদি মুজাহিদদের মধ্যে কমান্ডারের কমান্ড মানার মনোবৃত্তি না থাকে তবে সকল কৌশলই ভেস্তে যাবে। শৃংখলা ও ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার জন্যে জরুরী হলো-সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মুজাহিদদের ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক ফজরের নামাজের পর পবিত্র কুরআন পাঠের ব্যবস্থা ও মাগরিবের পর হাদীস চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা জানেন যে, আফগানিস্তানের মানুষ অশিক্ষিত, তাই তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা অতি জরুরী। জিহাদ, শাহাদাতের মর্যাদা ও দেশ প্রেমে উজ্জীবিত করতে হবে তাদেরকে।

শেষ কথা হলো, প্রত্যেক নামাযের পর বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে মুজাহিদদের বিজয়ের জন্যে দু'আ করতে হবে। আমাদের জানা থাকা দরকার যে, আল্লাহর রহমত ও নুসরত ছাড়া এই বিশাল পরাশক্তির মোকাবেলায় মুজাহিদদের বিজয় কখনও সম্ভব নয়।

আলী ক্যাম্পে বাংকার খননের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বাংকার খননে নিযুক্ত বন্দী রুশদের এই আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, নির্দিষ্ট বাংকার খননের পর তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে। বাংকার খননের পাশাপাশি ডিস্ট্রিক বোর্ডের বড় রাস্তার আশে-পাশে বিরাট বিরাট পাতাল ফাঁদ তৈরীর কাজও শুরু করা হলো। পাতাল ফাঁদ তৈরীর কঠিন দায়িত্ব দেয়া হলো আব্দুর রহমানকে।

পাতাল ফাঁদ খুব গভীর করে খনন করা হচ্ছিলো। যাতে সাধারণ মানুষের চাষাবাদে কোন অসুবিধা না হয় এবং শত্রু বাহিনীর বোম্বিং-এ পাতাল ফাঁদ নষ্ট না হয়।

আলী আসার আগে ক্যাম্পে কোন মসজিদ ছিল না। মুজাহিদরা খোলা মাঠে নামায পড়তো। আলী অল্প দিনের মধ্যেই ক্যাম্পে একটি মসজিদ নির্মাণ করালো। মাটি-পাথরের দেয়াল ও কাঠের ছাউনী দিয়ে মুজাহিদরা একটি মনোরম মসজিদ তৈরী করলো। সাদাসিধে হলেও মসজিদটি দেখতে খুবই সুন্দর ও ঝকঝকে পরিস্কার। মসজিদের পাশেই ছিল বিরাট বিরাট গাছ। গাছের ছায়ার গরমের দিনেও মসজিদ চত্ত্বর থাকতো ঠান্ডা এবং ফুরফুরে বাতাসের মনোরম আবেশ।

পুরোদমে বাংকার খনন ও পাতাল ফাঁদ তৈরীর কাজ চলছে। এমতাবস্থায় আলী মুজাহিদ সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পল্লী এলাকায় ভ্রমণের প্রোগ্রাম করলো। আব্দুর রহমানের স্থলে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহকে পাতাল ফাঁদ তৈরীর দায়িত্ব এবং দরবেশ খানকে ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় কমান্ডার নিযুক্ত করে আব্দুর রহমান ও একজন স্থানীয় মুজাহিদ নিয়ে আলী মুজাহিদ সংগ্রহ মিশনে বেরিয়ে পড়লো।

প্রতি দিন ১০/১২টি গ্রামে আলী উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষকে জড়ো করে জিহাদের প্রয়োজন, দেশের সামগ্রিক অবস্থা এবং রুশ বাহিনীর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দিতো। আলীর যাদুময়ী বক্তৃতা শুনে যুবক তরুণরা জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হতো। আলীর মুখে রুশ নির্যাতনের কাহিনী শুনে মহিলা-শিশু-বৃদ্ধরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো। আর যুবকদের হৃদয়ে জ্বলে উঠতো প্রতিশোধের অগ্নিশিখা।

আব্দুর রহমান ও আলীর জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর প্রত্যেক গ্রাম থেকেই জিহাদে নাম লিখানোর জন্য নয় বছরের কিশোর থেকে নিয়ে আশি বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত উদগ্রীব হয়ে পড়তো। মুক্তির একই পথ 'আল জিহাদ' 'আল জিহাদ' শ্লোগানে মুখরিত হত পল্লীর বিস্তৃর্ণ আকাশ-বাতাস। গ্রামের তরুণী ও মহিলারা আলীর জিহাদী বক্তৃতায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের গায়ের অলংকার খুলে তুলে দিতো আলীর জিহাদ ফান্ডে।

আলী প্রত্যেক গ্রামেই কোন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক কিংবা শিক্ষিত লোককে 'আমীর' নিযুক্ত করে তাকে ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতির কৌশল অবহিত করে অন্য গ্রামে চলে যেতো। প্রায় প্রতি গ্রামেই কিছু কিশোর ও অতিবৃদ্ধরা জিহাদে শরীক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতো। আলী তাদের বোঝাতো, সবাই জিহাদে চলে গেলে চলবেনা, প্রতি ঘর থেকে মাত্র একজনকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

কোন মহিলা যদি জিহাদে শরীক হতে চাইতো, আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, 'প্রিয় মা ও বোনেরা! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের এসব সন্তান ও ভাইয়েরা জীবিত থাকবে ততক্ষণ আপনাদের বন্দুক উঠাতে হবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে আপনারা মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য দু'আ করুন, এটাই হবে আপনাদের বড় জিহাদ।'

সাধারণ আফগানীদের একান্তভাবে কাছে থেকে দেখার সুযোগ আব্দুর রহমানের জীবনে এটাই ছিল প্রথম। সাধারণ মানুষের মধ্যে জিহাদী চেতনা ও মুক্তির প্রেরণা দেখে

আব্দুর রহমান আলীকে বললো, 'যে জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এমন জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত, রুশ কেন পুরো বিশ্বশক্তিও তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

আলী ও আব্দুর রহমানের বক্তৃতা ও উদ্বুদ্ধকরণে আফগান পল্লীতে জিহাদী আগুন জ্বলে উঠলো। ঘরে ঘরে আলোচিত হতে লাগলো রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার কলা-কৌশল।

গুপ্ত এজেন্টদের মাধ্যমে রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে চলে গেলো আব্দুর রহমান ও আলীর উপস্থিতি এবং মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযানের খবর। সরকার খুবই পেরেশান হলো আলীর কৌশলের খবর শুনে। সরকার একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী পাঠালো আব্দুর রহমান ও আলীকে গ্রেফতার করতে। আলী ও আব্দুর রহমানের মুজাহিদ সংগ্রহ অভিযান তুফানের বেগে চলছিলো। রুশ সেনারা যখন খবর পেয়ে কোন গ্রামে তাদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে হাজির হতো, গিয়ে দেখতো তারা এর আগেই চলে গেছে অন্য গ্রামে। তাদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়ে রুশ বাহিনী সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার শুরু করলো, শত অত্যাচার সহ্য করেও গ্রামবাসী স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, আলী ও আব্দুর রহমানকে গ্রেফতারের প্রশ্নে তারা রুশদের কোন ধরনের সহযোগিতা করতে অপারগ।

আলী যখন জানতে পারলো যে, রুশ বাহিনী তাদের গ্রেফতার করতে না পেরে গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার করছে তখন সে মুজাহিদ সংগ্রহ মিশন বন্ধ করে ক্যাম্পে ফিরে এলো। দশ দিনে আলীর শতাধিক গ্রাম ভ্রমণ করে সহস্রাধিক মুজাহিদ সংগৃহীত হলো। সংগৃহীত মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে কয়েকটি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ক্যাম্পের বাংকার খনন ও পাতাল ফাঁদ তৈরীর কাজ তখনও শেষ হয়নি। ইতিমধ্যে রুশ বাহিনীর একদফা বোমা হামলা হয়ে গেছে। কিন্তু বোমা হামলা মুজাহিদদের বাংকার খনন ও পাতাল ফাঁদ তৈরীতে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি বিন্দুমাত্র। রাতের আঁধারেই চলতো মুজাহিদদের খনন কাজ। কিছু দিনের জন্যে মুজাহিদরা রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালান বন্ধ রেখেছিলো। তাদের ইচ্ছা ছিলো, খনন শেষ করার আগে যেন এই প্রোগাম সম্পর্কে শত্রু বাহিনী কোন ধারণা না পায়।

একদিন খবর এলো, রুশ বাহিনী বহু ট্যাংক, সাজোয়া যান ও কামান বহর নিয়ে মুজাহিদদের ক্যাম্পে হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছে। আলী সকল মুজাহিদদের জরুরী সভায় তলব করলো। ঝানু ঝানু সকল মুজাহিদের বসলো পর্যালোচনা সভা।

আলী বললো, 'আমাদের বাংকার ও পাতাল ফাঁদ খননের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমার মনে হচ্ছে, এখানে পৌঁছার আগেই আমরা রুশ কনভয়কে ঠেকিয়ে দিতে পারবো। অন্তত ক্যাম্প থেকে ১০ মাইল দূরে রুশ বাহিনীর পথ রোধ করতে হবে।'

সকল মুজাহিদ নেতা আলীর কথায় একমত হলো। বেছে বেছে একশ' মুজাহিদ নিয়ে আলী শক্তিশালী সমরাস্ত্রে সজ্জিত রুশ ট্যাংক বহরের গতিরোধ করতে রওয়ানা হলো।

রুশ কনভয় ডিষ্ট্রিক বোর্ডের পাকা সদর রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আলী একটি সুবিধাজনক জায়গায় মুজাহিদদের থামিয়ে দু'জন মুজাহিদকে ঘোড়া নিয়ে রুশ বাহিনীর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসার জন্য পাঠিয়ে দেয়। মুজাহিদদ্বয় ফিরে এসে বললো, কনভয় এখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। মনে হচ্ছে, রাতে ওরা ওখানেই থাকবে এবং ভোরে আমাদের ক্যাম্পে হয়ত আক্রমণ চালাবে।

আলী সার্বিক পরিস্থিতি গভীরভাবে অনুধাবন করে বললো, 'পাকা সড়কে গর্ত করে মাইন পুঁতলে সহজেই শত্রুদের চোখে পড়বে। তাই সড়কের নীচে গর্ত করে সেখানে ডিনামাইট স্থাপন করতে হবে। সড়ক স্বাভাবিক থাকবে, শত্রুরা ধরতে পারবে না। অথচ ট্যাংক যখন অতিক্রম করবে তখন ট্যাংকের চাপে মাটি ধসে যাবে, মাইনের বিস্ফোরণ ঘটবে, ট্যাংক বিধ্বস্ত হবে, পথ আটকে যাবে। এরপর ওরা সড়কের দু'পাশ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে। আমরা দু'পাশেই মাইন পুঁতে রাখবো, যে পাশ দিয়ে সামনে যাবে রুশ বাহিনীর ট্যাংক ধ্বংস হবে। ওরা আর অগ্রসর হতে পারবে না।'

আলীর অভিনব পরিকল্পনা সবার পছন্দ হলো। কতক মুজাহিদ পাকা সড়কের নীচে গর্ত করার কাজে লেগে গেলো, আর কিছুসংখ্যক পাহাড়ের টিলার উপর বাংকার খননে লেগে গেলো। এই পাহাড় থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরের এক উঁচু টিলায় আলী দশ মুজাহিদের এক মিজাইল ও রকেট ইউনিট নিয়োগ করে আর দশজনকে আরো সামনে পাঠিয়ে দিয়ে বললো, তোমরা সুবিধা মতো স্থানে আত্মগোপন করে থাকবে। ট্যাংক বহর যখন তোমাদের অতিক্রম করে চলে আসবে তখন দ্রুত রাস্তা খুড়ে মাইন পুঁতে রাখবে এবং এদিক থেকে শত্রুবাহিনী পালাতে চাইলে ফায়ার করে খতম করবে। অর্ধরাতের মধ্যে সকল পরিকল্পনা সমাপ্ত হলো। আলী কয়েকজন মুজাহিদকে পাহারায় নিযুক্ত করে বাকীদের আরাম করতে বললো। পরিশ্রান্ত মুজাহিদরা ঘুমিয়ে পড়লো।

ফজরের আগ মুহূর্তে পাহারারত মুজাহিদরা এসে আলীকে জাগিয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে শত্রু বাহিনীর কনভয় এগিয়ে আসছে।'

আলী সবাইকে জাগিয়ে নিজ নিজ পজিশনে গিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলো।

রুশ ট্যাংকবহর খুব ধীর গতিতে এগুচ্ছে। ট্যাংকবহর যখন মুজাহিদ অবস্থান অতিক্রম করছিলো তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। আলী দূরবীন দিয়ে শত্রু বাহিনীর অগ্রযাত্রা নিরীক্ষণ করছিলো। দেখতে পেলো প্রথম ট্যাংকটি মুজাহিদদের মাইন পুঁতে রাখা গর্ত অতিক্রম করে চলে গেছে, কিন্তু মাইন বিস্ফোরিত হয়নি। আলীর আফসোস হলো, এতো ভারী ট্যাংক উপর দিয়ে চলে গেলো কিন্তু মাটি একটুও ধসলো না! হায়। আজ হয়তো ভাগ্য আমাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে!

আলী চিন্তামগ্ন। দ্বিতীয় ট্যাংকটি যখন গর্ত অতিক্রম করতে চাইলো ঠাস করে মাইন বিস্ফোরিত হলো। ট্যাংক মাটিতে বসে গেলো, উড়ে গেলো চালকের হাড়মাংস। সেই সাথে অগ্রগামী ট্যাংকটিও ধসে গেলো সামনের গর্তে।

আলী হাসলো। প্রতিটি মাইন কাজে লেগেছে। মাঝপথ ছেড়ে এবার শত্রু বাহিনী সড়কের পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। একটু সামনে অগ্রসর হতেই আরো দু'টি ট্যাংক সমূলে চালক সমেত ধসে গেলো, সেই সাথে সাজোয়া যান দু'টি উড়ে গেলো মাইনের আঘাতে। এখন পিছনের ট্যাংক বহর ও সাজোয়া যান থেকে এক দু'জন করে সৈন্য নেমে আসছে।

আলী এ সুযোগটিরই অপেক্ষায় ছিলো।

যখন প্রায় অর্ধেক রুশসৈন্য গাড়ী থেকে নীচে নেমে এলো, গর্জে উঠলো মুজাহিদদের মেশিনগানগুলো। পালাতে চাইলো রুশ বাহিনী, কিন্তু পিছনেও তো দাঁড়িয়ে আছে মুজাহিদ। অল্প কিছুক্ষণ পর রুশ বাহিনী ট্যাংক থেকে কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করে, কিন্তু জবাবে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে পাল্টা হামলা না আসায় কয়েকজন রুশ সৈন্য ট্যাংক থেকে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে আবার কয়েকটি গুলী ছুড়লো। এবারও কোন জবাব না পেয়ে নিশ্চিন্ত মনে অবশিষ্ট সৈন্যরাও বাইরে বেরিয়ে আসলো।

বিপুলসংখ্যক সৈন্য রাস্তায় নেমে আসলে আলী মুজাহিদদেরকে ফায়ার করার আদেশ দেয়। সংগে সংগে রকেটলাঞ্চার ও মেশিনগানের প্রচন্ড ফায়ারিং শুরু হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য রুশ সেনা বুলেটবিদ্ধ হয়ে ছটফট করে মরে যায়। কয়েকজন পালিয়ে সাজোয়া গাড়ীতে আশ্রয় নেয়।

মুজাহিদদের এ আকস্মিক প্রচন্ড হামলায় রুশরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অগত্যা তারা এলোপাথাড়ি কয়েক রাউন্ড গুলী ছুড়ে পিছু হটার উদ্যোগ নেয়।

এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলো মুজাহিদরা। ট্যাংক বহর মোড় ঘুরে পিছন দিকে রওনা হওয়া মাত্র পাহাড়ের উপরে নিয়োজিত মুজাহিদরা রকেট ও মিজাইল হামলা শুরু করে দেয়। রুশ সৈন্যরা দ্রুত ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কারণ, একটু আগে যে পথে তারা নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছেছিলো, এতক্ষণে সেখানে অসংখ্য মাইন ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সামনে অগ্রসর হলে মাইন বিস্ফোরণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। অগত্যা পালাবার চিন্তা বাদ দিয়ে রুশরা মুজাহিদদের প্রচন্ড হামলার মুখে টিকতে না পেরে অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্যাংকের ওপর সাদা পতাকা উড়ায়। সাদা পতাকা দেখে আলী মুজাহিদদেরকে ফায়ার বন্ধ করার আদেশ করে। ফায়ার বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে রুশ ও আফগান কমুনিস্ট সেনারা হাত তুলে ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ী থেকে নেমে আসতে শুরু করে।

এ অভিযানে মুজাহিদরা নব্বই জন রুশ ও আফগান কমুনিষ্ট সেনাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করে। এদের পয়ত্রিশ জনই ছিল আহত। মৃত সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো সত্তর জনেরও বেশী। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং গোলাবারুদও মুজাহিদদের হস্তগত হয়। মুজাহিদদের মধ্যে ট্যাংক চালানোর যোগ্য কেউ না থাকায় সবগুলো ট্যাংকই তারা অকেজো করে ফেলে। এ অভিযানে একজন মুজাহিদও নিহত হয়নি। আহত হয়েছে মাত্র পাঁচজন।

প্রাথমিক তল্লাশীর পর গ্রেফতারকৃত নতুন বন্দীদেরকে পাহাড়ের মধ্যে বাংকার খননের কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। মুজাহিদরা যথা সময়ে পাতাল ফাঁদ নির্মাণের কাজ শেষ করে ফেলে। একই সময়ে বাংকার খননের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে।

বাংকারগুলোর সামনে মুজাহিদরা ছোট ছোট বাগান তৈরী করে বোমা ও রকেটের খোলস দ্বারা টব বানিয়ে নানা জাতের ফুলের চারা রোপন করে। বোমা আর রকেটের খোলসে সুরভিত রং-বেরং-এর ফুল জগদ্বাসীকে একথাই জানান দিচ্ছিলো যে, হে দুনিয়ার মানুষ! চেয়ে দেখ, হানাদার রুশ বাহিনী আল্লাহর সৈনিকদের ওপর নির্বিচারে যে রকেট আর বোমা বর্ষণ করছে, তারা সে রকেট আর বোমার খোলসে ভালবাসা, শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক ফুল উৎপাদন করে ঘোষণা দিচ্ছে যে, তাদের সব চেষ্টা-সাধনা-ত্যাগ-তিতীক্ষা ও স্বাধীনতা বিশ্ববাসীর শান্তি আর নিরাপত্তা বিধানের জন্যেই নিবেদিত। রকেট ও বোমার খোলসে আজ ফুল যেমন সৌরভ বিতরণ করেছে, মুজাহিদদের বিজয়ের পর তেমনি ইসলামের সৌরভে সুরভিত হবে সমগ্র বিশ্ব। পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজ করবে শান্তি ও সৌহার্দ্রের পরিবেশ।

মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি ছিল বেশ প্রশস্ত। পাঁচ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এ ঘাঁটিটি তৈরি করা হয়েছিলো। বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিলো পঞ্চাশটি ফাঁড়ি। ফাঁড়িগুলো একটি থেকে অপরটি দূরে হওয়ার কারণে সংবাদ আদান-প্রদানে বেশ সময় লেগে যেত।

আলী এ অসুবিধার কথা আব্দুর রহমানকে জানালে সে বললো, 'সব কটি ফাঁড়িতে টেলিফোনের ব্যবস্থা করতে পারলে আমাদের এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তা ছাড়া সমগ্র প্রদেশে ওয়ারলেস পদ্ধতি চালু করা উচিত, যাতে প্রতিটি কেন্দ্রের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়।'

কিন্তু, টেলিফোন আর ওয়ারলেসের ব্যবস্থা হবে কোত্থেকে? আলী জিজ্ঞেস করলো।

আব্দুর রহমান কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, কিছু সরঞ্জাম তো আমরা পাকিস্তান থেকেই ক্রয় করতে পারি। এর ব্যয় সংকুলানের জন্যে সে সব অলংকার বিক্রি করা যেতে পারে, যা মহিলারা জিহাদ ফান্ডে দিয়েছিলো। আর কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে রাশিয়ানদের ওপর হামলা করে। আমাদের নিকটস্থ রুশ ছাউনিটির ষ্টোরে সফল আক্রমণ চালাতে পারলে আমরা অস্ত্র তো পাবোই, বেশ কিছু টেলিফোন এবং ওয়ারলেসও পেয়ে যেতে পারি। তারপর যথাস্থানে টেলিফোনের লাইন সংযোগের জন্যে আছি আমি আর আব্দুল্লাহ। এ কাজ আমরা দক্ষতার সাথেই করতে পারবো।

আলী এ পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা জানিয়ে সমস্ত অলংকার আব্দুর রহমানের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'সরঞ্জাম যা কিছু আনতে হয় শীঘ্র আনিয়ে নাও। এর ফাঁকে আমি নিকটের ছাউনির ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনাটা পাকা করে ফেলি।'

আব্দুর রহমান ওয়ারলেস সরঞ্জামের তালিকা দিয়ে তিনজন মুজাহিদকে পেশোয়ার পাঠালো। এদিকে রুশ সেনাদের গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য নিকটবর্তী

ছাউনিতে মুজাহিদদের কোন গুপ্তচর না থাকায় আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী করার ব্যাপারে আলী বেশ সমস্যায় পড়ে গেলো। কারণ, গুপ্তচরের সহযোগিতা ছাড়া ছাউনির ষ্টোরে হামলা করা অসম্ভব ব্যাপার।

আপনি গ্রেফতারকৃত আফগান সেনা অফিসার আব্দুল ওয়াহীদ এর সাথে কথা বলুন। তার ইচ্ছে, যে কোন মূল্যে সে তার বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশ নেবে । বোনটি তার বড়ই আদরের।

আব্দুর রহমানের এ প্রস্তাবে আলী সম্মত হলো। তাই আবদুল ওয়াহিদকে ডেকে বললো, শুনতে পেলাম, তুমি নাকি তোমার বোনের বিয়েতে অংশ নেয়ার জন্যে মুক্তি পেতে চাও। আমাদের কিছু সহযোগিতা করলে আমরা তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারি।

আপনি যা বলবেন সবই আমি মানতে প্রস্তুত আছি। আব্দুল ওয়াহিদ জবাব দেয়।

আলী বললো, রুশ ছাউনির ওপর হামলা করে আমরা অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি দখল করতে চাই। তাই ছাউনির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে তোমার সাহায্য প্রয়োজন।

ছাউনির ওপর হামলা করা, তা-ও আবার অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জামাদি লাভ করার জন্যে, আপনাদের পক্ষে এটা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনার এ হামলা সফল হবে কিনা। আমার তো মনে হয়, এ কাজ করতে গেলে মুজাহিদদের যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। আব্দুল ওয়াহিদ জবাব দেয়।

তা অবশ্য আমাদের জানা আছে। তোমার কাছে পরামর্শ নয়-তথ্য চাই। আলী বললো।

এবার আব্দুল ওয়াহিদ কাগজ ও পেন্সিল দিয়ে নকশা এঁকে আলীকে বুঝাতে শুরু করে। সে বললো, অস্ত্রের ডিপো হলো ছাউনির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। রাতের বেলাও এখানে অন্ততঃ আধা ডজন সৈন্যের পাহারা থাকে। এর উত্তর দিকে এক ফার্লং ব্যবধানে অন্যান্য সরঞ্জামাদির ডিপো। এর সাথেই তাদের খাবারের ষ্টোর। ছাউনির দক্ষিণ দিকে ময়লা পানির ড্রেন। একটু অগ্রসর হয়েই ড্রেনটি ডানে মোড় নিয়েছে। তার সাথেই ছাউনির ভেতরে কবরস্তান। অস্ত্রের ডিপোটি কবরস্তান থেকে বেশী দূরে নয়। করবস্তানে পাহারা থাকে না বললেই চলে। পূর্ব দিকে রাশিয়ান সৈন্য। ছাউনিতে রাশিয়ান-আফগান সৈন্যদের সংখ্য ছ' হাজারেরও বেশী।

আরো কয়েকটি প্রশ্ন করে তাকে পুনরায় জেলে পাঠিয়ে দেয়ার সময় আলী বললো, আব্দুল ওয়াহিদ! তোমার তথ্য যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে শুধু তোমাকেই শাস্তি দেয়া হবে না-তোমার পরিবারের লোকদেরকেও এখানে এনে বন্দী করে রাখা হবে।

আপনাকে আমি যে সব তথ্য দিয়েছি, আমার জানা মতে তা সঠিক, আশা করি আপনিও আপনার ওয়াদা পূরণ করবেন।

আব্দুল ওয়াহিদের জবাব শুনে আলী তাকে বললো, তোমার সব তথ্য সঠিক প্রমাণিত হলে আমি নিঃসন্দেহে আমার ওয়াদা পূরণ করব। তবে এখান থেকে বন্দীশালায় চলে যাওয়ার পরও তোমার গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য মনে পড়লে সংগে সংগে এসে আমাকে তা অবহিত করবে।'

পরদিন আব্দুল ওয়াহিদ পাহারাদার মুজাহিদকে বলল যে, সে আলীকে জরুরী একটি সংবাদ দিতে চায়। বিষয়টি আলীকে জানানো হলে সংগে সংগে সে আব্দুল ওয়াহিদকে ডেকে পাঠায়।

আব্দুল ওয়াহিদ এসে জানালো, ষ্টোরের খানিকটা দূরে ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারের বাসা। আমার জানা মতে তিনি মুজাহিদদের সমর্থক। প্রয়োজনে তার থেকেও আপনি সহযোগিতা নিতে পারবেন।

রাতে ছাউনির ওপর আক্রমণ করার জন্যে আলী দু'শ মুজাহিদকে প্রস্তুত করে তাদেরকে দু'টি দলে ভাগ করে নেয়। একশ' পচিশ জন মুজাহিদকে একটি গ্রুপে ভাগ করে দরবেশ খানকে তার কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। তাকে বলে দেয়া হলো, তিনি যেন যথাসময়ে ছাউনির পূর্বপ্রান্তে পৌঁছেন এবং রাত তিনটার সময় পূর্বে দিক থেকে ছাউনির উপর গোলা বর্ষণ শুরু করে দেন। এতে শত্রুপক্ষের বেশীর ভাগ সৈন্য ছাউনির পূর্ব দিকে চলে যাবে আর পশ্চিম দিকটা শূণ্য হয়ে পড়বে। আরো বলে দেয়া হলো, তিনি যেন ছাউনির বেশী কাছে না যান এবং গোলা বর্ষণ করার সময় লক্ষ্য রাখেন, যেন তাদের নিক্ষিপ্ত গোলা পূর্ব দিকেই পড়ে, পশ্চিমে না যায়।

দরবেশ খান তার বাহিনী নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগে রওয়ানা হয়ে যান। কারণ, তাকে অনেক দীর্ঘ পথ ঘুরে ছাউনির অপর দিকে গিয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান নিতে হবে।

আলী তার বাহিনী নিয়ে এক সাথে যোহর নামায আদায় করার পর রওনা হলো।

রাত দু'টো। আলী সাথী মুজাহিদদের নিয়ে শত্রু ছাউনির নিকটে পৌঁছে গেছে। ছাউনির কাছে গিয়ে তাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলে অগ্রসর হতে হচ্ছিলো। কারণ, ছাউনির আশে-পাশে সাধারণতঃ বিপুল সংখ্যক মাইন বিছিয়ে রাখা হয়।

রাত পৌনে তিনটার দিকে মুজাহিদরা ধীর পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে অস্ত্রাগার ও ষ্টোরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। অস্ত্রাগারের সাথেই ছিলো ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ীর দীর্ঘ লাইন। মুজাহিদরা সর্ব প্রথম প্রহরীদেরকে কাবু করে ফেলে। প্রহরীদেরকে কাবু করার জন্য খঞ্জর ব্যবহার করা হয়। মুজাহিদরা প্রহরীদেরকে এত দ্রুত ও দক্ষতার সাথে কাবু করে ফেললো যে, একজন পাহারাদারও বিপদ সংকেত দেয়ার সময় পেলোনা।

আলী প্রহরীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেছে, ঠিক এ সময়ে দরবেশ খানের অবস্থান থেকে গোলা বর্ষণ শুরু হয়। মুহূর্তে ছাউনির মধ্যে রীতিমত হুলস্থুল পড়ে যায়। আলী সাথীদের নিয়ে ছাউনির দক্ষিণ-পূর্ব অংশে পজিশন নিয়ে ওঁত পেতে থাকে।

মুজাহিদরা ছাউনির ভেতরেও ঢুকে পড়েছে, তা টের পেয়ে আফগান কমুনিস্ট সৈন্যরা পশ্চিম দিক থেকে উত্তর দিকে সরে যায়। তাছাড়া অধিকাংশ সৈন্য আগে থেকেই পূর্ব দিকে দরবেশ খানের আক্রমণের জবাব দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

এখনই সময়।

অস্ত্র নেয়ার জন্যে শত্রুদের ট্রাক আনা হয়। চারটি ট্রাকে মুজাহিদরা তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সরঞ্জাম বোঝাই করে নেয়। তিনটিতে খাদ্য-দ্রব্য এবং একটিতে অন্যান্য সরঞ্জাম তোলা হলো। নিজেদের দ্রুত সরে পড়ার জন্য মুজাহিদরা চারটি সাজোয়া গাড়ীও নিয়ে নিলো।

এবার ছাউনি থেকে বের হওয়ার সমস্যা। ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারের বাসার বাইরে আলী পূর্বেই কয়েকজন মুজাহিদকে মোতায়েন করে রেখেছিলো।

এবার আলী নিজেই ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, 'আমার ইচ্ছা, আমাদের মাল-পত্রগুলো বিনা রক্তপাতে ছাউনির বাইরে চলে যেতে দেয়া হোক। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা চাই। আমি জানতে পারলাম, আপনি নাকি মুজাহিদদের সমর্থক। এ কারণে আমরা আপনাকে আগাম কিছু বলার প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু মাল বোঝাই ট্রাক এবং মুজাহিদদেরকে এখান থেকে নিরাপদে বের করে নেয়ার জন্যে আপনাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। ছাউনির বাইরে চলে যাওয়ার পরই আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আরো কিছু লোককেও আমরা গ্রেফতার করেছি। আপনার সঙ্গে তাদেরকেও ছেড়ে দেব, যাতে কারো মনে এ সন্দেহ জাগ্রত না হতে পারে যে, আপনি আমাদের সহযোগিতা করেছেন।'

ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার আলীর এ পরিকল্পনার কথা শুনে স্মিত হেসে বললেন, 'আপনার যেমন মর্জি।'

আলী ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারকে নিজের কাছে চালকের পাশের আসনে বসিয়ে নেয়। এ গাড়ীরই পিছনে স্বশস্ত্র মুজাহিদরা বসে যায়। চালকও মুজাহিদ। গায়ে তার সামরিক উর্দি। আরো কয়েকজন মুজাহিদ সামরিক উর্দি পরিহিত ছিল। গ্রেফতারকৃত অন্যান্য কয়েদীদেরকে অন্য একটি গাড়ীতে উঠানো হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারের কারণে সব ক'টি ট্রাক কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিরাপদে ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে। পথে সকল কম্যুনিস্ট পাহারাদার মনে করেছিল, এ ট্রাক ও গাড়ীতে করে সৈন্যরা বুঝি মুজাহিদদের আক্রমণের মুকাবিলা করতে যাচ্ছে। আলী পুরো বাহিনী নিয়ে ছাউনি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ওয়ারলেস মারফত দরবেশ খানকে লড়াই বন্ধ করে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়।

ছাউনি থেকে পাঁচ মাইল দূরে এসে ট্রাকগুলো থামিয়ে প্রথমে ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারকে গাড়ী থেকে নামানো হয়। আলী তার সঙ্গে নির্জনে আলাপ করে। সব শেষে আলী তাকে বললো, 'তিনি যেন ছাউনির ভেতরে মুজাহিদদের স্বার্থে কাজ করেন এবং ছাউনিতে মুজাহিদ বিরোধী কোন পরিকল্পনা নেয়া হলে যথা সময়ে তা অবহিত করেন।'

ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার ওয়াদা করেন যে, 'এ ঘটনার পরও যদি আমার ওপর রাশিয়ানদের আস্তা অটুট থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি মুজাহিদদের জন্যে কাজ করে যাবো। পক্ষান্তরে, এখন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি তারা আমাকে গ্রেফতার করে ফেলে; তাহলেও ভাবনার কোন কারণ নেই। মুজাহিদের সহযোগিতা করার মত আরো বেশ কিছু লোক ছাউনিতে রয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে তোমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব।'

আলী ও ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারের আলাপ শেষ হলে অন্যান্য কয়েদীদেরকেও গাড়ী থেকে নামিয়ে রাজপথের নিকবর্তী কয়েকটি বৃক্ষের সাথে বেঁধে রাখা হয়। ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারকেও একটি গাছের সাথে বাঁধা হয়। কিন্তু, ইচ্ছা করেই আলী দু'জন কয়েদীর হাত একটু ঢিলে করে বাঁধে, যাতে মুজাহিদদের চলে যাওয়ার পর তারা প্রথমে নিজেদের বন্ধন খুলে পরে অন্যান্যদের বন্ধনও খুলে দিয়ে নিরাপদে ছাউনিতে ফিরে যেতে পারে।

অন্যান্য কয়েদীদের সামনে আলী ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তারকে যথেষ্ট অপমান করে। পরে তিরস্কার করে সব কয়েদীদের উদ্দেশ্যে বলে,

'সত্যিই যদি তোমরা আফগানী হয়ে থাক, তাহলে হানাদার রাশিয়ানদের সঙ্গ ত্যাগ করে মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করো। রাশিয়ানদের স্বার্থে তোমরা আপন ভাইদেরকে হত্যা করছো, জনসাধারণের উপর নির্যাতন চালাচ্ছো। কিন্তু এ কথা চিন্তা করে দেখছোনা যে, বেঈমান রুশ বাহিনী আমাদের দেশের ওপর কত জুলুম করছে। আমাদের কত ক্ষতি হচ্ছে।

তোমাদের অপেক্ষা সে সব রাশিয়ান মুসলিম বহু গুণে উত্তম, তারা যখন একথা জানতে পারে যে, তাদের প্রতিপক্ষ মুসলমান, তখন নিজেদের অস্ত্র মুজাহিদদের জন্যে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়ে রিপোর্ট দেয় যে, মুজাহিদদের হাতে তাদের পরাজয় হয়েছে। আমরা চলে যাওয়ার পর তোমরা চিন্তা করে দেখ, রাশিয়ানদের দাসত্ব উত্তম না মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও ইসলামকে সমুন্নত করার লড়াই উত্তম।

বিবেক যদি রাশিয়ানদের দাসত্বের জন্যে তোমাদেরকে তিরস্কার করে, তাহলে মুজাহিদদের সহযোগিতার পথ তোমাদের জন্য ছাউনির ভিতরে বাইরে সবখানেই উম্মুক্ত। যার যেখানে খুশী সেখানে থেকেই তোমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারো।'

ট্রাকগুলো এখনো মুজাহিদ মারকাজ থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। এ সময়ে শত্রুপক্ষের বেশ কিছু জঙ্গীবিমান আক্রমণ করে বসে। আলী বিমান দেখামাত্র ট্রাকগুলোকে নিকটস্থ একটি বাগানের মধ্যে দাঁড় করানোর আদেশ দিয়ে নিজে একটি খালি গাড়ী নিয়ে দ্রুত সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়ে যায়। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গাড়িটি একটি খোলা জায়গায় রেখে পার্শ্ববর্তী গাছের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

বিমানগুলো গাড়ির ওপর এবং তার আশে-পাশের বিস্তৃত এলাকায় এলোপাথাড়ি বোম বর্ষণ করতে থাকে। কয়েকটি বোমা আলীর খুব কাছে পতিত হয়। কিন্তু আলী যে

ঝোপে বসেছিলো তা এতই ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল যে, একেবারে নিকটে পতিত বোমার ছিন্ন খন্ডও তার গায়ে লাগলো না।

প্রচন্ড বোমা বর্ষণ করে কিছুক্ষণ পর বিমানগুলো ফিরে গেলে আলী ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাগানে এসে দাঁড়ায়। আলীকে জীবিত দেখে মুজাহিদরা আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করে।

তখন সকাল ন'টা। রাত থেকে এ পর্যন্ত মুজাহিদদের কিছুই খাওয়া হয়নি। সকলেই ক্ষুধার্ত। ছোট্ট এ বাগানটির মালিক ছিল বৃদ্ধ এক কিষাণ। বৃদ্ধ তখন বাগানেই বসেছিলো। আলী তাকে বললো, 'চাচা আমাদেরকে কিছু ফল পেড়ে দিন।'

বৃদ্ধ বলল, বেটা! যত প্রয়োজন তোমরা নিজেরা পেড়ে খাও, আমার কোন নিষেধ নেই।

আলী ও অন্যান্য মুজাহিদরা গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে শুরু করে। আহার শেষে আলী বৃদ্ধকে ফলের দাম জিজ্ঞেস করলে বৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন, 'বেটা! মুজাহিদদের থেকে ফলের মূল্য নেয়া অন্যায়। আমি বৃদ্ধ ও নেহায়েত গরীব লোক। মুজাহিদদের কোন সেবা আমি করতে পারছিনা। আমার পরম সৌভাগ্য যে, মুজাহিদগণ কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাগানে অবস্থান করেছেন এবং আমার বাগানের ফল তাদের কিছুটা হলেও উপকারে এসেছে। হায়! আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকতো, তাহলে আমি মুজাহিদদের আরো খেদমত করতে পারতাম।'

'চাচা! মুজাহিদদের প্রতি আপনার এ আন্তরিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আল্লাহ নিঃসন্দেহে আপনাকে এর প্রতিফল দান করবেন। আপনার মত মহান ব্যক্তিদের দু'আও মুজাহিদদের বিজয়ে বিরাট পুঁজি। কিন্তু, আমরা যদি এভাবে বিনা মূল্যে ফল খেতে শুরু করি, তাহলে আমাদের ও রাশিয়ানদের মাঝে পার্থক্য থাকলো কই? তাছাড়া আমরা যে পয়সা ব্যয় করি তাও তো আপনাদের মত মহান ব্যক্তিদেরই অনুদান। অনুগ্রহপূর্বক আপনি ফলের মূল্যটা নিয়ে নিন।'

আলীর এ কথা শুনে বৃদ্ধ ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমার মত অসহায়কে যদি আপনি অপমানই করতে চান তো পয়সা দেয়ার পরিবর্তে আমার মাথায় জুতা পেটা করুন। জুতা খাব, তবুও পয়সা নেব না। মুজাহিদদের পায়ের পরশ লাগার বরকতে আমি এ গোটা বাগান আল্লাহর নামে দান করে দিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা দেশের স্বার্থে নিজেদের জান উৎসর্গ করছেন, আর আমি বৃদ্ধকে বুঝি বাগানের ফলের কয়েকটি দানাও উৎসর্গ করতে দেবেন না!'

বৃদ্ধ কিষাণের আত্মাভিমানের সামনে আলী নির্বাক হয়ে যায়।

মুজাহিদ সকলে বৃদ্ধকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়।

আসরের সময় দরবেশ খান তার বাহিনী নিয়ে কেন্দ্রে ফিরে আসলেন। অভিযানে দরবেশ খানের বাহিনীর পাঁচ জন মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেছে। দু'জন মাইন

বিস্ফোরণে আর তিনজন গুলীবিদ্ধ হয়ে। আহত হয়েছে বার জন। মুজাহিদদের জন্যে এটা তেমন কোন ঘটনা ছিল না। বরং ছাউনীতে হামলা করে সফলতার সাথে ফিরে আসতে পারাটাই ছিল তাদের জন্যে বিরাট সাফল্য। মুজাহিদদের এ হামলার ফলে রাশিয়ানদের মধ্যে তীব্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা লজ্জিত হয় সকলের কাছে।

চতুর্থ দিন ছাউনী থেকে এক জন সৈন্য পালিয়ে এসে জানালো যে, তাকে ক্যাপ্টেন আব্দুর সাত্তার পাঠিয়েছেন। খবর হলো, মুজাহিদদের গোলাবর্ষণে রাশিয়ানদের বেশীর ভাগ ব্যারাক বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং কয়েক হাজার রুশ সৈন্যসহ অসংখ্য আফগান কম্যুনিস্ট সেনা মারা গেছে। ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার সম্পর্কে সে জানালো যে, প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে তাকে আগের পদে বহাল রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে, কয়েকজন রাশিয়ান ও বেশ কিছু আফগান সেনা অফিসারকে চাকুরী থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে এবং ঘটনা তদন্তের জন্য কাবুল থেকে রুশ অফিসার এসেছে।

মুজাহিদ কর্তৃক ছাউনীর ভিতরে গিয়ে হামলা করা এবং অস্ত্রের ডিপো লুট করার ঘটনা কাবুল সরকারের পক্ষে গোপন রাখা সম্ভব ছিলোনা। এ খবর শুধু বিশ্বের সকল দেশের রেডিও টিভি স্টেশন থেকেই প্রচার করা হয়নি,বরং বিভিন্ন দেশের বহু পত্র-পত্রিকায়ও তা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। হেডকোয়ার্টার থেকে মুজাহিদদের চীপ কমান্ডার এ দুঃসাহসিক সফল অভিযানের জন্যে আলীকে মোবারকবাদ জানান এবং সাথে সাথে ভবিষ্যতে কোন রুশ ছাউনীতে আক্রমণ না করার পরামর্শ দেন। কারণ ছাউনীর ভিতরে গিয়ে আক্রমণ করে তা দখলে আনার ব্যাপারে কেন্দ্র থেকে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তাই নির্দেশ হলো, জেনে শুনে অযথা যেন মুজাহিদদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া না হয়।

ওয়ারলেস এবং টেলিফোনের বেশ কিছু সরঞ্জাম ছাউনী থেকে অর্জিত হয়েছিলো এবং আরো কিছু সরঞ্জাম কয়েক দিনের মধ্যে পাকিস্তান থেকেও এসে গেলো। এগুলোর মাধ্যমে আব্দুর রহমান ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ কেন্দ্রের সব ক'টি পোস্টের মাঝে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করে। এর আগে আলীর কাছে ওয়ারলেস সেট ছিল শুধু দু'টি। তাও আবার মাত্র কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত কাজ দিত। এবার আলী ছাউনী থেকে প্রাপ্ত ওয়ারলেস সেটগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কেন্দ্র ও শহরের মুজাহিদদের জন্যে গোপন তথ্য সরবরাহকারী লোকদের হাতে পৌঁছে দেয়। এবার এ কেন্দ্র থেকে হেড কোয়ার্টারের চীফ কমান্ডারের সাথে আলীর রীতিমত আলাপ আলোচনা চলতে থাকে।

আলী আব্দুল ওয়াহিদকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মুক্ত করে দেয়। মুক্তি পেয়ে আব্দুল ওয়াহিদ বললো, সে তার বোনের বিয়ের পরে মুজাহিদদের নিকট ফিরে আসবে এবং অবশিষ্ট জীবন আল্লাহর পথে জিহাদে উৎসর্গ করবে।

এ অভাবনীয় বিপর্যয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে রুশ অফিসার আলীর মারকাজের উপর বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়। এ অভিযান সফল করে তোলার জন্যে তারা অন্যান্য ছাউনী থেকেও অভিজ্ঞ সৈন্য তলব করে এবং মারকাজের ওপর বোমা হামলা

আরো জোরদার করে। এদিকে আলী গোয়েন্দা মারফত এ আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কিত সব তথ্যই জেনে ফেলে।

আলী আগেই পাতাল ফাঁদে মুজাহিদদের জন্যে বেশ কিছু পাকা ও মজবুত পরিখা তৈরী করে রেখেছিলো। বাইরে থেকে এ পরিখা আদৌ দৃষ্টিগোচর হতো না। পাতাল ফাঁদগুলো ছিলো খুব গভীরে। ভিতরে যাতায়াতের মাত্র কয়েকটি পথ। তাও শুধু সে মুজাহিদদেরই জানা ছিলো, যাদেরকে সেগুলোর দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা হয়েছিলো।

যে এলাকায় পাতাল ফাঁদ তৈরী করা হয়েছিলো, সেখানে পুরোদমে ফসলাদি চাষ করা হতো। এসব ফাঁদ থেকে বের করা মাটিগুলো অনেক দূরে নিয়ে ফেলা হয়েছিলো। বহিরাগত কারো একথা অনুমান করার উপায় ছিলো না যে, এখানে মাটির নীচে বড় ধরনের কোন ফাঁদ ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।

আলী পাতাল ফাঁদগুলোর নিকটবর্তী বড় রাস্তায় শুধু মাইনই বিছিয়ে রাখেনি, বরং পাকা সড়কের নীচে বড় বড় গর্তও খনন করিয়ে রেখেছিলো, যাতে শত্রু পক্ষ থেকে হামলার জন্যে আগমনকারী ট্যাংক বহর এখানে এসে ধ্বসে যায়।

শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আলী ও অন্যান্য মুজাহিদরা শত্রুবহর আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলো। শত্রুপক্ষের বিমান হামলা অত্যন্ত তীব্রভাবে চলেছে। একবার তো শত্রুদের জঙ্গী বিমানগুলো একটানা সারা রাত ও সারা দিন মারকাজের ওপর বোমাবর্ষণ করে। এত বেশী বোমাবর্ষণ হচ্ছিলো যে, গর্ত থেকে বের হয়ে মুজাহিদরা না খানা খাওয়ার সুযোগ পেলো, না নামায আদায় করা সম্ভব হলো। এ বোমা হামলায় মুজাহিদদের মসজিদটি বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং বিমানবিধ্বংসী তোপের দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ ও অপর কয়েকজন আহত হয়।

এ ধ্বংসাত্মক বোমা বর্ষণ দেখে আলী আব্দুর রহমানকে বললো, আমার মনে হয়, শত্রু বাহিনী আজ কোন এক সময় স্থল আক্রমণ করবে নিশ্চয়।

আর গোটা বহর পাতাল ফাঁদে আটকে যাবে। আলীর অসম্পূর্ণ কথাটা সম্পূর্ণ করে আবদুর রহমান ।

পর দিন এগারটার সময় মুজাহিদরা আলীকে শত্রুবহর আগমনের খবর দেয়। শত্রুবহর মোকাবিলার দায়িত্বে নিয়োজিত মুজাহিদের সংখ্যা ছিলো শুধু নব্বই জন। তাদের বিশজন বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত ছিলো। তাদের দায়িত্ব ছিল, শত্রু সৈন্যদেরকে কৌশলে ফাঁদে এনে আটকে দেয়া। অবশিষ্ট সত্তর জনের দায়িত্ব ছিলো ট্যাংক ও গাড়ীতে রয়ে যাওয়া অফিসার ও অন্যান্য সৈন্যদেরকে সুযোগ মত যমের হাতে তুলে দেয়া।

শত্রুবহরের সহযোগিতায় ছিলো বেশ কিছু হেলিকপ্টার ও জঙ্গীবিমান। বিমানগুলো আশেপাশের বিস্তৃর্ণ খোলা ময়দানে বোমাবর্ষণ করছিলো আর হেলিকপ্টারগুলো চতুর্দিকে চক্কর দিচ্ছিলো।

মুজাহিদদের পাতাল ফাঁদের নিকটে পৌঁছে কয়েকটি ট্যাংক খননকৃত গর্তে ধসে যায়, কয়েকটি মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়।

বিপদ টের পেয়ে গোটা বহর থেমে যায় এবং আগের মত এদিক-ওদিক এলোপাথারী প্রচন্ড বোমাবর্ষণ করতে শুরু করে। হেলিকপ্টারগুলো আকাশে টহল দিতে থাকে।

অপরদিকে নিরাপদ পরিখায় বসে মুজাহিদরা সকৌতুকে এসব দৃশ্য অবলোকন করছে।

শত্রু সৈন্যরা ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ী থেকে বের হয়ে সামনে অগ্রসর হতে শুরু। যে বিশজন মুজাহিদ শত্রু সৈন্যদেরকে ধাওয়া করে ফাঁদে ফেলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো, তাদের কয়েকজন পরিখা থেকে বের হয়ে ফায়ার করতে করতে পাতাল ফাঁদের দিকে পিছিয়ে আসতে থাকে। কয়েক জন শত্রু সৈন্য তাদেরকে ধাওয়া করতে শুরু করে। এদিকে পাতাল ফাঁদের দায়িত্বে নিয়োজিত মুজাহিদরাও বের হয়ে অনুরূপ ফায়ার করতে শুরু করলে অবশিষ্ট সৈন্যরা তাদের দিকে ধেয়ে আসে।

এভাবে মুজাহিদদেরকে ধাওয়া করতে এসে ওরা পাতাল ফাঁদে এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, পুনরায় বের হওয়া আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ট্যাংক ও সাজোয়া গাড়ীতে রয়ে যাওয়া সৈন্যরা বেশ কিছুক্ষণ তাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করে। কিন্তু, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও ওরা ফিরে না আসায় তারাও ওদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। মুজাহিদরা ধাওয়া করে তাদেরকেও নিয়ে ফাঁদে নিক্ষেপ করে।

এবার ট্যাংক ও অন্যান্য গাড়ী এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের উপর মুজাহিদরা রকেট লাঞ্চার ও মেশিনগানের আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকটি গাড়ী ও ট্যাংকে আগুন ধরে যায়। রুশ সৈন্যরা ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কারণ তখন মুজাহিদদের কবল থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

এ আক্রমণে অধিকাংশ সৈন্য মারা যায় এবং অবশিষ্টরা মুজাহিদদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া একজনের পক্ষেও সম্ভব হলো না। গ্রেফতার হলো মাত্র পনেরজন।

আক্রমণকারী শত্রুদের গোটা বহর ধ্বংস হওয়ায় মুজাহিদরা সীমাহীন আনন্দিত হয় এবং নফল নামায পড়ে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানায়।

আলী ওয়ারলেস মারফত হেডকোয়ার্টারকে এ সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করে। খবর পেয়ে চীফ কমান্ডার অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সকল মুজাহিদ বিশেষ করে আলী ও আব্দুর রহমানকে মোবারকবাদ জানান।

অপরদিকে গোটা বহর উধাও হয়ে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে রুশ অফিসার খুবই পেরেশান ও অস্থির হয়ে পড়ে। তাদের কিছুই বুঝে আসছিলো না যে, গোটা সৈন্যবহর কিভাবে ধ্বংস হলো এবং লাশগুলোই বা কোথায় গেলো।

লাপাত্তা হয়ে যাওয়া বহরটির অনুসন্ধানে রাশিয়ানরা আরেক সৈন্য বহর প্রেরণ করে। কিন্তু, এদেরও প্রথমটির মত দশা ঘটে। এবার তৃতীয় বহর পাঠানোর আগে তারা পাতাল ফাঁদের এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অত্যন্ত সুদক্ষ বিশেষ কমান্ডোজ প্রেরণ করে। কিন্তু এ কমান্ডোজও চিরতরে পাতাল ফাঁদে গুম হয়ে যায় কিংবা মুজাহিদদের হাতে মারা পড়ে।

রাশিয়ানদের আর পাতাল ফাঁদ সম্পর্কে কোন তথ্য লাভ করা সম্ভব হলো না। অগত্যা তারা তৃতীয় বহরটি প্রেরণের সিদ্ধান্ত মুলতবী রেখে বিমান হামলা আরো জোরদার করে।

পাতাল ফাঁদে কয়েক হাজার রুশ সৈন্য মারা পড়া মুজাহিদদের জন্যে ছিলো এক বিরাট সাফল্য। অপর দিকে আলীর এ ক্যাম্পটি যেভাবেই হোক ধ্বংস করতে হবে, এ হলো রাশিয়ানদের জীবন-মরণ প্রতিজ্ঞা। এর জন্যে তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কাবুলে রুশ কমান্ডারদের মিটিং বসলে সেখানে সকলের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এটাই ছিলো যে, আমাদের একে একে দু'টি বহর মুজাহিদরা কিভাবে ধ্বংস করল! কোথায় গেলো তাদের লাশগুলো!

আলোচনা প্রসঙ্গে এক রুশ অফিসার বললো, 'আলীর মারকাজটি দখলে আনার জন্যে আমরা যে ক'টি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলাম, তার সব ক'টিই ব্যর্থ হয়েছে। মারকাজের উপর যে পরিমাণ বোমা বর্ষণ করা হয়েছে, তাতে মারকাজের কিছুই তো অক্ষত থাকার কথা ছিলো না। অথচ মুজাহিদদের তৎপরতায় এতটুকু পরিবর্তনও আসলো না! এতে মনে হচ্ছে, আলী মানুষ নয়-আস্তো একটা জিন। যখন যেখানে ইচ্ছা সফল অভিযান চালিয়ে নিরাপদে সে ফিরে যেতে সক্ষম।

অপর এক অফিসার বললো, 'এ সে আলী, যে গত দেড় বছর আগে গরদেজে কেজিবি ও খাদের দফতর থেকে-যেখানে একটি চড়ুই পর্যন্ত ঢুকতে পারে না-মেজর ফাইয়াজ ও তার সাথীদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলো।'

অতপর পশ্চিম আফগানিস্তানের রাশিয়ান সেনা কমান্ডার কর্ণেল যেবুনভ ঘোষণা করে যে, 'যে ব্যক্তি আলীকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে দশ লাখ রুবল পুরস্কার দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি রুশ সৈন্য বহর দু'টোর ধ্বংসের ব্যাপারে তথ্য দিতে পারবে সে পাবে পাঁচ লাখ রুবল পুরস্কার।'

তখন রাত। আলী, আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইসলাম ও অন্যান্য মুজাহিদ পরস্পর আলাপচারিতায় রত। পাশেই রেডিও অন করা ছিলো। রেডিওতে খবর শুরু হলে সবাই সেদিকে মনোনিবেশ করলো। শুরুতেই ছিলো পাকিস্তানে রুশ হায়েনাদের বোম্বিং এর

খবর। এর আগেও রুশ এজেন্টরা পেশোয়ার, লাহোর, করাচীসহ পাকিস্তানের বহু শহরে বোমা হামলা করেছে। নিরপরাধ পাক-নাগরিকদের ওপর রুশ আগ্রাসীদের বোমা হামলায় আলীর খুব দুঃখ হলো। সে সাথীদের উদ্দেশে বললো, 'রুশ বাহিনী কত জঘন্য জালেম। ঘরছাড়া উদ্বাস্তু আফগানীদের জায়গা দেয়ার অপরাধে শয়তান রুশীরা বে-কসুর পাকিস্তানীদের ওপর অত্যাচার করছে। রুশ জালেমদের এহেন অত্যাচারের সময়োচিত প্রতিশোধ নিতে আমার খুব ইচ্ছে করে।'

সাথী মুজাহিদরাও আলীর সাথে সমবেদনা প্রকাশ করলো।

পরদিনও আলী একা একা ভাবছিলো, কিভাবে নিরপরাধ পাকিস্তানীদের ওপর রুশ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া যায়। রুশ নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের শহরাঞ্চলে বোমা হামলা করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়, তবে এতে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। আলী সিদ্ধান্ত নিলো, দখলকৃত রুশ বাহিনীর সেনা ছাউনী ও কম্যুনিস্ট নিয়ন্ত্রিত পাড়াগুলোতে গেরিলা আক্রমণ ও বোমা হামলা করে পাকিস্তানে রুশ আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আলী কিছুসংখ্যক দক্ষ মুজাহিদকে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করলো।

আলীর সংকল্পে সকল মুজাহিদ একমত হলো।

রুশ বাহিনীর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা বেশ কিছু সাজোয়া যান মুজাহিদদের কাছে যদিও ছিলো, কিন্তু এগুলো ব্যবহার করে সেনা ছাউনীতে হামলা করা ছিলো দুঃসাধ্য। এজন্য আলী মুজাহিদ অপারেশন টিমের জন্য কিছু সংখ্যক মোটর সাইকেল এবং ঘোড়া সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিলো। এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোটর সাইকেল ও ঘোড়া সংগ্রহ করা হলো। বিশটি অশ্ব ও পনেরটি মোটর সাইকেলসজ্জিত দু'টি গেরিলা অপারেশন টিম আলী এক মাসের মধ্যে তৈরী করে ফেললো।

গভীর রাতে অশ্বারোহী বাহিনী ক্ষীপ্র গতিতে কোন না কোন ব্যারাকে হামলা করে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে অস্ত্র, গোলা ও খাবার সরঞ্জামাদি নিয়ে ফিরে আসতো।

দিনের বেলা দ্রুতগামী মোটর সাইকেল টিম শহরে প্রবেশ করে থানা, পুলিশ ফাঁড়ী ও সরকারী দফতরে হামলা চালালে রুশ বাহিনীর প্রতিরোধে শহরের বাইরে চলে আসতো।

এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই অশ্বারোহী বাহিনী ও মোটর সাইকেল টিম রুশ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি করলো।

একদিন আলী খবর পেলো, আগামী সপ্তাহের এক নির্দিষ্ট দিনে রুশ বাহিনী শহরে রুশ বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে কুচ কাওয়াচ, প্যারেড ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে রাজপথে। আলী সিদ্ধান্ত নিলো, ওদের বিপ্লব বার্ষিকী অনুষ্ঠান ও মার্চপাস্টের উল্লাস বোমা ফাটিয়ে ও রকেট আক্রমণ করে স্তব্দ করে দিতে হবে। রাস্তায় মাইন পুঁতে, টাইম বোমা স্থাপন করে আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে কম্যুনিস্ট নাস্তিকদের উল্লাসের মজা চিরতরে মিলিয়ে দিতে হবে।

মুজাহিদদের একান্ত আপনজন গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহকে ওয়ারলেসে আলী নির্দেশ দিলো, বিপ্লব বার্ষিকী অনুষ্ঠানের পুরো তথ্য যেন সে যথাসময়ে মুজাহিদ ক্যাম্পে সরবরাহ করে।

আলী দু'জন মুজাহিদকে রাজধানীতে পাঠালো, যেন শহরের কোন গলিতে যে কোন মূল্যে তারা একটি ঘর ভাড়া নিয়ে নেয়।

আলী মাত্র তেরজন সুদক্ষ মুজাহিদকে ডেকে তার পরিকল্পনার কথা জানালো। এরাই তার এই শ্বাসরুদ্ধকর দুর্ধর্ষ অভিযানের সাথী হবে।

মুজাহিদ ক্যাম্পের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কমান্ডারদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে আলী নির্দিষ্ট দিনের দু'দিন আগেই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লো। সুপরিকল্পিত অপারেশন সফলভাবে পরিচালনার জন্য দু'দিন আগেই শহরে উপস্থিত হলো সে।

আব্দুর রহমানকে বলে গেলো, বাকী সাথীদের নিয়ে সে যেনো নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগে শহরে হাজির হয়। সাথে করে হ্যান্ড গ্রেনেড, টাইম বোমা এবং রুশ সেনাদের ব্যবহৃত সামরিক উর্দি নিয়ে আসে।

এক বৃদ্ধ-রোগীর বেশ ধরে আলী শহরে প্রবেশ করে মুজাহিদদের ভাড়া করা বাড়ীতে হাজির হলো। ভাড়া করা বাড়ীটিকে নিরীক্ষা শেষে আলী গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে রুশ বাহিনীর প্রোগ্রাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলো। দ্বিতীয়তঃ রাস্তায় বেরিয়ে যেসব স্থানে টাইমবোমা পুঁতে রাখা যায়, সে সব জায়গার একটি নক্সা মনে মনে তৈরী করে নিলো।

ফিরে এসে আলী দু'গ্যালন প্রেট্রোল ও ছয়টি চাটাই সংগ্রহ করলো। সাদা কাগজে বিশটি বিজ্ঞপ্তি লিখলো। বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছে, 'যেসব লোক বিপ্লব বার্ষিকী অনুষ্ঠানে শরীক হবে, কোন অঘটনের জন্য তারা নিজেরাই তার দায়িত্ব বহন করবে।'

বিজ্ঞপ্তিগুলো নিয়ে আলী শহরে বেরিয়ে চারজন অশিক্ষিত লোকের হাতে কিছু পয়সা ধরিয়ে দিয়ে বললো, সবার নজরে পড়ে এমন দর্শনীয় দেয়ালে এসব পোষ্টার লাগিয়ে দেবে। বিশটি পোষ্টার একজনকে দিয়েই সাঁটানো যেতো, কিন্তু আলী ভাবলো, এতে সময় বেশী লাগবে এবং মানুষের নজরে পড়ে যাবে পোষ্টার সাঁটানোর কাজে নিয়োজিত লোকটি। গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ধরা পড়ে ঐ ব্যক্তির গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

ভাড়াটে চার ব্যক্তি আলীর নির্দেশ মত কিছু সময়ের মধ্যে সবগুলো পোষ্টার সেঁটে দেয়।

ভাড়া বাড়ীতে ফিরে আসার আগেই আব্দুর রহমান সাথীদের নিয়ে এখানে পৌঁছে গেলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল মুজাহিদ এ বাড়িতে বিশ্রাম নিলো।

রুশ বাহিনীর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপনের চূড়ান্ত কর্মসূচী বিস্তারিত জানার জন্যে আলী সন্ধ্যায় আবার ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে। উবায়দুল্লাহ

জানালো, 'রাজপথে র‍্যালী ও আনন্দমিছিল নির্বিঘ্ন করার জন্য এখন থেকে সারা শহরে কড়া পুলিশী প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া আপনার বিজ্ঞপ্তি পাঠের পর থেকে শহরে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে কঠোরভাবে তল্লাশীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

রাতের কখন থেকে শহরে ঝাড়ু ও পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়? আলী তাকে জিজ্ঞেস করলো।

এক ঘন্টা পর উবায়দুল্লাহ জানালো, 'শেষ রাতে রাজপথ পরিস্কারের কাজ শুরু হবে। আজ রুশ সোনাবাহিনী পরিচ্ছন্নতার কাজ তদারক করবে।'

আব্দুর রহমান আলীকে বললো, 'খোদ গোয়েন্দা প্রধানই যেহেতু আপনার অনুগত সহায়তাকারী, তখন এ ঘর ভাড়া করার কি প্রয়োজন ছিলো, আপনি তার বাড়িতে উঠলেই তো পারতেন। তাহলে ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগের ঝামেলা পোহাতে হতো না আমাদের।'

আলী বললো, 'ভাই আব্দুর রহমান! গোয়েন্দা প্রধানকে এর পর আরো কঠিন কাজ করতে হবে। আমরা অপারেশন শেষ করে চলে গেলে এই বাড়িটি জ্বালিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি চাই না, আমাদের এতো বড় একজন সাহায্যকারী সহসা ধরা পড়ে সহযোগিতার পথটি রুদ্ধ হয়ে যাক।'

রাত দু'টার সময় মুজাহিদরা অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। চাটাইয়ের মধ্যে টাইম বোমাগুলো যথাযথভাবে প্যাকিং করে দ্রুত দহনযোগ্য চাটাইগুলোকে ডিজেল দিয়ে ভালো করে ভিজিয়ে নেয়া হলো। এতে টাইম বোমার শক্তি আরো বৃদ্ধি পেলো। তা ছাড়া ছেড়া চাটাইয়ের মধ্যে টাইমবোমা রয়েছে, এমন সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও কারো হওয়ার কথা নয়।

আলী বল্‌লো, দেখবে, এসব টাইমবোমা বিস্ফোরিত হলে অকল্পনীয় ধ্বংসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি হবে। দু'টি বোমা কম্যুনিস্টদের আবাসিক এলাকায় পুতে রাখা হবে। রাজপথের বোমা হামলা থেকে রেহাই পেয়ে ওরা যদি বাড়ীতে পৌঁছে, সেখানেও দেখবে বোমার আঘাতে ওদের আপনজন ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে। তখন বুঝতে পারবে, পাকিস্তানের নিরপরাধ শিশু, মহিলা ও জনগণের ওপর অত্যাচারের কি নির্মম শাস্তি। আর বাকী চারটি টাইমবোমা শহরের প্রধান চারটি সংযোগ স্থলে স্থাপন করা হবে, যাতে এক জায়গা থেকে পালিয়ে অন্য পথে অগ্রসর হলে সেখানেও বোমা আক্রমণের শিকার হতে হয় ওদের।

সেহরীর সময় আলী এক মুজাহিদকে শহরের প্রধান সড়কের অবস্থা দেখে আসতে বললো।

মুজাহিদ এসে বললো, রাজপথে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়েছে।

আলী চার মুজাহিদকে সুইপারড্রেস ও বাকী সবাইকে সামরিক উর্দি পরার নির্দেশ দিলো। আব্দুর রহমানকে উর্দি পরিধানকারীদের কমান্ডার করে আলী নিজেও সুইপার ড্রেস পরে মুখের সাদা দাড়ি ও রোগীর মুখোশ খুলে ফেললো।

প্রধান সড়কে পৌঁছে আব্দুর রহমান অফিসার পর্যায়ের ক'জন সেনা সদস্যের সাথে দু'চার মিনিট গল্পও করলো। যার ফলে তাকে কোন রুশ সেনার পক্ষে সন্দেহ করার আর অবকাশ রইলো না। সরকার নিয়োজিত ঝাড়ুদারদের আব্দুর রহমান দু'চার বার ধমক দিয়ে বললো, 'তোমরা ভালোভাবে কাজ করছো না।'

কৌশলে এদেরকে ফাঁকা রাস্তায় যেখানে অন্য কোন ঝাড়ুদার ও রুশ সেনা নেই সেখানে লাগিয়ে দিয়ে বোমা স্থাপনের জায়গায় মুজাহিদ ঝাড়ুদারদের লাগিয়ে দিলো। এদিক-সেদিক পর্যবেক্ষণ করে রুশ সেনাদের সরিয়ে দেয়ার জন্য অফিসার বেশধারী আব্দুর রহমান বললো, 'তোমরা অন্যান্য সড়কগুলোর কাজ ভালোভাবে তদারক করো, এদিকটা আমি নিজেই দেখছি'। রুশ সৈন্যরা আব্দুর রহমানকে উর্ধ্বতন অফিসার মনে করে তার নির্দেশ মতো অন্যত্র চলে গেলো।

রুশ সৈন্য ও ঝাড়ুদাররা চলে যাওয়ার পর আলী ক্ষীপ্রগতিতে ফুটপাতের ইট তুলে মোক্ষম জায়গায় চাটাইসহ চারটি টাইমবোমা পুতে নিপুণভাবে আবার সেখানে ইট বসিয়ে রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করে দিলো। ফেরার পথে কম্যুনিস্ট কলোনীর মধ্যে ডাস্টবিনে লুকিয়ে রাখলো আরো দু'টি টাইমবোমা।

ভাড়া বাড়ীতে এসে আলী সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো, মিছিলের অগ্রভাবে সাজোয়া যান, ট্যাংকসজ্জিত সেনা ইউনিটসহ গাড়ী বহর থাকবে, সেনা সদস্যদের মার্চ ইউনিট থাকবে। যদি কোন কারণে সেনা সদস্যদের মার্চ ইউনিট বোমার আওতার বাইরে থেকে যায় তবে আমরা পিছন থেকে ওদের ওপর হ্যান্ডগ্রেনেড নিক্ষেপ করবো।

হুঁশিয়ারী বিজ্ঞপ্তির খবর শহরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ফলে সাধারণ আফগানীরা অনুষ্ঠানে মোটেও এলো না। মুজাহিদ হামলার আশংকায় জনতা এড়িয়ে গেলো বিপ্লব অনুষ্ঠান। কিন্তু, কম্যুনিস্ট ও সেনাবাহিনী পূর্ণ উদ্যমে শরীক হলো।

রুশ বাহিনীর সাথে অসংখ্য আফগান সৈন্যও শোভা যাত্রায় শরীক হয়েছে। রুশ পতাকার পাশাপাশি লেনিন গর্বাচেভের ছবি অংকিত ব্যানার ও পোষ্টার বহন করছিলো কম্যুনিস্টরা। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, গর্বাচেভ জিন্দাবাদ, লেনিনের আদর্শ আমর হোক, মৌলবাদ নিপাত যাক, বিপ্লব বার্ষিকী সফল হোক, সফল হোক' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত করে শোভাযাত্রা এগুচ্ছিলো প্যারেড স্কোয়ারের দিকে।

মঞ্চে ও রাজপথে কম্যুনিস্ট তরুণ-তরুণীরা নেচে-গেয়ে উল্লাস করছিলো আর নেতারা এদের আরো উজ্জীবিত করছিলো অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়ে। তাদের অশ্লীল অংগভঙ্গি ও নগ্নতার উন্মাদনায় সারা শহর যেন লজ্জায় মুখ ঢাকতে চাচ্ছিলো। কম্যুনিস্ট নেতারা মুজাহিদদের গোষ্ঠী উদ্ধার করে বক্তৃতা ঝারছিলো। লেনিনকে নবী করীম (সাঃ) এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মর্যাদায় অভিষিক্ত করে ভাষণ দিলো এক কম্যুনিস্ট। ট্যাংক ও সাজোয়া যানের ছত্রছায়ায় অগ্রসর হচ্ছিলো শোভাযাত্র। রাজপথের দু'পাশে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রাখা হলো অস্ত্রসজ্জিত সেনা টহল।

শোভাযাত্রার গতি ছিলো খুবই মন্থর। নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী মুজাহিদরা বোমা নিয়ন্ত্রক ঘড়িতে দেখলো, আর মাত্র দশ মিনিট সময় বাকী; এর পর বোমা ফেটে যাবে। শোভাযাত্রা পৌঁছার আগে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে গেলে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য বিফল হবে। এ আশংকায় অধীর প্রহর গুণছিলো আলী। দেখতে দেখেতে একটু দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলো অগ্রগামী ট্যাংক বহর ও সাজোয়া যানগুলো। প্রায় কাছাকাছি এসে গেলো মূল মিছিলটি। আলী টাইমঘড়ির দিকেই তাকিয়ে ছিলো। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো দু'টি টাইমবোমা। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে গেলো ট্যাংক ও গাড়ী। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো অগ্রগামী মিছিলের মানুষগুলো। ডাষ্টবিনে পেট্রোল দেয়া ছিলো বলে বিস্ফোরণের আগুণ জ্বলে উঠলো লেলিহান অগ্নিশিখায়। রাস্তার পাশের কম্যুনিস্ট কলোনীর কয়েকটি বাড়ীতেও আগুন ছেয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে খোদাদ্রোহীদের মিথ্যা শ্লোগান থেমে গেলো।

ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দিগ্বিদিক দৌড়াতে শুরু করলো কম্যুনিস্টরা। পিছনের রাস্তা মানুষের চাপে বন্ধ হয়ে গেলো। কিছু মানুষ পথ না পেয়ে এগুতে চাইলো সামনের দিকে, অমনি আরো দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হলো। ট্যাংকগুলো উল্টে পড়লো। অপেক্ষমান মুজাহিদরা পলায়নকারী কম্যুনিস্টদের ওপর হাতবোমা ছুড়ে মারলো। ইসলামের দুশমনদের তাজা লাশ রাজপথে পড়ে তড়ফাতে লাগলো। ততক্ষণে রাস্তার দু'পাশের সবগুলো বাড়ীতে আগুন ধরে গেছে। কালো ধূয়ায় ছেয়ে গেছে শহরের আকাশ। হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে দেয়ার সময় দূরে দাঁড়ানো ক'জন টহলদার রুশ সেনা মুজাহিদদের দেখে ফেলেছিলো। আলীদের দিকে ধেয়ে আসছিলো ওরা। আলী ওদের দিকে তীব্র বেগে একটি গ্রেনেড ছুড়ে দিয়ে সবাইকে বললো, যে যে দিক থেকে পারো দু'-তিন জন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে শীঘ্র শহরের বাইরে চলে যাও।

আলী আব্দুর রহমানকে নিয়ে একটি সংকীর্ণ গলীতে ঢুকে পড়লো। দ্রুত এগুতে লাগলো সামনের দিকে। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে গলী পথ শেষ হয়ে গেলো। সামনে উঁচু দেয়ালঘেরা বাড়ী । দিক বদল করে পিছনের দিকে তাকালো। ক'জন রুশ সেনা ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। পালাবার পথ নেই। হায়, এখন!

গলীর ধারে একটি বাড়ীর গেট খোলা পেয়ে ঢুকে গেট লাগিয়ে দিলো। ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলো। তাদের দেখে এক বৃদ্ধা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি হে বেটা! কি চাই?

কিছু না মা! রুশ সৈন্যরা আমাদের গ্রেফতার করতে চায়।

বৃদ্ধা বললো, অ্য! তার মানে তোমরা মুজাহিদ?

আলী হ্যাঁ বোধক শব্দ উচ্চারণ করলো।

বৃদ্ধা তাদেরকে ঘরে নিভৃত কক্ষে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, বেটা! কোন ভয় নেই। তোমরা এখানে আরাম করো।

আলী ও আব্দুর রহমানকে দুপুরের খাবার দিয়ে গৃহকর্তী বললেন, তোমরা খাবার খেয়ে বিশ্রাম করো। পুলিশ শহরব্যাপী তল্লাশী করছে, পথে পথে কড়া পুলিশ প্রহরা। রাত ছাড়া তোমাদের বের হওয়া সম্ভব হবে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলেই আমি তোমাদের ডেকে দেবো।

রাত পর্যন্ত আলী ও আব্দুর রহমানকে অপেক্ষা করতে হলো। গৃহকর্তী সন্ধ্যার পরই তাদেরকে রাতের খাবার দিলেন। আলী ও আব্দুর রহমান মাত্র খাওয়া শেষ করেছে, দরজার ওপাশ থেকে গৃহকর্তীর গলার আওয়াজ শোনা গেলো, সকাল থেকে তুমি কোথায় ছিলে? সারা শহরে কিয়ামত বয়ে গেছে আর তুমি মাত্র বাড়ী ফিরছো?

আম্মীজান! সন্ত্রাসীরা শহরে রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে অসংখ্য। আহত মানুষদের সেবাশুশ্রুষা করতে গিয়ে আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়ে গেলো। আমার বাহুতেও সামান্য আঘাত লেগেছে আম্মী।

গৃহকর্তী ও তার ছেলের কথাবার্তা শুনে আলী ও আব্দুর রহমান খুই উদ্বিগ্ন হলো। আব্দুর রহমান বললো, আমাদের সাথে তো আসমানী মেহমানের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু ---------।

আলী বললো, উদ্বেগের কিছু নেই। আল্লাহ যা করবেন তা ভালোর জন্যই করবেন, ধৈর্য ধরো।

বৃদ্ধা আবার বললেন 'বেটা! আমি তোমাকে আগে থেকেই বলে আসছি, কম্যুনিস্ট নাস্তিকদের সঙ্গ ছেড়ে দিতে, রুটি-রুজির বিনিময়ে নিজের ঈমান-আমল বিক্রি না করতে। আল্লাহর কাছে আমাকে তুমি লজ্জিত করবে না। মৃত্যুর পর তোমার মরহুম আব্বাকে আমি কি জবাব দেবো, যিনি বেদ্বীন ইংরেজদের মোকাবেলায় দেশের আযাদী ও দ্বীন রক্ষার্থে শাহাদতবরণ করেছেন। তার পুত্র হয়ে তুমি বেঈমানদের সহযোগিতা করছো!

আহত ব্যাঘ্রের মতো চীৎকার দিয়ে উঠলো বৃদ্ধার কম্যুনিস্ট ছেলেঃ

'আম্মী!! বহুবার আমি তোমাকে বলেছি, চৌদ্দশ' বছর আগের পুরনো ইসলামী কিসসা কাহিনী আমাকে শোনাবে না। তোমার ইসলাম, খোদা, রাসূলের কাহিনী শুনতে আমার মোটেই আগ্রহ হয় না। ওসব আমার একদম পছন্দ নয়।'

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আফসোসের সাথে বললেন, আল্লাহ যদি তোমাকে বোঝান, এ ছাড়া আর কে বোঝাবে।

ছেলে অবরুদ্ধ ঘরটির দিকে এগুচ্ছিলো। বৃদ্ধা বাধা দিয়ে বললো, ও দিকে যেয়ো না, ফিরে এসো।

কেন আম্মী!! ও ঘরে অসুবিধা কি?

কোন অসুবিধা নেই। ওদিকে আর এক পাও এগুবে না। বৃদ্ধা তার কথা শেষ করার আগেই ছেলে এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঢুকে পড়লো। আলী ও আব্দুর রহমানকে দেখেই

সে বুঝতে পারলো, ওরা মুজাহিদ। চকিতে কোমর থেকে পিস্তল বের করে রাগত হুংকার দিয়ে বললো, তোমরা কারা, কোত্থেকে এসেছো?'

আলী ও আব্দুর রহমান কোন জবাব দেয়ার আগেই বৃদ্ধা তার ছেলেকে একটানে কক্ষের বাইরে নিয়ে কলার চেপে ধরে বললেন, আমি বলছি ওরা কারা! 'ওরা আত্মমর্যাদা সম্পন্ন আফগান যুবক। ওরা ধর্মের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে, তোমার মতো সামান্য রুটি-রুজীর বিনিময়ে ওরা ঈমান বিক্রি করেনি।'

ভীষণ লজ্জার কথা আম্মী!! আমরা সারা শহর তন্ন তন্ন করে ফিরছি, আর তুমি জঘন্য সন্ত্রাসীদের নিজ ঘরে আশ্রয় দিয়েছো! আমি এখনই পুলিশ ডেকে আনছি।

এই বলে ছেলে বেরুতে উদ্যত হলো।

বৃদ্ধার একমাত্র যুবতী মেয়ে তাহেরা আলী ও আব্দুর রহমানকে গেট পেরিয়ে বাড়ীতে ঢুকার সময়েই দেখেছিলো। সেই থেকে এতক্ষণ গভীরভাবে এদের মুক্তির চিন্তা ও অসুবিধার নানা দিকসহ ঘরে-বাইরের পরিস্থিতি সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলো সঙ্গোপনে, নির্বিকারভাবে। এ বাড়ীতে যে তৃতীয় কোন মানুষ আছে, আলী ও আব্দুর রহমান তা ধারণাও করতে পারেনি।

সকল নীরবতা ভেঙ্গে গেলো তাহেরার। পুলিশের কথা শুনে তাহেরা এগিয়ে এসে বললো, ভাইজান! আমরা কিছুতেই তোমাকে এ কাজ করতে দেবো না।

তাহেরা! বুঝতে চেষ্টা করো, এসব সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। বিপ্লব বিরোধী শত্রুদের আমি ক্ষমা করতে পরব না।

তাহেরা বললো, রুশ হানাদার বাহিনী লক্ষ লক্ষ নিরীহ আফগানীকে হত্যা করছে; এগুলো কি তোমাদের চোখে পড়ে না। এছাড়া পাকিস্তানে তোমরা যে বোমা হামলা করছো, সেখানে যে মানুষ মরে ওরা কি মানুষ নয়?

'তোরা যাই বলিস, আমি ওদের গ্রেফতার করাবই। তাহেরা, জানিস! ওদের গ্রেফতার করাতে পারলে সরকারের পক্ষ থেকে আমি বিরাট অংকের পুরস্কার পাবো। সরকার এক সন্ত্রাসীকে ধরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে এক লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সে টাকা দিয়ে তোকে মূল্যবান অলংকার এনে দেবো। এমন আধুনিক সুন্দর অলংকার আনবো, যা তুই কখনও দেখোনি।' অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কথাগুলো বলে আলীদের দরজাটি তালা দিয়ে বন্ধ করে বাইরে যেতে পা বাড়ালো সে।

তাহেরা ভাইয়ের পথ রোধ করে দাঁড়াল। বিনয়ী নম্র তাহেরা মুহূর্তে পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেলো। অগ্নিমূর্তী ধারণ করে ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে বললো, 'ভাইজান! শত সহস্র মুজাহিদের রক্তে রাঙ্গা শরীর ও জীবনের বিনিময়ে সংগৃহীত অলংকারকে আমি ঘৃণা করি।'

ভাইজান! আল্লাহর কাছে আর আমাদের লজ্জিত করো না। সমাজে আমাদেরকে আর হাসির পাত্র বানিও না, কলংকিত করো না। এতদিন পর্যন্ত বহু ধৈর্য ধরে তোমার

দেশদ্রোহী, ঈমান বিরোধী তৎপরতা সহ্য করে আসছি, তোমার পায়ে ধরে বলি, মুজাহিদদের ধরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা তুমি ত্যাগ করো।'

'বোকা বোন! আমি তোর হেয়ালী কথা শুনতে রাজী নই।'

তাহেরাকে ধাক্কা দিয়ে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দিলো। তাহেরা দৌড়ে ঘরের ভিতর থেকে একটি চাকু হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল ভাইয়ের পথ রোধ করে।

বললো, 'ভাইজান! আমার হাতে এটা কি দেখেছো! তুমি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না করো, তাহলে জেনে রেখো, ধর্মের খাতিরে আজ ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবো। তোমার মতো ধর্মদ্রোহী ভাইকে আজ আমি নিজ হাতে হত্যা করতে পারবো। কিন্তু মুজাহিদদেরকে চোখের সামনে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারবোনা।

হতভাগ্য কমুনিস্ট ভাই এক মাত্র বোন তাহেরাকে খুব জোরে একটি থাপ্পড় মেরে ফেলে দিলো। পিছনের দিকে ছিটকে পড়লো তাহেরা। রাগে গর গর করতে করতে ক্ষুব্ধ বাঘীনীর মতো উঠে দাঁড়ালো তাহেরা। ততক্ষণে তার ভাই দরোজার দিকে পা বাড়িয়েছে। তাহেরা আবার ভাইকে ডাকলো, কিন্তু ও আর পিছনের দিকে তাকালো না। তাহেরা উঠে দৌড়ে গিয়ে হাতের ছোরাটি ভাইয়ের পিঠে বসিয়ে দিলো। ঢলে পড়ে গেলো হতভাগা ভাই। তাহেরা ছোরাটি টেনে বের করে এবার বুকের সোজাসুজি আমূল বিদ্ধ করে দিলো। একটা গড় গড় শব্দ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেলো নাস্তিকটি।

একমাত্র ভাইকে হত্যা করে তাহেরা তার মাকে বললো, আম্মী! আমি দুঃখিত এই জন্য যে, তোমার একমাত্র নাস্তিক ছেলেকে হত্যা করতে হয়েছে। ওকে হত্যা না করলে দ্বীনের এ দু' সৈনিককে বাঁচানো যেতো না। সে অবশ্যই এদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দিতো। আম্মী! দ্বীনের দুশমন কোন মুসলমান মায়ের পুত্র হতে পারে না।

আম্মী! আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, এই ছিলো আমার একমাত্র সহোদর ভাই। হায়! সে যদি আজ কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিহত হতো শহীদের বোন হিসেবে আমি গর্ববোধ করতাম।

বেটী!! তুমি যা করেছো দ্বীনের খাতিরে ঠিকই করেছো। দোয়া করো, আল্লাহ যেন আমাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দেন।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা গৃহকর্তী দরজা খুলে ঘরে ঢুকে আলী ও আব্দুর রহমানকে বললেন, বেটা! এখন চতুর্দিকে অন্ধকার নেমে এসেছে; তোমাদের তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। আবার এমন না হয়ে যায় যে, রুশ পুলিশ খুঁজে খুঁজে এখানে এসে হানা দেয়।

আম্মীজান! আপনি আপনার এক মাত্র পুত্রকে দ্বীনের স্বার্থে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

আলীর কথা শেষ না হতেই গৃহকর্তী বললেন, 'যে ছেলে নিজ ধর্ম ও দেশের প্রয়োজনে কোন কাজে আসে না, সে ছেলে আমার পুত্র হতে পারে না। ওরাই আমার পুত্র, যারা নিজ জন্মভূমি ও ধর্মের জন্যে জীবনমরণ জিহাদ করে যাচ্ছে। সকল মুজাহিদ আমার ছেলে। (মৃত ছেলের লাশের প্রতি ইঙ্গিত করে গৃহকর্তী বললেন) একে আমার পুত্র বলে পরিচয় দিতে লজ্জা লাগে বেটা!

আম্মী! আপনি যখন আমাদেরকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন আপনি যে কোন অসুবিধায় পড়লে বা প্রয়োজন বোধ করলে এই ছেলেদের স্মরণ করবেন।

এই বলে আলী ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

বাড়ীর গেট পর্যন্ত এসে আব্দুর রহমান আবার ঘরের দিকে ফিরে গেলো। তাহেরা চাদরে শরীর ঢেকে তাদের পশ্চাদানুসরণ করছিলো। বারান্দায় ওকে পেয়ে আব্দুর রহমান বললো, 'তাহেরা! আমি এক রুশ মুসলমান। যে দ্বীনের খাতিরে তুমি নিজ ভাইকে হত্যা করলে, সেই দ্বীনের খাতিরে আমি তোমাকে বোনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চাই। আফগান ভাইয়েরা বোনের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে আমি জানি না, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, তোমার মতো সুদৃঢ় দ্বীনদার বোনের জন্য আমি জীবন ত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত।'

তাহেরার মাকে সম্বোধন করে আব্দুর রহমান বললো, তাহেরা আমাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছে, আপনি আমার মা। পুত্র হিসেবে আমি মায়ের খিদমতে এই কিছু টাকা দিলাম। পুত্র হিসেবে আমি তা কখনও মেনে নিতে পারি না যে, একমাত্র উপার্জনক্ষম লোককে হারিয়ে আমার মা-বোন রুটি-রুজীর জন্য অন্যের বাড়ীতে ধর্ণা দেবে। এখন থেকে আমি রীতিমতো আপনাদের কাছে প্রয়োজনীয় খরচের জন্য টাকা পাঠাবো।

বেটা! টাকার জন্যে আমি তোমাদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করিনি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি নিজের ছেলের বিনিময়ে তোমাদের সাহায্য করেছি। সেই আল্লাহ আমাকে খাওয়াবেন, পরাবেন, মা বললেন।

আম্মী! নিজ ছেলেকে আল্লাহর পথের সৈনিকদের জীবন রক্ষার্থে কুরবান করে দিয়েছেন, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আপনাকে জান্নাত দেবেন। আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ এর বদলা দিতে পারবে না। এ টাকাগুলো এক পুত্রের পক্ষ থেকে মায়ের সেবায় উৎসর্গিত সামান্য উপহার মাত্র। আপনি এগুলো গ্রহণ না করলে মনে করবো যে, আপনার ছেলে এবং তাহেরার ভাই হওয়ার মতো যোগ্যতা আমার নেই।

আম্মী! রাশিয়ার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিজ ভাই-বোনদের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা জীবনেও হয়ত পুরণ হবে না। আফগান মুজাহিদরা আমাকে ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছে। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনার মতো একজন মহিয়সী মহিলা আমার মা হোক আর তাহেরার মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্না যুবতী হোক আমার বোন। কিন্তু, মনে হচ্ছে কোন রুশ মুসলমান আপনার পুত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। অত্যন্ত আবেগাপ্লুত স্বরে আব্দুর রহমান এ কথাগুলো বললো।

তাহেরা মাকে বললো, আম্মী! রুশ ভাইয়ের মনে কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। আপনি টাকাগুলো নিয়ে নিন।

আব্দুর রহমান হাত উচিয়ে তাহেরাকে অভিবাদনসহ কৃতজ্ঞতা জানালো। তাহেরা ও তার মা আলী ও আব্দুর রহমানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে বিদায় দিলেন। অবশেষে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কোন মতে তারা শহরের বাইরে এসে পৌঁছলো।

পথে আব্দুর রহমান আলীকে বললো, ভাই আলী! একজন বোন দ্বীনের খাতিরে আপন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করতে পারে, ইতিপূর্বে আমি তা কল্পনাও করিনি। সঠিক অর্থেই আফগান মা-বোনেরা আত্মমর্যাদার অধিকারীনী। তাহেরা ও তার মা ইচ্ছা করলে আমাদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে সরকারের নিকট নিজ পুত্র ও ভাইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারতো, লুফে নিতে পারতো সরকারী পুরস্কারের মোটা অংক। কিন্তু দ্বীনের খাতিরে শুধু টাকাই নয়, বোন আপন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করলো। আমার তো মনে হচ্ছে যে, 'এরা বিংশ শতাব্দীর নারী নয়-ইসলামের প্রথম যামানার নারী এরা।'

আব্দুর রহমান! আফগান মেয়ে ও মায়েরা দ্বীনের স্বার্থে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আজকের ঘটনাটি হয়তো তোমার জীবনে বিস্ময়কর লেগেছে। কিন্তু আফগানিস্তানে এমন বহু নজীর রয়েছে যে, স্বাধীনতা ও দ্বীনের স্বার্থে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে নিজ হাতে হত্যা করেছে। অগণিত মা-বোন, পিতা-পুত্রের ত্যাগের বিনিময়েই আজ আমরা সামান্য বন্দুক দিয়ে বিশাল শক্তিশালী রুশ দৈত্যের মোকাবেলায় বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আলী বললো।

দুপুরের সময় আলী ও আব্দুর রহমান ক্যাম্পে পৌঁছলো। অন্যান্য সাথীরা এর আগেই ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিলো।

★ ★ ★ ★ ★

রুশ বাহিনীর বিপ্লব বার্ষিকী অনুষ্ঠানে মুজাহিদ আক্রমণে ব্যাপক হতাহতের মূল্যায়নের জন্য রুশ কর্নেল জেভোনক কাবুলে জরুরী মিটিং তলব করলো। মিটিংয়ে সকল উর্দ্ধতন রুশ সামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত হলো। আলীর বিস্ময়কর অভিযান ছিলো মিটিংয়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অশ্বারোহী ও মোটর সাইকেল অভিযান নিয়েও আলোচনা হলো। কর্ণেল জেভোনক ইশতেহার জারী করলো, আলীর গ্রেফতারকারীকে বিশ লাখ রুবল পুরস্কার দেয়া হবে। সারা শহর ও গ্রামাঞ্চলে এই পুরস্কারের কথা প্রচার করা হলো। কর্নেল আশা পোষণ করলো, বিশ লাখ রুবল মোটা অংকের পুরস্কারের লোভে হয়তো আলীর সহচরদের মধ্যেও কেউ তাকে গ্রেফতার করে এনে দিতে পারে।

এক রুশ অফিসার বললো, আলীকে গ্রেফতার এবং মুজাহিদক্যাম্প ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ছত্রীসেনা অবতরণ করা হোক কিংবা স্পটনাজ আক্রমণ করা হোক।

স্পটনাজ আক্রমণের কথা আমিও ভাবছিলাম। কিন্তু স্পটনাজ সেনাদের এখানে নিয়ে আসা এবং আক্রমণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে। এসব অফিসিয়ালী প্রক্রিয়া শেষ করতে মাস তিনেক সময় লেগে যাবে। কর্ণের ঝেভোনক মন্তব্য করলো ।

অন্য এক রুশ অফিসার বললো, আলী ও তার সহযোগীদের গুপ্ত হামলা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা কিছু করতে হবে। ওরা তো আমাদের বিপর্যস্ত করে তুলছে।

কর্নেল জেভোনক বললো, আপাততঃ আমরা বিমান হামলা আরো জোরদার করবো। তা ছাড়া আলীর ক্যাম্পের অভ্যন্তরে আমাদের প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা প্রেরণ করা হবে এবং আলীর সাথীদের মধ্যে থেকেও রিক্রুট করা হবে গোয়েন্দা। স্পটনাজ অপারেশনের ব্যাপারে আগামী মাসের চীফ পর্যায়ের মিটিংয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্পটনাজ হামলার খবর কাবুলে অবস্থানরত এক মুজাহিদ গোয়েন্দা অবহিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সে তার অফিসারের কাছে এ খবর পৌঁছালে অফিসার দ্রুত সে সংবাদ আলীকে অবহিত করলো। অবশ্য সে অফিসার আলীকে খবর পৌঁছানোর আগে কাবুল গোয়েন্দা হেডকোর্য়াটারে মুজাহিদ অনুগত কমান্ডারের সাথেও যোগাযোগ করলো।

গোয়েন্দা চীফ বললো, স্পটনাজ অপারেশনের প্রস্তুতি চলছে, এ খবরটি আপনি দ্রুত আলীকে জানিয়ে দিন। শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া স্পটনাজ থেকে আত্মরক্ষা অত্যন্ত দুরুহ।

মুজাহিদ গোয়েন্দা অফিসার বেতার মারফত আলীকে জানিয়ে দিলো যে, অচিরেই আপনার ক্যাম্পে স্পটনাজ হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আলী স্পটনাজ হামলা সম্পর্কে অফিসারকে জিজ্ঞেস করলো। অফিসার বললো, 'অপারেশনের ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমি এখনও কিছু জানতে পারিনি। তবে এতটুকু জানি যে, স্পটনাজ একটি কঠিন আক্রমণ। শতাব্দীর ইতিহাসে মাত্র এ ধরনের একটি হামলার কথা শোনা যায়, তবে তার প্রকৃতি এখনও আমার অজ্ঞাত।

কবে নাগাদ স্পটনাজ হামলা চালানো হতে পারে?

গোয়েন্দা অফিসার বললো, 'আগামী তিন/চার মাসের মধ্যে এ হামলার আশংকা রয়েছে।

পর দিন আঞ্চলিক রুশসেনা হেডকোয়ার্টার থেকে ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহও আলীকে স্পটনাজ হামলার খবর দিলেন, কিন্তু তার পক্ষেও স্পটনাজ হামলার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হয়নি।

আব্দুর রহমানের সাথে নির্জনে আলী স্পটনাজ হামলার খবরের কথা বললে আব্দুর রহমান এ সংবাদ শোনা মাত্র মুষড়ে পড়লো।

আব্দুর রহমান বললো, এটা ভয়াবহ দুঃসংবাদ। রাশিয়ান স্পটনাজ ফোর্সের কথা ইউরোপ আমেরিকার সেনারা শুনলে ভয়ে আঁতকে ওঠে। স্পটনাজ ফোর্স রাশিয়ার সব চেয়ে দুর্ধর্ষ সেনা ইউনিট।

আব্দুর রহমান বললো, স্পটনাজ ইউনিটের সেনাদেরকে ভয়ংকর রক্তপিপাসু জীব-জন্তুদের মতো গড়ে তোলা হয়। দুশ্চরিত্র ডানপিঠে অপরাধী চরিত্রের কিশোরদের এ বিভাগে ভর্তি করা হয়। ভর্তির পর আর এদের জীবনে ছুটি বলতে কিছু মেলে না। গভীর জঙ্গলে হিংস্র হায়েনাদের সাথে এদের বসবাস। লোকালয় ও সভ্যতা থেকে এদের দূরে রাখা হয়। কঠিন পরিশ্রমী, খুনী, লাগাতার দীর্ঘদিন উপোস ইত্যাকার কঠিন কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে এদের চরিত্র এমন হিংস্র রূপ ধারণ করে যে, মানব সভ্যতাকে গুড়িয়ে দিয়ে এরা উল্লাস প্রকাশ করে থাকে। এদেরকে জীবিত জন্তুর গোশ্ত, রক্ত, ইত্যাদি খেতে দেয়া হয়। মানবতাবোধ এদের হৃদয় থেকে বের করে দেয়া হয়। একেকটা স্পটনাজ সেনা এক একটা জ্যান্ত চিতার মতো দুর্ধর্ষ করে গড়ে তোলা হয়। দু'চারটা বুলেট নিয়ে এরা দিব্যি লড়ে যেতে পারে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে চিবিয়ে ছিড়ে ফেলে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন রণাঙ্গনে স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলায় কেউ টিকতে পারেনি।

আলীকে আল্লাহ তাআলা পাহারের মতো দৃঢ়তা, সিংহের অমিততেজ, চিতার মতো অকুতোভয় সাহস দিয়েই রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন। স্পটনাজ হামলার ভয়াবহতার কথা শুনেও আলী ঘাবড়ে যায়নি।

সে আব্দুর রহমানকে বললো, সমস্যা যতোই কঠিন হোক সমাধান একটা বের করতেই হবে। তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো, আমিও ভাবছি। আল্লাহ একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিবেন। আগামীকাল তোমার সাথে এ ব্যাপারে কথা হবে, আজ খেয়ে বিশ্রাম করো।

পরদিন আলী আব্দুর রহমানকে বললো, স্পটনাজ হামলা আরো তিন চার মাস পর হতে পারে বলে গোয়েন্দা খবরে জানা গেছে। এ সময়ের মধ্যে কি আমরা কিছু মুজাহিদ নিয়ে একটি স্পেশাল ফোর্স গঠন করে স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি না! গড়ে তুলতে পারি নাকি এমন ভয়ংকর এক মুজাহিদ ইউনিট যারা স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে?

প্রত্যেক মুজাহিদ ক্যাম্প থেকে সাহসী, শক্তিশালী ও জানবাজ মুজাহিদদের নির্বাচন করে এদের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুললে ওরাও দুর্ধর্ষ সৈনিকে পরিণত হবে। স্পটনাজ ফোর্স যদি জঙ্গলের বিরূপ পরিবেশে বেড়ে ওঠে থাকে, মুজাহিদরাও আফগানিস্তানে বিরূপ প্রকৃতি পাহা- জঙ্গল-মরুভূমির পরিবেশেই বেড়ে উঠেছে। এছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে এরা যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে আসছে, তা কিন্তু কোনমতেই ফেলনা নয়। আমরা যদি পাহাড় জঙ্গল ও ময়দানে এদের কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে তুলি, তবে আশা করি এরাও স্পটনাজের চেয়ে কম দক্ষতা দেখাবে না বরং অধিক ফলপ্রসূ বিবেচিত হতে পারে।

আব্দুর রহমান আলীর পরিকল্পনায় সায় দিলে আলী সকল মুজাহিদ ক্যাম্পের সাথে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করলো। সকল কমান্ডারকে নির্দেশ দিলো, অধিক শক্তিশালী ও সাহসী মুজাহিদদের হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে। কি কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মুজাহিদদের তলব করা হচ্ছে, এর দীর্ঘ ফিরিস্তিও আলী ক্যাম্পে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলো। তৃতীয় দিন বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আগত মুজাহিদদের মধ্যে থেকে দেড়শ মুজাহিদকে নির্বাচন করা হলো। আব্দুর রহমানের উপর ন্যস্ত করা হলো এদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব। আলী আব্দুর রহমানকে দায়িত্ব অর্পণকালে বললো; কমান্ডার আব্দুর রহমান! তিন মাসের মধ্যে তোমাকে এদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলতে হবে। এরা যেনো চিতার চেয়ে বেশী তেজী এবং সিংহের চেয়েও অধিক সাহসী হয়ে গড়ে ওঠে। তোমার যখন যা প্রয়োজন আমাকে জানাবে, আমি ব্যবস্থা করে দেবো।

আব্দুর রহমান স্পেশাল ফোর্স গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরী করে আলীকে দিলো। কয়েক দিনের মধ্যে আলী আব্দুর রহমানের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করলো।

আলীর মুজাহিদ ক্যাম্পের সদর দফতর থেকে অনতি দূরের একটি দুর্গম পাহাড়ের উপর স্থাপিত হলো স্পেশাল ফোর্সের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। শুরু হলো কঠোর অনুশীলন।

আলী আব্দুর রহমানকে বললো, অন্যান্য মুজাহিদদের দৃষ্টির ভিতরে যদিও এদের প্রশিক্ষণ হবে, তবে একথা যেন কেউ জানতে না পারে যে, কি উদ্দেশ্যে এদের এতো কঠিন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

স্পেশাল মুজাহিদ ফোর্সের জন্য আলী কিছু স্পেশাল ব্যবস্থা করে দিলো। মুজাহিদদের অতিরিক্ত খাবার, দুধ ও গোশতের প্রয়োজন পুরণের জন্য আলীর বিশেষ বাহিনী শহরের কাছের সরকারী ডেইরী ফার্ম ও পোলট্রি ফার্মে হামলা করে অসংখ্য গরু, ছাগল ও ভেড়া নিয়ে এলো। একটি খাদ্য গুদামেও হামলা করে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী হস্তগত করলো। তা ছাড়া অভিজ্ঞ মুজাহিদদের তত্ত্বাবধানে ক্যাম্পের পাশেই আলী একটি বহুমুখী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করলো, যাতে মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় দুধ গোশত সরবরাহে কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি না হয়। শাক-সব্জি চাষ করার ব্যবস্থা আলীর ক্যাম্পে আগেই ছিলো, সে কৃষি ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত করলো। এছাড়া পঞ্চাশজনের একটি অপারেশন টিম তৈরী করে দিলো, যারা সব সময় সুযোগ বুঝে সরকারী খাদ্যগুদাম ও ফার্মগুলো থেকে অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকবে।

শুরু হলো আব্দুর রহমানের স্পেশাল ট্রেনিং। আব্দুর রহমান মুজাহিদদেরকে কঠিনতর অনুশীলনের প্রথমিক পর্যায়ে রাখলো খাড়া পাহাড়ে দৌড়ে উঠা, একটানা দিনভর সাতরানো, গাছ থেকে গাছে ফ্লাইং ঝাপ দেয়া, প্রশস্ত নালা ঝাপ দিয়ে পাড় হওয়া, গোলা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে একই সাথে আত্মরক্ষা এবং মোকাবেলার কঠিনতম অনুশীলন। মুজাহিদরাও জীবনপণ পরিশ্রম করে আব্দুর রহমানের কমান্ড পালনে সক্রিয় হলো। আলী প্রতিদিন একবার মুজাহিদদের মহড়া দেখতো এবং প্রয়োজনে আব্দুর রহমানকে পরামর্শ দিতো।

মুহাম্মদুল ইসলাম একদিন আলী ও আব্দুর রহমানকে বললো, আমাকে যদি কিছু কেমিক্যাল সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তবে আমি এক বিষাক্ত গ্যাস তৈরী করে দিতে পারবো, যা প্রয়োগ করলে যে কোন জীব-জন্তু মুহূর্তের মধ্যে মারা যাবে।

আলী মুহাম্মদুল ইসলামকে গ্যাস তৈরীর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা দিতে বললো। কতক্ষণের মধ্যেই মুহাম্মদুল ইসলাম তালিকা তৈরী করে দিলো। আলী তালিকা দেখে আন্দাজ করলো যে, এসব সামগ্রী খুব একটা দামী নয়, সংগ্রহ করার মতো অর্থ মুজাহিদদের আছে। তা ছাড়া পাকিস্তান থেকে সহজেই এসব ক্যামিক্যাল সংগ্রহ করা যাবে। একটি বিশেষ টিমকে অর্থ, তালিকা ও নির্দেশনা দিয়ে পাকিস্তান থেকে এসব কেমিক্যাল সামগ্রী সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো।

কেজিবি কর্তৃপক্ষ আত্মঘাতি তৎপরতা চালানোর জন্য মুজাহিদদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিলো। কেজিবির এই কৌশলটি ছিলো খুব সূক্ষ্ম ও পরিকল্পিত। গুপ্তচরবৃত্তির এই কৌশলের দু'টি দিক ছিলো। প্রথমতঃ আলীর মুজাহিদ ক্যাম্পে অবস্থানরত পুরাতন মুজাহিদদের হাত করা, আর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুজাহিদদের মধ্যে প্রশিক্ষিত অনুচর ঢুকিয়ে দেয়া। উভয় দিকে কেজিবি একই সাথে কাজ শুরু করে।

একদিন তিন আফগান সরকারী সৈন্য আলীর ক্যাম্পে এসে তার সাক্ষাতের জন্য দরখাস্ত করে। ক্যাম্পের পোস্ট থেকে আলীকে জানানো হলো, তিন আফগান সৈনিক তার সাথে দেখা করতে চায়, ওদের এখানে আটকে রাখা হয়েছে। চেকপোস্টে প্রাথমিক দেহ তল্লাশীর পর এ তিন আফগান সৈন্যকে আলীর দফতরে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

আফগান সৈন্যরা আলীকে জানালো, তারা সরকারী বাহিনীতে চাকুরী করে আত্ম গ্লানীতে ভুগছিলো, একান্ত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এতোদিন জোর করে তাদেরকে সরকারী বাহিনীতে থাকতে হয়েছে। আজকে সুযোগ পেয়ে সরকারী অস্ত্রসহ আপনাদের সাথে মিলিত হতে এলাম, আমরা চেকপোস্টে অস্ত্র জমা দিয়ে এসেছি।

আলী এদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে পরীক্ষা নিলো, এরা আলীকে সন্তোষজনক জবাবে খুশী করতে সক্ষম হয়। আলী এদের খুশী মনে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো এবং তাদের যথাযথ পদক্ষেপের জন্য মোবারকবাদ জানালো।

ওরা তিনজন তখনও আলীর মুখোমুখি বসা। কি মনে করে মুহাম্মদুল ইসলাম এদিকে এলো। সে দূর থেকেই এ তিনজনকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো এই ভেবে যে, এরা তিনজনই কাবুল সরকারের সন্ত্রাসী সেনা ইউনিট 'খাদ' এর উর্দ্ধতন অফিসার। এরা কেন এখানে?

মুহাম্মদুল ইসলাম সোজা আলীর কাছে এসে তাকে জানালো যে, এরা তিনজনই খাদ এর অফিসার।

আলী বললো, তোমার কথা ঠিক নয়, এরা আফগান সেনা অফিসার। স্বপক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদদের পক্ষে যোগদান করতে এসেছে।

মুহাম্মদুল ইসলাম বললো, ঠিক আছে, আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না, তবে এদেরকে আরো কিছু দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হোক, এদের ব্যাপারে তল্লাশী চালানো হোক, তারপর এদের মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কেননা খাদ পর্যায়ের পাকা কম্যুনিস্টরা কখনও মুজাহিদ হতে পারে না। এরা নিশ্চয়ই গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছে।

তিন আফগান অফিসার মুহাম্মাদুল ইসলামের অভিযোগের বিরুদ্ধাচরণ করলো। আলী মুহাম্মদুল ইসলামের অভিযোগ মেনে নিয়ে আফগানী সৈন্যদের উদ্দেশে বললো ঃ

তোমরা কয়েকদিন আমাদের প্রহরাধীনে থাকবে। তোমাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া হবে। তোমাদের দেয়া তথ্য সঠিক হলে নির্দ্ধিধায় তোমাদেরকে মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। তবে তোমাদের খোঁজ নেয়ার জন্য আমাদেরকে পূর্ণ তথ্য সরবরাহ এবং তদন্ত কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

আফগান তিন সৈন্যের তথ্য নেয়ার জন্য দু'জন মুজাহিদকে তাদের দেয়া ঠিকানা মতো তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হলো। অপরদিকে ওয়ারলেসে ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে বললো, তিন আফগান সৈন্যের পুরো তথ্য জানা দরকার।

পরদিন আঞ্চলিক রুশ হেডকোয়ার্টার থেকে ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহ আলীকে জানালেন যে, ধৃত তিন আফগানী সরকারী সন্ত্রাসী বাহিনী 'খাদ' এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। দফতরে এদের নামে ছুটি ইস্যু করা রয়েছে। গোয়েন্দা বাহিনীর তথ্য মতে এরা গুরুত্বপুর্ণ কোন অপারেশনে বাইরে রয়েছে।

সন্ধ্যায় গ্রামে তদন্ত শেষে দু'মুজাহিদ ফিরে এসে আলীকে জানালো, ঐ গ্রামে এদের দেয়া নামের কোন ব্যক্তি নেই। গ্রামের কেউ এ নামের কোন ব্যক্তিকে চিনে না।

আলী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সেই সাথে মনে মনে মুহাম্মদুল ইসলামের বিচক্ষণতার শুকরিয়া জানালো। তিন আফগান সৈন্যকে দফতরে ডেকে তাদের সম্পর্কে আঞ্চলিক গোয়েন্দা প্রধানের দেয়া তথ্য এবং তদন্ত দলের রিপোর্ট পেশ করে বললো, মুনাফিকীর জন্য সামরিক আইনে তোমাদের একমাত্র সাজা মৃত্যুদন্ড। তোমরা আফগান জনসাধারণকে রুশ ভল্লুকদের গোলাম বানানোর জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তোমরা ভয়াবহ অপতৎপরতায় জড়িত। যদিও তোমাদের চক্রান্ত খুবই সূক্ষ্ম, কিন্তু একথা জেনে রেখো যে, মুজাহিদদের সহযোগিতায় আল্লাহ রয়েছেন, তোমাদের কোন চক্রান্তই তাদের ধ্বংস করতে পারবে না। জাতীয় বেঈমানদের সব দেশেই মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, তোমাদেরকেও ফায়ারিং স্কোয়ারে নিক্ষেপ করা হবে।

★ ★ ★ ★ ★

কয়েকদিন পরের এক ঘটনা। আলী কয়েকজন উর্ধতন মুজাহিদ কমান্ডার নিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছিলো। এমন সময় একটি বিষাক্ত সাপ এসে সোজা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। মুজাহিদরা সাপটিকে মারার জন্য তৈরী হলে আলী তাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, যতক্ষণ পর্যন্ত সাপটি কাউকে আঘাত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ সাপটিকে আঘাত করবে না। সাপটি আলীর দফতরে কয়েকটি চক্কর দিয়ে বেরিয়ে গেলো। সাপটিকে দেখার জন্য মুজাহিদরাও বেরিয়ে এলো।

সাপটি বিস্ময়কর আচরণ করতে লাগলো। কোন মুজাহিদ মারার জন্য তেড়ে আসলে সাপটি ফনা ধরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সাপটি নিজে নিজেই একটু অগ্রসর হতো, কিছুদূর এগিয়ে আবার ফিরে আসতো। এভাবে বার বার সাপটি অগ্রসর হচ্ছিলো এবং বারবার ফিরে আসছিলো। একবার সাপটি এসে আলীর দু'পা জড়িয়ে মাথা নাড়তে লাগলে আলী তীক্ষ্ণ নজরে সাপটির মাথার দিকে চেয়ে রইলো, যাতে ছোবল দিতে চাইলে মাথা ধরে ফেলা যায়।

আলীর পা ছেড়ে সাপটি একবার কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে আবার এসে লেজ দিয়ে আলীর দু'পা জড়িয়ে আলীকে সামনের দিকে টানতে লাগলো। আলী সাপের অস্বাভাবিক আচরণে পুলকিত হচ্ছিলো। কয়েকজন মুজাহিদ আলীকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, কমান্ডার সাহেব, বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করা ঠিক নয়!

একজন সাপের মাথায় আলতোভাবে আঘাত করলে আলী তাকে ধমক দিয়ে বললো, সাপটিকে আর কেউ আঘাত করবে না।

সাপটি আলীকে প্রায় টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য লেজ দিয়ে আলীর পা প্যাচিয়ে টানতে লাগলো এবং পা ছেড়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে আবার আলীর দিকে ফিরে আসছিলো। সাপের অদ্ভুত আচরণে আলী সাপের অনুগামী হলো। সাপের পিছু পিছু অগ্রসর হলে ক্যাম্পের কয়েকটি স্থাপনা ঘুরে সাপটি রাস্তায় নেমে ক্যাম্পের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। আলী এবং সাথী মুজাহিদরা সাপের পিছু পিছু প্রায় আধা মাইল পথ এগিয়ে গেলো। হঠাৎ এক জায়গায় সাপটি ফনা ধরে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো এবং একটি নালার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কি যেন দেখাতে লাগলো। মুজাহিদরা নালার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলো, দু'টি লাশ পড়ে রয়েছে।

আলী ও সাথীরা মৃত দু'টি লাশের কাছে গিয়ে দেখলো, দু'মুজাহিদ মৃতাবস্থায় পড়ে রয়েছে। এদের শরীর নীল হয়ে গেছে। উভয়ের পায়ে সাপে কাটার দাগ স্পষ্ট।

এক মুজাহিদ বললো, এই চালাক সাপটিই এদের দংশন করেছে, এটাকে মেরে ফেলা উচিৎ।

তারা যখন সাপটিকে খুঁজতে শুরু করলো, ততক্ষণে সাপটি উধাও হয়ে গেছে। বহু খোঁজ করেও আর সাপটির কোন হদিস পাওয়া গেল না।

আলী মৃত মুজাহিদদের সনাক্ত করার জন্য তাদের পকেট চেক করলো। এরা উভয়েই ছিল কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদ গ্রুপের মুজাহিদ। এক মুজাহিদের পকেটে আলী একটি চিঠি পেয়ে তা খুলে পড়লো। চিঠি পড়ে আলী হতবাক হয়ে গেলো। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো। আসমানের দিকে মুখ করে আলী বললো, 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার শুকরিয়া কি ভাবে আদায় করবো। হে প্রভূ! তুমি যদি এই বোকাদের সাহায্য না করতে তাহলে দুরন্ত শত্রুরা আমাদের নিমিষেই খতম করে দিতো।'

সকল সাথী মুজাহিদ তখন বিস্ময়াভিভূত হয়ে আলীর দিকে তাকিয়ে রইলো, আলীর মুখ থেকে বিষয়টির জানার জন্য। লাশ দুটিকে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো।

ক্যাম্পে গিয়েই আলী দশজন মুজাহিদকে কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার জন্য পাঠালো। মুজাহিদরা তখনও অন্তর্নিহিত ঘটনার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। এক মুজাহিদ জানতে চাইলে আলী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো একটু সবুর করো, অচিরেই সব জানতে পারবে।

কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলো। আলী সকল মুজাহিদ চৌকিতে টেলিফোন করে বললো, প্রহরাধীন মুজাহিদরা ছাড়া বাকী সকল মুজাহিদসহ দায়িত্বশীল কমান্ডারগণ দ্রুত সদর দফতরে উপস্থিত হও।

অল্পক্ষণের মধ্যে সকল মুজাহিদ সদর দফতরের সামনে এসে জড়ো হলো। আলী একটু উঁচু জায়গায় উপবেশন করে লাশ দু'টিকে উচিয়ে ধরার জন্য নির্দেশ দিলো। এর পর সাপের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনাপূর্বক বললো, আমরা সাপের পিছু পিছু এ লাশ দু'টির ওখানে গিয়ে এদের একজনের পকেট থেকে এ চিঠিটি উদ্ধার করি। এ চিঠিটি কমান্ডার ঈদ মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক রুশ হেডকোয়ার্টার প্রধানের নামে লেখা। এতে আমাদের ক্যাম্পের বিস্তারিত নক্সা ছাড়াও মুজাহিদদের যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে।

আমি এজন্য তোমাদের ডেকেছি যে, যাতে তোমরা নিজ চোখে বেঈমানদের লাশ দেখে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারো। যে সব বেঈমান আমাদের জীবন ধ্বংস ও ঈমানের সামান্য স্বার্থ অর্জনে নেমেছিলো আল্লাহ তাআলা শুধু বিষধর সাপের আঘাতে এদের ধ্বংসই করেননি বরং সকল ষড়যন্ত্র শিকড়সহ উপড়ে ফেলেছেন। লাশগুলোর দিকে চেয়ে দিখো, বিষাক্ত সাপের ছোবলে নীল হয়ে গেছে ওরা। আখেরাতে যে এদেরকে আরো কতো কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

মুজাহিদ বন্ধুগণ! জেনে রেখো, যারা পার্থিব সম্পদের মোহে ঈমান বিক্রি করে, দুনিয়ায় এরা কোনক্রমে শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও আখেরাতে এদের ভাগ্যে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি অবধারিত। আশা করি, আগামীতে কোন দুর্বল ঈমানদার মুজাহিদ গাদ্দারী করার আগে আজকের বেঈমানদের কথা স্মরণ করবে।

সমবেত সকল মুজাহিদ বেঈমান গাদ্দার ঈদ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে লাগলো। সকল মুজাহিদ গাদ্দার ঈদ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি বিধানের দাবী জানালো।

আলী তাদেরকে আশ্বাস দিলো, গাদ্দারকে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে যে, আগামীতে কোন মুজাহিদ সদস্য যেন গাদ্দারী করার সাহস না পায়।

আলী সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশে বললো, আজ রাতে আমরা সবাই দু'রাকাত শুকরিয়া নফল নামায পড়বো। আল্লাহ্ তা'আলা এই ষড়যন্ত্রের কূটকৌশল ফাঁস না করে দিলে সহজেই শত্রু বাহিনী এই ক্যাম্পের উপর বিজয় পতাকা উড়াতো, ফলে আমরা অধিকাংশই নিহত হতাম।

সকল মুজাহিদ 'ইয়া রাহিম, ইয়া রাহমান' তকবির ধ্বনী তুলে নিজ নিজ চৌকির দিকে অগ্রসর হলো। আলী প্রাণভরে সিজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো।

একটি সাপের বদৌলতে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কবল থেকে পুরো ক্যাম্প রক্ষা পেলো। আফগান রণাঙ্গনে বিস্ময়কর খোদায়ী মদদের এ এক মহোত্তম নির্দশন।

★ ★ ★ ★ ★

ভর দুপুর। আলী আব্দুর রহমান ও মুহাম্মাদুল ইসলামের সাথে রাশিয়ার মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিলো। এ সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠলো। আলী রিসিভার তুললে প্রধান চেকপোস্ট থেকে গার্ড বললোঃ মাননীয় কমান্ডার! মোটর সাইকেল অপারেশন ফোর্সের এক মুজাহিদ আপনার সাথে কথা বলতে চায়। আলী সাক্ষাৎ প্রার্থী মুজাহিদকে টেলিফোন দেয়ার জন্য বললে আগন্তুক মুজাহিদ নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, 'আজ রাতে রুশ বাহিনীর এক চৌকিতে সফল অপারেশন শেষে ফেরার সময় এক বৃদ্ধ মহিলার সাথে পথে দেখা হয়। মহিলা আমাদের পথ রোধ করে মুজাহিদ ক্যাম্পের রাস্তা জানতে চাইলেন। বৃদ্ধা ছিলেন আহত। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তাঁর একমাত্র মেয়েকে রুশ বাহিনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বৃদ্ধা মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে সাক্ষাত করতে চান। আমরা তাকে মোটর সাইকেলে বসিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি।

আলী মুজাহিদকে বললো, তুমি বৃদ্ধা মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

দূর থেকে দেখেই আলী আগন্তুক মহিলা যে তাহেরার আম্মা, তা চিনে ফেললো। তাহেরাকে রুশ শয়তানরা অপহরণ করেছে, তা ভেবে আলী রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ক্ষোভে

দুঃখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে দ্রুত উঠে তাহেরার আম্মাকে সালাম জানালো। আব্দুর রহমান এবং মুহাম্মাদুল ইসলামও আলীর অনুসরণ করলো।

আব্দুর রহমান তাহেরার আম্মাকে দেখেই চিন্তামগ্ন হয়ে গেলো। কয়েকদিন আগেও আব্দুর রহমান এক মুজাহিদ মারফত খবর নিয়ে জেনেছিলো যে, তাহেরা মাকে নিয়ে কুশলেই আছে। তবে এতদূর ঝুঁকিপূর্ণ পথ মাড়িয়ে তিনি এখানে কেন? আব্দুর রহমান অজানা আশংকার কথা আলীকে বললে আলী জানালো, তাহেরাকে রুশরা অপহরণ করেছে।

অপহরণের সংবাদ শুনে আব্দুর রহমানের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। সমস্ত গায়ে জ্বলে উঠলো প্রতিশোধের অনলশিখা। আব্দুর রহমানের অদম্য ক্রোধ এক্ষুণি উড়ে গিয়ে বোনকে শত্রুমুক্ত করে পাপিষ্টদের টুকরো টুকরো করে দিতে ইচ্ছে হলো।

একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে তাহেরার আম্মা প্রায় উন্মাদিনীর মতো মুজাহিদ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আব্দুর রহমানকে দেখামাত্র তিনি আবেগজড়িত কান্নায় বললেনঃ 'হে আমার মুজাহিদ পুত্র! তোমার যে বোন তোমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের একমাত্র ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছে, তাকে আজ ভোরে রুশ বাহিনী অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আমি বাধা দিতে গেলে ওরা আমার পাজরে আঘাত করেছে।' এই বলে তাহেরার মা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

আলী তাহেরার আম্মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'আম্মা! তাহেরা শুধু আপনার কন্যাই নয়, সে সকল মুজাহিদের বোন, ইজ্জত ও মর্যাদার প্রতীক। মুজাহিদরা শত প্রাণের বিনিময়েও তাকে উদ্ধার করবেই, ইনশাল্লাহ্।

আলী আব্দুর রহমানকে বললো, আম্মাকে খাস মেহমানখানায় রেখে দ্রুত আমার রুমে এসো।

বিষাদের কালিমা আলীর হৃদয়রাজ্যে তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করলো। মৃত্যু বার বার আলীর মাথায় উপর আঘাত হেনেছে, কিন্তু কখনও তা আলীকে বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু আজ আলী বিষন্ন ক্রুদ্ধ ব্যথিত। তাহেরাকে উদ্ধার করার ব্যর্থতার আশংকা আলীকে মোটেও উদ্বিগ্ন করছেনা। আলীকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করছে এই বিষয়টি যে, যদি আমরা পৌঁছানোর বিলম্বে শত্রুরা তাহেরার সম্ভ্রমহানী ঘটায়, তাহলে কিভাবে আমি তাহেরাকে মুখ দেখাব!

আলী গভীরভাবে ভাবছিলো। তাহেরা উঁচু পর্যায়ের আত্মমর্যাদা ও খোদাভীরু মেয়ে, বদ্ধ কামরায় সে হয়তো সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে চোখের পানিতে ওড়না সিক্ত করছে।

আলী অশ্রুশিক্ত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলো, আল্লাহ! জিহাদের প্রতি পদে তুমি আমাকে অবারিত সাহায্য করেছো। আজ আমি তোমার এক পূণ্যাত্মা বাদীর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি। প্রভূ! আমি তাকে অক্ষত উদ্ধার করতে চাই। কিন্তু এক্ষুণি তো আমি সেখানে পৌঁছাতে পারবো না। তুমি মহাপরাক্রমশালী, সকল শক্তির আধার।

যে তরুণী, যুবতী তোমার দ্বীনের জন্যে আপন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করেছে, গায়েবী শক্তিবলে তুমি তাকে সাহায্য করো, তার ইজ্জত রক্ষা করো। ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর।

অনেকক্ষণ আলী আল্লাহর দরবারে কায়োমনোবাক্যে ফরিয়াদ শেষে রুশ গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন উবায়দুল্লাহর কাছে ওয়ারলেস করলো। লাইন ওকে হলে আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে বললেন, আজ রুশ বাহিনী তাহেরা নাম্নী এক তরুণীকে অপহরণ করেছে, ওর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এক্ষুণি আমার জানা দরকার।

ইত্যবসরে মেহমানখানায় তাহেরার আম্মাকে পৌঁছে দিয়ে আব্দুর রহমান আলীর কক্ষে পা রাখলো। তার চোখ থেকে যেন আগুনের স্ফূলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। গম্ভীর হয়ে গেছে আব্দুর রহমান। মুখে কোন কথা ফুটছে না। বার বার সে আলীর দিকে তাকাচ্ছিলো। আলীরও মাথায় খুন চড়ে গেছে, তবুও নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে আব্দুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আব্দুর রহমান! ভেঙ্গে পড়ো না। তাহেরার জন্য তোমার চেয়ে আমিও কম উদ্বিগ্ন নই। কিন্তু আবেগতাড়িত কোন পরিকল্পনা তাহেরার কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনবে। ঠান্ডা মাথায় স্থির চিত্তে কাজ করতে হবে।

আব্দুর রহমান বললো, আমি ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি যে, যে মেয়ে আমাদের জীবন বাঁচাতে নিজের ভাইকে হত্যার মতো কঠিন কাজ করেছে, সে এখন শত্রুদের হাতে বন্দী! তার জীবন ও ইজ্জত ধ্বংসের মুখোমুখি! দিন চলে যাচ্ছে, এখনো আমরা তার সাহায্যে অগ্রসর হতে পারলাম না। তাহেরা কি মনে করবে আমাদের! ভাই হিসেবে আমরা তার জন্য কী করতে পারছি?'

আব্দুর রহমানকে সান্ত্বনা দিয়ে আলী বললো, তাহেরার অপহরণের জন্য আমরাই দায়ী। আমরা ঐ দিনই তাহেরা ও তার মাকে সাথে নিয়ে এসে পাকিস্তান না পাঠিয়ে ভুল করেছি।

আলী ও আব্দুর রহমানের প্রতিটি মুহূর্ত অস্বাভাবিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। গোয়েন্দা অফিসার ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর সাথে আর ওয়ারলেসে কোন যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। বহু চেষ্টার পর ঘন্টাখানিক বিলম্বে ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহর অফিসের ডিউটি অফিসার জানালো, ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ ও সহযোগী গোয়েন্দা অফিসার এখনও অফিসে ফিরে আসেননি। তারা তাহেরার অনুসন্ধানে বাইরে গেছেন।

দু' ঘন্টা পর ওয়ারলেস সেটে ম্যাসেজ আসতে শুরু করলো। ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ জানালেন, তাহেরাকে রুশ অফিসার ক্যাপ্টেন অজিরফ অপহরণ করিয়ে এনেছে। এ বদমাশ এ শহরে আসার পর থেকে প্রতি সপ্তাহেই কোন না কোন তরুণীর সম্ভ্রমহানী করছে। সুন্দরী তরুণী চোখে পড়লে বদমাশটা তার সর্বনাশ না করে ক্ষ্যান্ত হয় না। পাপিষ্ট আফগান কম্যুনিষ্টরা ওর অপকর্মে সহায়তা করে। আমজাদ খান নাম কনরপশু কম্যুনিষ্টই তাহেরাকে অপহরণের নেতৃত্ব দিয়েছে। আমজাদ একসময় তাহেরার ভাইয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। তাহেরার ভাই সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, বিপ্লব বার্ষিকীর দিনে

মুজাহিদরা তাকে হত্যা করেছে। তাহেরার ভাই নিজেও পথভ্রষ্ট বিলাসী কম্যুনিষ্ট ছিলো। তবে তাহেরাকে অপহরণ করানোর পরই রুশ অফিসার অজিরফকে কাবুল ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাহেরা এখনও ওর বাসায় বন্দী রয়েছে।

আলী ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহকে বললো, আমরা মোটর সাইকেলে করে তাহেরাকে উদ্ধার করতে আসছি। আমরা আসার ফাঁকে আপনি অজিরফের বাসার অবস্থানের ম্যাপ এবং এ মহল্লার পাহারাদারদের পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন, শহরের পূর্বদক্ষিণের আহমদ খান লেনের বাগানে আমরা মিলিত হবো। শহরের নিকটবর্তী মুজাহিদ চৌকিগুলোতে টেলিফোনে আলী নির্দেশ দিলো, নিজ নিজ চৌকির দুর্ধর্ষ মুজাহিদদের নিয়ে আহমদ খান লেনের বাগানের পূর্ব তীরে উপস্থিত থাকতে। আব্দুর রহমানকে বললো, বিশেষ ফোর্স থেকে দশজনের একটি গ্রুপ তৈরী করো। আর মুহাম্মদুল ইসলামের উদ্দেশে আলী বললো, তোমাদের বিশেষ ফোর্সের দক্ষতার আজ পরীক্ষা হবে।

আহমদ খান লেনের লেকের পূর্বতীরে পৌঁছতে মুজাহিদদের রাত সাড়ে এগারাটা বেজে গেলো। ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ এবং জেলা শহরের আশ-পাশের গুপ্ত মুজাহিদ চৌকির শ' দুয়েক মুজাহিদ পূর্বেই সেখান পৌঁছেছিলো।

উপস্থিত সকল মুজাহিদকে অপারেশনের উদ্দেশ্য এবং তাহেরার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করা হলো। মুজাহিদরা যখন জানতে পারলো যে, মুজাহিদদের জীবন বাচাতে সে নিজ সহোদর ভাইয়ের প্রাণ সংহার করেছোল, তখন সকল মুজাহিদ আবেগে উজ্জীবিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলো যে, তাহেরা শুধু আব্দুর রহমানের বোন নয়, সে সকল মুজাহিদের বোন, মুসলিম মিল্লাতের গর্ব, মর্যাদার প্রতীক। এই আত্মাভিমানী বিদূষী মুজাহিদ যুবতীর কিছু হলে এই শহরের প্রতিটি রুশ ও কম্যুনিস্ট আমরা টুকরো টুকরো করে এর প্রতিশোধ নেব।

মুজাহিদদের অস্বাভাবিক উত্তেজিত হতে দেখে আলী সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললোঃ উত্তেজনা নয়, আমাদের ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

আলী উপস্থিত মুজাহিদেরকে তিন গ্রুপে ভাগ করে এক গ্রুপকে পিছন দিকের সম্ভাব্য শত্রুআক্রমণ এবং ফেরার পথের দিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দিলো। যদি রুশ বাহিনী মুজাহিদদের আটকানোর জন্য এ পথ বন্ধ করে দিতে চায়, তাহলে তাদের হটিয়ে দেবে এ গ্রুপ। আশিজনের এ গ্রুপে মর্টার, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দেয়া হলো।

পনের জনের একটি গ্রুপ আলী নিজের সাথে নিলো। এদের মধ্যে দশজন আব্দুর রহমানের বিশেষ ফোর্সের সদস্য, এদের সম্পর্কে আব্দুর রহমানের ধারণা, এদের একজনই শত রুশ সৈন্যের মোকাবেলায় যথেষ্ট। এ ছাড়া অবশিস্ট মুজাহিদদের প্রতি আলী নির্দেশ দিলো, শহরের বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট লিডার আমজাদ খানকে জ্যান্ত না হয় মৃত ধরে নিয়ে আসতেই হবে।

ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ আলীর সামনে রুশ অফিসার ক্যাপ্টেন আজিরফের বাসার নক্সা ও ভিতরে সম্ভাব্য সহজ প্রবেশ পথের চিত্র তুলে ধরলো। তাহেরাকে কোন ঘরটিতে আটকে রাখা হয়েছে, এর একটি সম্ভাব্য দিক নির্দেশনাও দিলো।

ক্যাপ্টেন অজিরফের সরকারী বাসভবনের দু'টি প্রবেশ পথের একটি সম্মুখ দিয়ে অন্যটি পিছন দিক থেকে। সম্মুখ ভাগের রাস্তায় যেতে হলে একটি সেনা ব্যারাক ও দু'টি চৌকি পেরিয়ে যেতে হবে এবং এ পথে পাহারাও কড়া। সেনা সংখ্যাও বহু। পিছনের পথটি অত্যাধিক সরু, সংকীর্ণ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন, তবে পাহারাদার এ পথে কম। আলী পিছনের পথটিকেই বেছে নিলো। এ পথে ঝুঁকি কম, কারণ আলী বড় ধরণের মোকাবেলায় কিংবা রক্তপাতের ভয় আদৌ করেননি, তার ভয় হচ্ছিলো, বড় ধরনের সংঘাত হলে শেষ পর্যন্ত তাহেরাকে ওরা মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে অথবা তার ইজ্জত কিংবা জীবন কেড়ে নিতে পারে। অসংখ্য রুশ হত্যা করে বিরাট সাফল্যের চেয়ে আলীর কাছে এখন তাহেরার জীবন ও ইজ্জত, মর্যাদা বড় করে দেখা-ছিলো সময়ের দাবী।

আশিজনের প্রহরাধীন গ্রুপকে রেখে বাকী গ্রুপ দু'টি শহরে প্রবেশ করলো। আলীর বিশেষ ফোর্স বাগানের ঘন গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগুচ্ছিলো। আলী তাদের নির্দেশ দিলো, এক সাথে না গিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে দু'জনের গ্রুপ করে অগ্রসর হও এবং অতর্কিতে হামলা করে প্রহরীদের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করো। আব্দুর রহমানের বিশেষ প্রশিক্ষিত আট মুজাহিদ গ্যাসমাস্ক পরে ক্রোলিং করে ইপ্সিত শিকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। বাগানের ভিতর পড়ে থাকা গাছের শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিতে প্রহরীরা সচকিত হয়ে কান পেতে দাঁড়ালো। কিন্তু ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিতার মতো ওদের ধরে মুহূর্তের মধ্যে খতম করে দিলো মুজাহিদরা। অতঃপর এদের কাঁধে করে নিয়ে এলো আলীর কাছে। এ সাফল্য ছিলো আলীর প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশী, অথচ এ মুজাহিদদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ মাত্র দু'মাস, সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ শেষ হতে আরো দু'মাস বাকী।

রাস্তার পাহারাদারদের খতম করার ফলে মুজাহিদদের সেনা ব্যারাকে প্রবেশের বাধা দূর হয়ে গেলো। অতি সন্তর্পনে একজন একজন ক্রলিং করে মুজাহিদরা ব্যারাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। ব্যারাক পেরিয়ে দু'শ গজ অতিক্রম করে বাউন্ডারী দেয়ালে পৌঁছার আগেই দেখা গেলো, দু'টো প্রশিক্ষিত কুকুর টহল দিচ্ছে। কুকুর দু'টো মুজাহিদদের উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই আব্দুর রহমানের বিশেষ ফোর্সের চার মুজাহিদ এদের নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের কর্মকুশলতার পরিচয় দিলো। চার মুজাহিদ হঠাৎ করে কুকুর দু'টোর কাছে এমন ক্ষীপ্র গতিতে পৌঁছে গেলো যে, দু তিন বারের বেশী কুকুর দু'টি আর ঘেউ ঘেউ শব্দ করার অবকাশ পেলো না।

আলী দেখলো, কুকুর দু'টো মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু মুজাহিদরা কুকুর দু'টোর ঘাড় ঝাপটে ধরে বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে মিনিটের মধ্যে ঠান্ডা করে ফেলেছে।

দশজন সাথীকে ক্যাপ্টেন অজিরফের বাসভবনের বাইরে রেখে পাঁচজনকে নিয়ে আলী ভবনের মধ্যে প্রবেশ করলো। এক এক করে চারটি কক্ষ তালাশ করে আলী পঞ্চম কামরায় পৌঁছলো, আলী দেখলো, কক্ষের ভিতরে এক তরুণী নামায পড়ছে, উল্টো দিকে হওয়ায় তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য মুখোমুখি হলেও তাহেরার চেহারা দেখে আলী তাকে চিনতে পারতো না। কারণ ঐ দিন আলী তাহেরার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলো বটে, কিন্তু চেহারা দেখার অবকাশ ছিলোনা। তাছাড়া তাহেরাদের বাসায় আলী আশ্রিত হলেও সেদিন তাহেরা আলীর সামনে আসেনি। ফিরে আসার সময়ও ওর মুখমন্ডল ওড়নায় আবৃত ছিলো।

নামাজ শেষ করে তাহেরা সালাম ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকালে আলীর সাথে তার চোখাচোখি হয়। মুহূর্তে তাহেরা ও আলী উভয়ে নিজেদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। তাহেরাকে দেখে আলীর মনে হলো যে, বেহেস্তের কোন হুর মর্তে চলে এসেছে বুঝি। সর্বাঙ্গ থেকে টপকে পড়ছে সৌন্দর্যের জ্যোতি। শান্ত নিরীহ সৌম্য অবয়বে পূন্যাত্মার কমনীয়তার ছাপ স্পষ্ট।

আলীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এ তরুণী তাহেরা বৈ আর কেউ নয়। তবুও জিজ্ঞেস করলো, তুমিই কি তাহেরা?

জী হ্যাঁ! তাহেরা সংক্ষেপে জবাব দিলো।

আলী বললোঃ আমার নাম আলী। তোমার ভাই আব্দুর রহমান ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি শুধু জানতে চাই, কোন দুশ্চরিত্র কম্যুনিষ্ট বা রুশ সৈন্য এ পর্যন্ত তোমাকে কোন.................।

আলীর কথা শেষ না হতেই তাহেরা জবাব দিলো, না আপনাদের দেরী হয়নি। আল্লাহ্ যথা সময়েই আমার সাহায্যে আপনাদের পৌঁছে দিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই। আমি এক দেশপ্রেমী ঈমানদার মুজাহিদ কন্যা। দেশের মতো নিজের ইজ্জত ঈমান রক্ষায়ও আমি সচেতন। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে, ইজ্জতের উপর কোন হুমকি আসার আগেই আপনারা পৌঁছেগেছেন।

আলী রুশ ক্যাপ্টেন অজিরফের নামে একটি চিরকুট লিখে বিছানার উপর রেখে দিলো। চিরকুটে লিখলোঃ

'অজিরফ! তোমার সৌভাগ্য যে তুমি ঘরে ছিলে না। তোমাকে পেলে সাথে করে নিয়ে যেতাম। ইসলাম যদি অসহায় বধূ-কন্যাদের অপহরণের অনুমতি দিতো, তাহলে আজ আমি তোমার বোন-বউকে অপহরণ করে নিয়ে যেতাম। আগামীতে যদি কোন আফগান তরুণীকে অপহরণের খবর পাই, তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এটা স্মরণ রেখো।'

আলী তাহেরাকে বললো, আমার পিছু পিছু এসো।'

বাউন্ডারী দেয়ালের কাছে এসে আলী ভাবতে লাগলো, তাহেরাকে কি ভাবে দেয়াল পার করান যাবে। আলী দু'মুজাহিদকে নির্দেশ দিলো, তোমরা আগে দেয়াল পেরিয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াও, তাহেরা তোমাদের ঘাড়ে পা রেখে সহজে নামতে পারবে।

আলী তাহেরাকে বললো, অনেক উঁচু দেয়াল, তুমি টপকাতে পারবে না। আমার কাঁধে চড়ে দেয়ালে উঠো। ওদিক থেকে ওরা তোমাকে নামতে সাহায্য করবে।

তাহেরা কাঁধে চড়তে অস্বীকার করে বললো, আমি কোন মুজাহিদের কাঁধে পা রাখতে পারবো না। এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, আমি নিজেই দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করছি। আপনি দোয়া করুন।

আলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখলো, তাহেরা শুধু দেয়ালের উপর চড়লো না, বরং দেয়াল থেকে জাম্প দিয়ে দশ ফুট চওড়া নালাও নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেলো।

দেয়াল টপকিয়ে বাইরে এলে আব্দুর রহমান তাহেরার কুশলাদি জেনে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালো। তাহেরা বললো, ভাইজান! আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো, আপনি অবশ্যই আমার সাহায্যে আসবেন। বিকেল থেকেই আমি আপনার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম।

তোমার দুঃসংবাদ শোনার পর আমার মন তো উড়ে আসতে চাচ্ছিলো। আমার প্রতিটি মুহূর্ত কিয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে হাজির হচ্ছিলো। তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। আমাদের কমান্ডারও তোমার চিন্তায় ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলো। পূর্বে এর চেয়ে কঠিন সমস্যায়ও আমি তাকে এতো উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। কিন্তু তার পরও তার নির্দেশ ছিলো, আবেগের বশে যেন আমরা কোন অপরিণামদর্শী কর্ম না করে বসি। কারণ আমাদের ভুলের কারণে তোমার জীবন ও ইজ্জত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারত।

তাহেরা বললো, ভাইজান! আপনাদের কমান্ডার কে?

ও হে! তুমি তাকে চিনতে পারনি? তোমাকে উদ্ধারের জন্য ঘরে প্রবেশ করেছিলো, সেই তো আমাদের কমান্ডার! জনাব আলী।

তাহেরা বললো, আমি ভাবছিলাম, আপনাদের কমান্ডার কোন বয়স্ক ঋজু ব্যক্তি হবেন।

আব্দুর রহমান ও তাহেরার কথোপকথন দীর্ঘায়িত হতে দেখে আলী আব্দুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আব্দুর রহমান! বাকী কথা পরে বলা যাবে, এখন জলদি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা মোটেই নিরাপদ নয়।

সকল মুজাহিদ ব্যারাকের গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে এলো। আলী আশংকা করছিলো, সদর গেটের প্রহরীদের সাথে হয়তো মোকাবেলা করতে হবে, কিন্তু অপর দিকের পাহারাদাররা সম্ভবতঃ টেরই পায়নি যে, এদিকে এতো বড় সফল অপারেশন মুজাহিদরা সমাপ্ত করে ফেলেছে।

ব্যারাকের বাইরে এসে তাহেরার উদ্দেশে আলী বললো, পথে রুশ বাহিনীর সাথে আমাদের লড়াই হতে পারে, এমন হলে সাথে সাথে মাটিতে তোমাকে শুয়ে পড়তে হবে এবং সব সময় ভাই আব্দুর রহমানের সাথে থাকার চেষ্টা করবে।

আহমদ খান লেনের বাগান পর্যন্ত পৌঁছতে মুজাহিদদের কোন রুশ বাহিনীর মোকাবেলা করতে হলো না। নির্বিঘ্নে তারা বাগানে অপেক্ষমান মুজাহিদদের কাছে পৌঁছে গেলো। বাগানে অপেক্ষমান মুজাহিদদের কাছে আলী বিশেস ফোর্স ও তাহেরাকে নিয়ে পৌঁছার একটু পরেই দ্বিতীয় গ্রুপ কম্যুনিস্ট আমজাদ খান ও আরো কমুনিষ্ট লিডারকে ধরে নিয়ে এলো।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় রাতের প্রকৃতি ছিলো মনোরম, ঝরঝরে পরিস্কার। একে অন্যের চেহারা দেখতে পাচ্ছিলো। আলী ধৃত কমুনিস্টদের উদ্দেশে বললো, তোমরা এতই নিকৃষ্ট মানব কীট যে, নিজের মা-বোনদের অপহরণ করে রুশ নরপশুদের আখড়ায় পৌঁছে দিতে তোমাদের আত্মমর্যাদায় মোটেও বাধে না, তোমরা মানুষ নামের হায়েনা। আফগান জাতির কলঙ্ক। মৃত্যু-শাস্তিও তোমাদের জন্য নগণ্য।

আলী কথা শেষ করতেই একপাশ থেকে তাহেরা আমজাদ খানের মুখোমুখি এসে বললো, 'অবিশ্বাসী কাপুরুষ আমজাদ খান! আমার আল্লাহ কতো শক্তিশালী এখন দেখতে পাচ্ছো? আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাকে আমি আমার ইজ্জত ভিক্ষার অনুরোধ করেছিলাম। তুমি আমাকে তিরস্কার করে বলেছিলে, 'তোর আল্লাহকে ডাক, আমরা তোর আল্লাহকে মানি না। যদি তোর কোন খোদা থেকে থাকে তবে সে এসে আমাদের হাত থেকে তোকে রক্ষা করুক।' এখন দেখতে পাচ্ছো, আমার আল্লাহ আমাকে তোমাদের মতো দুরাত্মা পাপিষ্টদের কব্জা থেকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু তোমাদের প্রভূ, রুশ বাহিনী তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।'

তাহেরার জবাবে আমজাদ খান কি যেনো বলতে চাচ্ছিলো, এক মুজাহিদ এসে ওর মুখে কষে এক থাপ্পড় মেরে বললো, খবরদার, বেঈমান! তোর নাপাক মুখ আর খুলতে হবে না। একটি রা বেরুলে জিহ্বা ছিড়ে ফেলবো।'

আলী ধৃত কম্যুনিস্টদের গুলী করে হত্যার নির্দেশ দিয়ে বললোঃ ওদের লাশ বিশেষ করে আমজাদ খানের লাশ শহরের চৌরাস্তার খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে লিখে দিবে, আগামীতে যদি কোন কম্যুনিস্ট কোন নিরীহ আফগান কন্যা-বধূকে অপহরণ করে তবে তার পরিণাম হবে এর চেয়েও ভয়াবহ।

আলীর উপস্থিতিতেই কম্যুনিস্ট পাপিস্টদের গুলী করে হত্যা করা হলো। মুজাহিদরা সন্তর্পণে নিজ নিজ ক্যাম্পে চলে গেলো। আলী বাকী সাথীদের নিয়ে ফজরের আগেই হেড কোয়ার্টারে ফিরে এলো। তাহেরা মায়ের সাথে বিশেষ মেহমানখানায় মিলিত হলো।

রুশ বাহিনী মুজাহিদদের বিস্ময়কর অভিযানে ভীত হয়ে পড়লো। তাহেরাকে উদ্ধারের তিন দিন পর অভ্যর্থনা চেকপোস্ট থেকে আলীকে জানানো হলো, ক্যাপ্টেন

অজিরফের এক দূত আপনার সাথে দেখা করতে চায়। আলী তাকে জিজ্ঞেস করলো, হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত এ লোক পৌঁছলো কি করে?

চেকপোস্ট থেকে জানানো হলো, ও এখানে পৌঁছতে পারেনি। নিরাপত্তা প্রহরীদের হাতে ও ধৃত হয়েছিল। এরপর ওর চোখ বেঁধে এখানে আনা হয়েছে।

রুশ ক্যাপ্টেন অজিরফের পাঠানো দূতের কাছ থেকে একটি চিঠি আলীর কাছে পৌঁছানো হলো। চিঠিতে ক্যাপ্টেন অজিরফ লিখেছে ঃ

'ডিয়ার আলী!

আপনার আত্মীয়া তরুণীকে অপহরণের জন্য আমি দুঃখিত। আমি অত্র অঞ্চলের জননিরাপত্তার জন্য আপনার সাথে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিসাক্ষরে আগ্রহী। আপনার গুপ্ত অভিযানে বহু বেসামরিক লোকের প্রাণহানী ঘটছে এবং শহরে আতংক বিরাজ করছে। আমরা এ শহরের সাধারণ মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ বন্ধের ইচ্ছা করেছি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমরা আপনার অধীনস্ত এলাকায় কোন হামলা করবো না এবং আপনাকেও আমাদের সেনা বাহিনীর ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের দেড় হাজার গ্রেফতারকৃত সৈন্যকে আপনার মুক্তি দিতে হবে। অবশ্য এজন্য আমরা আপনাকে মোটা অংকের মুক্তিপণ দেবো। যদি আপনি আমার প্রস্তাব মেনে নেন তবে যে স্থানেই আপনি মিলিত হতে আগ্রহী সেখানেই আমি আসবো।

ইতি আপনার হিতাকাংক্ষী -

ক্যাপ্টেন অজিরফ।'

অজিরফের চিঠি পড়ে আলী স্মিত হাসলো। সহকর্মী মুজাহিদ নেতাদের সাথে পরামর্শ করে আলী রুশ কমান্ডার আজিরফকে লিখলোঃ

'ক্যাপ্টেন অজিরফ!

হয়তো তুমি অতিশয় ধুরন্দর, না হয় খুবই বোকা! তোমার জেনে রাখা উচিৎ, যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি দু' রাষ্ট্রের মধ্যে হয়ে থাকে। ঘরে প্রবেশকারী ডাকাত। চোরদের সাথে গৃহস্থের কখনও সন্ধি হয় না। তোমরা আগ্রাসী ডাকাত-আমাদের ঘর-বাড়ী দেশে তোমরা জোর করে প্রবেশ করেছো। আগ্রাসী ডাকাতদের তাড়িয়ে নিজেদের ঘরবাড়ী পুনরুদ্ধার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ডাকাতদের সাথে আবার কিসের সন্ধি? তোমাদের উচিৎ, যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধিচুক্তির অপেক্ষা না করে আমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাও। তোমরা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেই তোমাদের ফিরে যাওয়া এবং অপরাধ ক্ষমা করার বিষয় নিয়ে চিন্তা করব।

তুমি লিখেছো, আমাদের অভিযানে সাধারণ মানুষের প্রাণহানী ঘটছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, অসংখ্য শহর গ্রাম মুজাহিদ পল্লীতে কারা হাজার হাজার টন বোমা, গোলা নিক্ষেপ করে সব ধ্বংস করেছে? বিষাক্ত গ্যাস ও অগণিত মাইন পুঁতে

রেখে এবং খেলনা বোমার আঘাতে লাখো নিরপরাধ আফগান শিশুকে হত্যা কারা করেছে? কারা লাখ লাখ আফগান যুবক বৃদ্ধকে হত্যা করেছে, কারা চার লাখ মা বোনকে বিধবা করেছে। কারা লাখ লাখ শিশু এতীম করেছে। কারা লাখো নব পরিণিতাকে স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করেছে?

তোমরা করেছো। মানবতার উপর ধ্বংসের কবর রচনা করে চলেছো তোমরা। লাখো নিরপরাধ আফগান স্বাধীনতাকামী মুজাহিদকে নির্মমভাবে হত্যার পর মুজাহিদদের হাতে মাত্র কয়েকজন দেশদ্রোহী নিহত হওয়ার কারণে তোমাদের মানবতাবোধ (?) চীৎকার দিয়ে উঠেছে বুঝি!

আমি তোমাকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের বাঁচার একটিই পথ, এ দেশ ছেড়ে তোমরা চলে যাও। আর হ্যাঁ, স্মরণ রেখো, যদি দ্বিতীয়বার কোন নিরীহ আফগান মেয়েকে অপহরণ করো, তাহলে নিশ্চিত থেকো, তোমার মৃত্যুদূত হিসেবে শহরের প্রবেশ করবো।

ইতি
তোমার মৃত্যুদূত
আলী
এরিয়া কমান্ডার

পরদিন রুশ কমান্ডার অজিরফের প্রতিনিধি আবার এসে আলীকে বললো, সন্ধিচুক্তির ব্যাপারটি দ্বিতীয়বার গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন সাহেব। অন্যথায় আমরা স্পটনাজ ফোর্স নামাতে বাধ্য হবো।

আলী রুশ প্রতিনিধিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলো, 'তোমার ঐ কমান্ডার রুশ ভল্লুকটিকে বলো, মুজাহিদরা আল্লাহ ছাড়া কোন ফোর্সকে ভয় করে না। আমরা বাঘ সিংহ সব হায়েনাকেই মোকাবেলা করতে জানি। আর তোমাকে বলছি, দ্বিতীয়বার যদি এ প্রস্তাব নিয়ে এ মুখো হও, তাহলে তোমাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেয়া হবে না। চোর, ডাকাত, বদমাশদের প্রতিনিধির সাথে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের কথা বলা, ঘৃণ্য চুক্তির কথা মুখে আনা মরণজয়ী মুজাহিদ ও অগণিত শহীদের জান্নাতবাসী আত্মার সাথে বেঈমানী করার শামিল।

রুশ প্রতিনিধিকে তাড়িয়ে দিয়ে আলী সিনিয়র মুজাহিদদের নিয়ে পরামর্শ সভা ডাকলো। ক্যাম্পের নিরাপত্তা প্রহরা আরো জোরদার এবং জনবল বৃদ্ধি করা হলো। রাতের প্রহরীদের ঘোড়া দেয়া হলো, যাতে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে।

আলী আব্দুর রহমানকে ডেকে বললো, 'স্পটনাজ হামলা যে কোন সময় হতে পারে। তুমি তোমার ফোর্সের প্রশিক্ষণ দ্রুত শেষ করে ফেলো। আর রাতের বেলায় সব সময়

এদের তৈরী রেখো।' গোয়েন্দা হেড অফিসে কর্নেল ওবায়দুল্লাহকেও আলী নির্দেশ দিলো স্পটনাজ হামলা সম্পর্কে যথা সময়ে অবিহিত করতে।

একদিকে স্পটনাজ হামলা প্রতিরোধের মরণপণ সংগ্রাম। অন্যদিকে বিশেষ মেহমানখানায় তাহেরার অপেক্ষা। শত প্রতিকূলতা ও ব্যস্ততার মাঝে ভাই আব্দুর রহমান ও কমান্ডার আলীর হৃদয়ে ভেসে ওঠে তাহেরার উজ্জ্বল নিষ্পাপ মুখশ্রী। তারা ভাবে তাহেরার নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু প্রেম? না, গতানুগতিক প্রেমের অপচ্ছায়া আচ্ছন্ন করতে পারেনি কমান্ডর আলী কিংবা তাহেরা কাউকেই। কিন্তু তার পরও তো জীবন থেমে থাকে না, প্রেম মানে না যুদ্ধ, বিগ্রহ, স্বাধীনতা, পরাধীনতা। ইতিমধ্যেই তাহেরার হৃদয়ের মনিকোঠার বিশাল শূন্যতা দখল করে নিয়েছে কমান্ডার আলী। এদিকে জীবন বাঁচানোর অভিযানে ভাইকে হত্যার মতো কঠিন ত্যাগ আলীর কঠিন হৃদয়ে এঁকেছে তাহেরার ভালোবাসা।

একদিন দুপুর বেলা। বিশেষ ফোর্সের প্রশিক্ষণ চলছে। আব্দুর রহমান রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কমান্ড দিচ্ছে। কমান্ডার আলী প্রশিক্ষণ দেখতে এসে একটি গাছের ছায়ায় বসেছে। এক অবসরে আব্দুর রহমান এসে আলীর পাশে বসতে বসতে বললো, প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেলো, তাহেরা ও আম্মী এখানে এসেছেন —

আলী, হ্যাঁ! এ ব্যাপারে আমি উদাসীন নই। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের পাকিস্তান পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

আব্দুর রহমানঃ কিন্তু আমি যে তোমাকে ভিন্ন একটি কথা বলতে চাই।

আলীঃ যা বলার এখনই বলো, আমি এখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে পারবো।

আব্দুর রহমান বললো, আলী! তুমি একদিকে আমার ভাই, অপরদিকে আমার বন্ধু। আর তাহেরা আমার বোন। আমার ধারণা ছিলো , তুমি নিজেই এ ব্যাপারে কথা তুলবে। কিন্তু জিহাদের দায়িত্ব ও ব্যস্ততা তোমাকে বস্তু জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, এটা মন্দ নয় খুবই ভালো। কিন্তু বিয়ে তো তোমাকে আজ না হয় কাল করতেই হবে। আমার খুব ইচ্ছে হয় যে, তুমি অনুমতি দিলে এ ব্যাপারে তাহেরা ও আম্মীর সাথে কথা বলবো।

আলীঃ ভাই আব্দুর রহমান! আফগানিস্তান সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আগে বিয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না। তাছাড়া আমার জীবনে এক মিনিট বেঁচে থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। তুমি নিজেই ভেবে দেখো, এখন যে একাগ্রচিত্তে জিহাদ করছি, বিয়ে

শাদী করার পর কি তা সম্ভব হবে? এজন্যে ভাই এখন বিয়ে নয় জিহাদ চালিয়ে যাওয়া বেশী দরকার।

আব্দুর রহমানঃ আমি তোমাকে এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো যে, তোমার মতো সব মুজাহিদরা যদি বিয়ের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করে আর আরো অজানা কাল পর্যন্ত এ জিহাদ চলতে থাকে, তবে দেশে জন্মহার হ্রাস পাওয়ার ফলে দেখবে একদিন মুজাহিদ সংকট দেখা দেবে। তাই জিহাদ চালু রাখার স্বার্থেও বিয়ে দরকার। যাতে জিহাদ করতে করতে এক প্রজন্ম শেষ হয়ে গেলেও দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে শূন্যস্থান পুরণ করতে পারে। আর তাহেরা এমন এক মেয়ে, যে তেমার জিহাদের পথ রুদ্ধ করে রাখবে না বরং জিহাদ চালিয়ে যেতে তোমাকে মানসিক শক্তি জোগাবে।

আলীঃ অবশ্য তোমার প্রতিটি কথাই ভেবে দেখার মতো। আমাকে দু'দিন সময় দাও। আমি একটু ভেবে দেখি।

আলী সোজা সেখান থেকে উঠে নিজের কক্ষে চলে এসে চেয়ারে বসে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। একদিকে জিহাদের গুরুদায়িত্ব, যুদ্ধের কঠিন সময়, অন্য দিকে আব্দুর রহমানের তীক্ষ্ণযুক্তি আর তাহেরার মতো ত্যাগী মেয়ে। সকল চিন্তা পিছে ফেলে আলী ভাবলো, বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে তাহেরার চেয়ে ভালো মেয়ে আর দ্বিতীয়টি হবার নয়।

তাহেরার ঈমানদীপ্ত ঘটনাটি তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। একটি অজ্ঞাত পরিচয়হীন তরুণী দ্বীন ইসলামের স্বার্থে দু'জন মুজাহিদের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের একমাত্র ভাইকে অবলীলায় হত্যা করতে পারে, তা এ যুগে বিস্ময়কর। সে দিন থেকে নিজের অজান্তেই আলীর হৃদয়-রাজ্যে তাহেরা একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। ওই দিনে ঈমানদীপ্ত তাহেরার ক্ষীণ কণ্ঠের দৃঢ় বলিষ্ঠ কথাগুলো সব সময়ই আলীর কানে বাজতে থাকে। আলীর আশংকা হচ্ছে, বিয়ে তার জিহাদ পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায় কিনা। এক পর্যায়ে আলী সকল ভাবনার ইতি টেনে আনমনে বল্লো, না আলী! জিহাদ ছাড়া বিয়ের মতো আয়েসী কর্ম নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তোমার নেই।

পর দিন দেখা হলে আব্দুর রহমান আলীর প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিলঃ বন্ধু আলী! গত কালের প্রস্তাবের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলে?

আলীঃ ভাই আব্দুর রহমান! বিয়ের ব্যাপারে আমার অনীহা নেই। তবে আমি তোমার কাছে কয়েকটি ব্যাপারে জানতে চাই?

আব্দুর রহমানঃ বলো, তোমার কি জানার ইচ্ছে হয়।

আলীঃ আচ্ছা! তাহেরা কি এ বিয়ের ব্যাপরে সম্মত? ব্যাপারটি এমন নয় তো যে, প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে এবং অসহায়ত্বের সুযোগে আমরা এর প্রতিদান নিচ্ছি।

আব্দুর রহমানঃ তাহেরার মতামত না জেনে বিয়ের সিদ্ধান্ত হবে না আমার ধারণা। তোমার মতো বীর মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে বিয়ের প্রস্তাবকে শুধু তাহেরাই নয়, যে

কোন আফগান মেয়ে নিজের জন্য মর্যাদা ও ইজ্জতের ব্যাপার বলে গর্ববোধ করবে। তাহেরা এই বিয়েতে সম্মত না হওয়ার কোন কারণ নেই।

আলীঃ আমি আরেকটি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই যে, বিয়ের পরেও তাহেরা থাকবে পাকিস্তানে এ ব্যাপারটিও জানানো দরকার।

আব্দুর রহমানঃ আরো কোন কথা আছে কি?

আলীঃ না।

আব্দুর রহমান আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা তাহেরার অবস্থানগৃহে চলে গেলো। আব্দুর রহমানের একান্ত ইচ্ছা, তাহেরা পাকিস্তান রওয়ানা হওয়ার আগেই যেন বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। সে যখন তাহেরার ঘরে এলো তখন তাহেরা কক্ষে ছিলো না। আব্দুর রহমান তাহেরার আম্মীকে বললোঃ 'আম্মী! তাহেরা সম্পর্কে আপনার সাথে দু'টি কথা বলতে এসেছি।

তাহেরার মাঃ বেটা! কি কথা? বলো।

আব্দুর রহমানঃ তাহেরার বিয়ের কাজটা আমি সেরে ফেলতে চাচ্ছি।

তাহেরার মাঃ বেটা! তাহেরার ভাই হয়ে তুমি যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আমাকে তো জানতে হবে যে, কার সাথে তুমি তাহেরার বিয়ে দিচ্ছো?

আব্দুর রহমানঃ তাহেরা যদি অসম্মত না হয়, তবে কমান্ডার আলীর সাথেই তার বিয়ে হবে।

তাহেরার মাঃ বেটা! আমার মেয়ের এর চেয়ে বেশী মর্যাদার ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, কমান্ডার আলী হবে ওর স্বামী।

আব্দুর রহমানঃ আম্মী! তাহেরা এলে আমি ওর সাথেও এ ব্যাপারে কথা বলে তার অভিমত জানতে চাই।

একটু পরেই তাহেরা কক্ষে প্রবেশ করলো। তাহেরার মা আব্দুর রহমানকে লক্ষ করে বললেন, বেটা! তাহেরা এসেছে, তুমি ওর সাথে কথা বলতে পারো।

তাহেরাঃ আম্মী! ভাইজান কি জানতে চাচ্ছেন?

তাহেরার মাঃ সে তোমার বিয়ের ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে চায়।

বিয়ের কথা শুনে তাহেরার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। সে উড়নায় মুখ ঢেকে নীরব হয়ে যায়। আব্দুর রহমান কথার রেশ ধরে বললোঃ হ্যাঁ, বোন তাহেরা! তুমি আম্মীর কথার জবাব দাও!

তাহেরাঃ ভাইজান! আমি এর কি জবাব দেবো। দেশ এখনও যুদ্ধ-কবলিত, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী জাতি। আর আপনি কি-না আমার বিয়ে নিয়ে ভাবছেন!

আব্দুর রহ্মানঃ তোমার বিয়ে জিহাদী কার্যক্রমে কোন বিঘ্ন ঘটাবে না। আমি চাচ্ছি বোনটিকে পাকিস্তান পাঠাবার আগেই বিয়ের পবিত্র দায়িত্ব সেরে ফেলতে।

তাহেরাঃ ভাইজান! দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমি বিয়ে করতে আগ্রহী নই।

আব্দুর রহমানঃ বিস্ময়কর! এতো দেখি উভয়ের ধ্যান-ধারণার আশ্চর্য সমন্বয়।

তাহেরাঃ ভাইজান! কোন দু'জনের মধ্যে মিলের কথা বলছেন?

আব্দুর রহমানঃ হ্যাঁ বোন! যার সাথে তোমার বিয়ে দেয়ার কথা বলছি, তাকেও অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে হয়েছে। আর তুমিও দেখি সেই একই সমস্যা উত্থাপন করলে। না-না, এসব নয়। আমি শুধু তোমার কাছে জানতে চাই, কমান্ডার আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

আলীর নাম শুনতে তাহেরা লজ্জায় চেহারা নীচু করে নিলো। সে ভাবলো, আলীর মতো বীর মুজাহিদের সাথে আমার বিয়ে! আল্লাহ কি এতো বড় ভাগ্যবতী আমাকে করবেন? নীরবে তাহেরা কক্ষ ত্যাগ করে নিজের শয়নকক্ষে চলে গেলো। আব্দুর রহমানও তাহেরার পিছে পিছে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলো।

আব্দুর রহমান ভাবছিলো, আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তাহেরা হয়তো সম্মত নয়, এজন্য কক্ষ ছেড়ে চলে এসেছে। কারণ আব্দুর রহমানের সমাজের মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে মুরুব্বীদের সম্মুখে যে ভাবে খোলাখুলি কথা বলে, আফগান মেয়েরা যে এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তা সে জানতো না। তারপরও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শহুরে পরিবারের মেয়ে তাহেরা নিজের বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট কথা বলেছে, অন্যান্য আফগান মেয়েরা তো মুখ উড়নায় ঢেকে শুধু হ্যাঁ, না টুকু কোন মতে উচ্চারণ করে মাত্র।

আব্দুর রহমান তাহেরার শয়নকক্ষে এসে তাহেরাকে লক্ষ্য করে বললোঃ আমার কথায় দুঃখ পেয়ে তুমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছো। অনিচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আগামীতে আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বিয়ের কোন কথা তুলবো না।

তাহেরাঃ ভাইজান, রাজী নই একথা আপনাকে কে বললো? আমার তো মনে হচ্ছে, আফগান মেয়েদের আচরণ সম্পর্কে আপনি মোটেই ধারণা রাখেন না।

আব্দুর রহমানঃ ওহ! তার মানে হলো, আলীর সাথে বিয়ের ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি নেই?

তাহেরাঃ আমি কি বলবো, আম্মীকে জিজ্ঞেস করুন।

আব্দুর রহমানঃ আম্মী এই বিয়েতে খুবই খুশী। কিন্তু আলীর কয়েকটি শর্ত আছে।

তাহেরাঃ কি শর্ত?

আব্দুর রহমানঃ সে চায় বিয়ের পর তোমরা পাকিস্তান থাকবে।

তাহেরাঃ কেন? এখানে থেকে আপনাদের সাথে জিহাদে শরীক হওয়া যাবে না?

আব্দুর রহমানঃ কমান্ডার মনে করেন, মুজাহিদ ক্যাম্পে মহিলার অবস্থান কিংবা ক্যাম্পের আশেপাশে শিশু ও মহিলাদের থাকা খুবই বিপজ্জনক। আলী এমন এক কমান্ডার, যার প্রতিটি আশংকা এবং অভিমত বাস্তবে পরিণত হতে দেখেছি।

তাহেরাঃ আপনি যখন বলছেন, কমান্ডার সাহেবের প্রতিটি কথা ও অভিমতই বাস্তবে পরিণত হয়, তবে আমি আর কি করে বলতে পারি যে, অবাস্তবও হতে পারে।

আব্দুর রহমানঃ তাহেরা! তোমার বিচক্ষণতা ও সম্মতির জন্যে তোমাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তোমার দাম্পত্য জীবন সুখী, সুন্দর ও শুভ হোক।

কয়েকদিন পর অত্যন্ত অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে আলী ও তাহেরার বিয়ে হয়ে গেলো। এত বড় কমান্ডার ও সকল মুজাহিদের প্রিয়পাত্রের শুভবিবাহ নীরবে হয়ে যাওয়ায় সকল মুজাহিদ উষ্মা প্রকাশ করলো। ক্যাম্প জুড়ে প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো একই কথা। আমরা ওলীমা অনুষ্ঠান করবো, সবাইকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সকল মুজাহিদের চাহিদা ও আগ্রহের সম্মানে আলী মুজাহিদদের জন্য ওলীমার ব্যবস্থা করলো।

আব্দুর রমহান প্রস্তাব করলো যে, ওলীমা অনুষ্ঠানে সকল মুজাহিদের উপস্থিতি এবং আনন্দের সুবাদে স্পেশাল ফোর্সের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও রণকৌশলের প্রদর্শনী হবে। আলী আব্দুর রহমানের এই প্রস্তাবকে এ বলে নাকচ করে দিলো যে, মুজাহিদদের মধ্যে কোন স্পাই থাকলে আমাদের স্পেশাল ফোর্সের খবর ওরা জেনে যাবে। আমি চাই স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলায় আমাদের স্পেশাল ফোর্স ওদের অজ্ঞাতে ফেরেশতার মতো মৃত্যু পরওয়ানা হয়ে ময়দানে আসবে। স্পটনাজ ফোর্স মুজাহিদদের মূলো গাজরের মতো উপড়ে ফেলার ইচ্ছা নিয়ে যখন আগ্রসর হবে, তখন স্পেশাল ফোর্সের মুজাহিদরা এদেরকে মুরগীর বাচ্চার মতো জবাই করবে। আলীর পরিকল্পনা আব্দুর রহমানের মনঃপুত হলো। আব্দুর রহমান তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করলো।

বিয়ের তিনদিন পর আলী তাহেরা ও তার মাকে পাকিস্তান রওয়ানা হওয়ার জন্য সব কিছু গুছিয়ে তৈরী করে রাখতে বললো।

বিদায় মুহূর্তে আলী তাহেরাকে স্নেহালিঙ্গনে বেঁধে বললো, 'আমার হৃদয় তোমাকে একাকী দূরে চলে যেতে কিছুতেই দিতে চাচ্ছে না, কিন্তু জাতির মুক্তির চিন্তা ও ভয়াবহ যুদ্ধাবস্থার কারণে তোমাদের জন্য পাকিস্তানই নিরাপদ স্থান। যে তরুণী দ্বীন ইসলামের

প্রেমে নিজ ভাইকে হত্যা করতে পারে, সে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আমার চেয়ে নিঃসন্দেহে ভালো বুঝে। আমি আশা করি, পাকিস্তানে তোমরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করবে। পাকিস্তানে পৌঁছে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা, জিহাদ ও আমার জন্যে দু'আ করতে যেন ভুলে যেয়ো না।

আলীর কথা শেষ হলে তাহেরা বললো, 'প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে হয় না। এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, পাকিস্তানে গিয়ে স্বদেশ, মুজাহিদ ও আপনার কথা আমি মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হতে পারবো। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিলো, আপনার সাথে থেকে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জিহাদে শরিক হবো। কিন্তু আপনার নির্দেশ আমাকে যেতে বাধ্য করছে। তবে একথা জেনে রাখুন যে, ওখানে গিয়ে আমার হৃদয়-মন এখানে আপনার কাছেই পড়ে থাকবে।'প্রতি মুহূর্তে আমার কামনা থাকবে, শীঘ্রই যেন আমার প্রিয় মাতৃভূমি শত্রু মুক্ত হয়, মুজাহিদরা বিজয় অর্জন করে। আমি আশা করি, দ্বিতীয় বার আপনার সাথে যখন দেখা হবে, তখন প্রথমেই আপনার মুখে স্বাধীনতার সুসংবাদ শুনবো।

তোমার মতো সচেতন আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্না বীরাঙ্গণা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমি চাই বিদায় মুহূর্তেও তোমার ঠোঁটে যেনো হাসি ফুটে থাকে এবং মুখে থাকে দেশ ও মুজাহিদের সফলতার জন্যে দু'আ। যদিও বা দু'চোখ গড়িয়ে অশ্রু নেমে আসে, তবে সে অশ্রু বিরহ কাতরতার জন্যে নয়, তা হবে স্বদেশ ত্যাগের মানসিক যন্ত্রণা।' আলী বললো।

তাহেরা বললো, 'আমার হৃদয়ে আপনার ভালোবাসা ও প্রেম কতো গভীর আপনার মতো বিশাল হৃদয়ের মুজাহিদের পক্ষে তা অনুধাবন করা হয় তো সহজ কিন্তু তারপরও নিজ দ্বীন, মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মুজাহিদদের সফলতার জন্যে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করার সৎ সাহস আমার আছে। এমনকি দ্বীনের স্বার্থকে আপনার ভালোবাসার ঊর্ধ্বে স্থান দিতেও আমার তেমন কষ্ট হবে না।'

আলী তাহেরাকে বললো, 'খলীল নামে আমার একমাত্র ছোট ফুফাতো ভাই পাকিস্তানের এক মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। দুনিয়াতে তুমি আমি ছাড়া ওর আর আপন কেউ নেই। পাকিস্তান পৌঁছেই তুমি আগে ওর খোঁজ নিও। ওকে ডেকে এনে বোনের স্নেহ ও মায়ের আদর দিও। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যদি অনুমতি দেয়, তা হলে খলিলকে তোমাদের সাথে রেখো।'

ছোট্ট হলেও পুরুষশূন্য থাকার চেয়ে একজন ছেলে বাসায় থাকা ভালো, সে তোমাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারবে। খলিলের সাথে যতোবার আমি দেখা করতে গিয়েছি, প্রতিবারই সে আমার সাথে জিহাদে চলে আসার জন্য গো ধরতো। আমি ওকে অনেক বলে-কয়ে লেখা পড়ার স্বার্থে রেখে এসেছি। তোমাকে পেলে সে জিহাদে চলে আসার জন্য জিদ ধরবে। ওকে এই বলে বোঝাবে যে, জিহাদের চেয়ে এখন তোমার ইলম অর্জন করা বেশী প্রয়োজন। জিহাদ শেষ হলে দেশ পুনর্গঠনের

কাজে বহু বিজ্ঞ আলেমের প্রয়োজন হবে। এজন্য তোমাকে বড় আলেম হতে হবে। আগে লেখা পড়া শেষ করো, তারপর জিহাদে শরীক হবে।'

আলী পাকিস্তানে অবস্থিত মুজাহিদ হেডকোয়ার্টার প্রধানের নামে লেখা এবং খলিলের জন্য লেখা দু'টি চিঠি তাহেরার হাতে দিয়ে বললো, এগুলো তাদের হাতে পৌঁছে দিও। তোমাদের থাকা-খাওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য আমি চীফ কমান্ডারকে লিখে দিয়েছি। আশা করি কোন অসুবিধা হবে না।'

কিছু টাকা তাহেরার হাতে দিয়ে আলী বললো, এগুলো নিজের কাছে রাখো, দরকার হতে পারে, পাকিস্তান পর্যন্ত আমি তোমাদের পৌঁছে দিতাম, কিন্তু স্পটনাজ ফোর্সের আক্রমণ আশংকায় ক্যাম্প ছেড়ে যেতে পারছি না। পাকিস্তান পৌঁছেই তোমাদের অবস্থা জানাবে।

আলী তাহেরার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। আব্দুর রহমান ও তাহেরার আম্মা আসবাব পত্র গুটিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আব্দুর রহমান তাহেরার হাতে কিছু টাকা ও একটি স্বর্ণের আংটি তুলি দিয়ে বললো, 'যুদ্ধাবস্থায় প্রিয় বোনকে দেয়ার মতো আমার হাতে আর কিছুই নেই। যুবায়দার জন্য কাবুল থেকে এ আংটিটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম। হতভাগ্য এ ভাইটিকে যেন স্মরণ থাকে, স্মৃতি স্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপহারটি তোমার হাতে রেখো।'

তাহেরাঃ ভাইজান, যুবায়দা কে? যার কথা আপনি স্মরণ করলেন।

আব্দুর রহমানঃ 'ওহ! ওর পরিচয় বলতে ভুলে গেছি। যুবায়দা আমার ফুফাতো বোন এবং আমার বাগদত্তা স্ত্রী।

তাহেরাঃ এরপর আমি আপনার এ আংটি নিতে পারি কি?

আব্দুর রহমানঃ তোমার এ হতভাগ্য ভাইটির সন্তুষ্টির জন্য হলেও তোমাকে এ আংটি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমি ভীষণ কষ্ট পাবো। যদি আমি জিহাদে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে এ আংটি অন্ততঃ আমার প্রিয় বোনটিকে তো ভাইয়ের কথা স্মরণ করাবে। তুমি ছাড়া এখানে আর কে-ই-বা আছে, যে হাত তুলে আমার জন্য একটু দু'আ করবে।'

তাহেরাঃ এক শর্তে আমি এ আংটি গ্রহণ করতে পারি।

আব্দুর রহমানঃ বলো। তোমার কি শর্ত।

তাহেরাঃ এ আংটি আমানত হিসেবে আমি রাখছি। যুবায়দাকে যখন আমি এটা ফিরিয়ে দিতে চাইবো, তখন আপনি কোন আপত্তি করতে পারবেন না। আর আপনি যখন রাশিয়া যাবেন, তখন অবশ্যই আমার সাথে দেখা করে যাবেন। যদি দেখা করা সম্ভব না হয় তবে আমার পক্ষ থেকে একটি সুন্দর উপহার কিনে যুবায়দাকে দিবেন। (আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে) সেটির দাম তার কাছ থেকে নিবেন। যুবায়দাকে বলবেন,

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং যাতায়াত সম্ভব হবে, আমি যুবায়দাকে দেখতে রাশিয়া যাবো।

আব্দুর রহমানঃ যুবায়দা যদি নিজেই তোমার কাছে চলে আসে?

তাহেরাঃ সে তো আরো বেশী খুশির কথা। তা হলে আমি ওকে চির দিনের মতো ভাবী করে ঘরে তুলবো।

আলী এ এলাকার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাদের আঞ্চলিক মুজাহিদ হেড অফিস থেকে মুজাহিদ সদর দফতর পর্যন্ত পুরাতন রাস্তাগুলোর মেরামত এবং আরো নতুন রাস্তা নির্মাণ করিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করেছিলো। সদর দফতরের সাথে নিরাপদে স্বল্প সময়ে যোগাযোগের জন্য আলী মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়েছিলো।

ছয়জন মুজাহিদকে দু'টি গাড়ি দিয়ে আলী বললো, সদর দফতর পর্যন্ত এদের পৌঁছে দিয়ে এসো। খুব সতর্ক থাকবে, যেনো শত্রু বাহিনীর বিমান হামলার মুখে না পড়ো।

অতি সতর্কতার সাথে দু' দিন ক্রমাগত পথচলে তাহেরা ও তার মাকে নিয়ে মুজাহিদরা সদর দফতরে পৌঁছলো। চীফ কমান্ডার আলীর বিয়ের কথা জেনে অত্যন্ত খুশী হলেন। তখনই তিনি ওয়ারলেসে আলীকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন, তোমার বিয়ের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলাম। তোমাকে নিজের সন্তানের মতো ভাবতাম। কিন্তু না জানিয়েই যে বিয়ে সেরে ফেললে?'

আলীঃ 'আপনাদের জানাতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। সব কিছু হঠাৎ করেই হয়ে গেলো। আপনাদেরকে জানানোর সুযোগই পেলাম না।'

চীফ কমান্ডারঃ বেশ, ভালই হলো। নতুন জীবনের এ শুভলগ্নে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাহেরা এখানে নিরাপদে পৌঁছে গেছে। ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো। আমি সকল দায়িত্ব নিচ্ছি। ও আমার পুত্রবধু হিসেবে দু'দিন এখানে বেড়াবে। এর পরই তাদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবো।

নির্বিবাদে তাহেরা পাকিস্তান পৌঁছে গেলো। পাকিস্তান আসার দু'দিন পরই তাহেরা খলিলের মাদ্রাসায় গিয়ে হাজির হলো। খলিল তাহেরার পরিচয় ও সান্নিধ্য পেয়ে খুবই খুশী হলো। খলিল অনুযোগের স্বরে বললোঃ 'ভাবী! আলী ভাইজান বিয়েতে আমাকে নেয়নি কেন? ভাইজানের প্রতি আমার খুব রাগ হচ্ছে।'

তাহেরা আলীর কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে আজ দু'সপ্তাহ হলো। হেডকোয়ার্টার থেকে মুজাহিদরা অন্য দিনের মতো আজ ডাক নিয়ে এলো। ডাক পিওন মুজাহিদ চিহ্নিত ব্যক্তিগত চিঠিটি আলীর হাতে দিলে আলী প্রথম দৃষ্টিতেই দেখলো, তাহেরার হাতের লেখা।

★ ★ ★ ★ ★

তাহেরা কুশল বিনিময়ের পর জানিয়েছে, নির্বিঘ্নে তারা পাকিস্তানে পৌঁছেছে। খলিলের ব্যাপারে জানালো, খলিল মাদ্রাসায়ই থাকে। খাওয়া-দাওয়া তাহেরার বাসায় করে। আব্দুর রহমানের নামেও তাহেরা আলাদা একখানা চিঠি লিখেছে।

ইত্যবসরে আঞ্চলিক রুশ সেনাঘাঁটি এবং কাবুল সেনাসদর থেকে আলীকে একই সাথে জানানো হলো যে, 'আগামী দু'দিন পর তৃতীয় রাত্রে আপনার ক্যাম্পে স্পটনাজ হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

আলী সেদিন রাত থেকেই আব্দুর রহমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ ফোর্সকে ক্যাম্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত করলো। মোটর সাইকেল ফোর্স, অশ্বারোহী ইউনিট ও গাড়ী বহরকে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হলো। পুরো ক্যাম্পে পূর্ণ সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা হলো। যে কোন পোস্টে আক্রমণের খবর দ্রুত পৌঁছানোর নির্দেশ দেয়া হলো।

আলী, আব্দুর রহমান, মুহাম্মদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ ও মুজাহিদ দরবেশ খান সেদিন থেকেই তৃতীয় রাত্র পর্যন্ত অব্যাহত রাত জাগার সিদ্ধান্ত নিলো। যাতে যে কোন আক্রমণের সমুচিত জবাব দেয়া যায়।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত রাতের প্রায় দু'টার সময় ক্যাম্প থেকে মাইল তিনেক দূরে হেলিকপ্টার থেকে স্পটনাজ সেনা অবতরণ শুরু হলো, আলী স্পটনাজ অবতরণের সাথে সাথেই সেনা অবতরণ স্থলের পূর্ণ বিবরণ পেয়ে গেলো। আলী মুজাহিদদের নির্দেশ দিলো, অবতরণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে। অশ্বারোহী ইউনিট ও মোটর সাইকেল ফোর্সকে পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বললো, কোন স্পটনাজ সেনা যেন জিন্দা ফিরে যাওয়ার অবকাশ না পায়। এছাড়াও ক্যাম্পের সকল মুজাহিদকেই পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলা হলো যে, কোন স্পটনাজ সৈন্য যেন ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে। এছাড়াও ক্যাম্পের সকল মুজাহিদকে পূর্ণ সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দেয়া হলো।

স্পটনাজ ফোর্স অতবরণ করে ওপেন ফায়ার চালিয়ে তিন দিক থেকে মুজাহিদ ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ওরা মুজাহিদদের নাগালে আসা মাত্র এক সময়ে একেকজন মুজাহিদ ওদের উপর ক্ষীপ্র গতিতে ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়লো এবং আকস্মিকভাবে ঝাপটে ধরে, সাথে রাখা চাকু গলায় কিংবা গ্যাস নাকে ধরে হায়েনাগুলোকে মুহূর্তে ধরাশায়ী করছিলো।

যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো রাত দু'টার সময়, পাঁচটা পর্যন্ত তুমুল মোকাবেলা চললো। একেকটা স্পটনাজ হিংস্র গন্ডারের মতো গুলি উপেক্ষা করে গর্জে ওঠে ক্যাম্পের দিকে এগুচ্ছিলো। পাঁচটার পর এক পর্যায়ে স্পটনাজ বুঝতে পারলো, লক্ষ্যে

পৌছানো তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। প্রত্যেক মুজাহিদ মৃত্যুদূত হয়ে এদের সম্মুখে হাজির হচ্ছিলো। কিন্তু স্পটনাজ প্রশিক্ষণ এতোই দুর্ধর্ষ যে. পশ্চাদ্বাবনতীতি এদের যুদ্ধ নিয়মে নেই।

আব্দুর রহমান তার বিশেষ ফোর্সের প্রতিটি সদস্যকে এভাবে তৈরী করেছিলো যে, তারা প্রত্যেকেই একই সাথে তিনটি ক্লাসিনকভ দিয়ে গোলা বর্ষণ করে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে দ্রুতগতিতে ঘোড়া কিংবা মোটর সাইকেল চালিয়ে যেতে পারতো। সেই সাথে চলমান অবস্থায় লক্ষ্যভেদী গুলীও চালাতে সক্ষম ছিলো। আলী স্পটনাজ সৈন্য অবতরণের পর প্রয়োজনীয় নির্দেশ শেষে আল্লাহর দরবারে দু' হাত তুলে অনুনয়ের সাথে প্রার্থনা করছিলোঃ 'হে আল্লাহ! মুজাহিদদের উপর তোমার সাহায্য না হলে যতো উন্নত প্রশিক্ষণই গ্রহণ করুক, কাজে আসবে না। হে প্রভু! স্পটনাজ ফোর্সের মোকাবেলায় তুমি মুজাহিদদের সাহায্যে ফেরেশতা নাযিল করো।"

ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ওদের পলায়নপর অবস্থা দেখা মাত্র পিছন দিক থেকে অশ্বারোহী ও মোটর সাইকেল বাহিনীকেও ওদের ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলা হলো যে, কোন স্পটনাজ সৈন্য যেন ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে।

সকালে সূর্য ওঠার পর স্পটনাজ সৈন্যদের মৃতদেহগুলো এক জায়গায় জড়ো করা শুরু হলো। পুরো এলাকা খুঁজে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত আড়াইশ লাশ পাওয়া গেলো।

আলী স্পটনাজ সৈন্যদের মৃত দেহগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখলো, প্রকৃত পক্ষেই স্পটনাজ ফোর্স কল্পনাতিত দুর্ধর্ষ! ওদের লৌহস্তম্ভের ন্যায় শক্ত শরীর দেখেই এর সত্যতা আন্দাজ করা যায়। দাঁতগুলো জঙ্গলী জানোয়ারের মতো বড় বড়। কাঁচা গোশত খাওয়ার ফলেই হয়তো এদের দাঁতের অবস্থা এমন হয়েছে। গুলি এদের তেমন ঘায়েল করতে পারেনি। অধিকাংশের ঘাড়ই ছিল চাকুর দ্বারা কাটা কিংবা বিষাক্ত গ্যাসে চেহারা বিকৃত। স্পটনাজ ফোর্সের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলোও ছিলো অতি অত্যাধুনিক। মৃত সৈন্যদের দেখার পাশাপাশি অপরিচিত এই অস্ত্রগুলোকেও মুজাহিদরা পূর্ণ কৌতূহল নিয়ে দেখছিলো।

স্পটনাজ মোকাবেলায় প্রায় পঞ্চাশজন মুজাহিদ আহত এবং বিশজন শাহাদাত বরণ করে। বিশজন মুজাহিদের আত্মত্যাগের ফলে বর্বর রুশ বাহিনীর কঠিন থাবা থেকে মুজাহিদ ক্যাম্প রক্ষা পেলো এবং দুশমনদের গর্ব ধূলিস্যাত হয়ে গেলো।

আহত মুজাহিদদের ক্ষত ও যখম মুজাহিদ ডাক্তাররা ধরতে পারছিলো না। এগুলো কি দাঁতের কামড় না গুলির যখম তারা নিশ্চিত না হয়ে ওষুধ দিতে দ্বিধা করছিলো। আবার কোন কোন মুজাহিদের শরীরে দাঁতের আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ ক্যাম্পে বন্দী রাশিয়ান ডাক্তার ডেকে আনা হলে সে জানালো যে এগুলো প্রকৃতপক্ষে গুলি। স্পটনাজ ফোর্সের ব্যবহৃত কিছু গুলি এমন রয়েছে, যা এ ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে। অতঃপর রুশ ডাক্তারের পরামর্শে তার ওষুধ দেয়া হলো।

স্পটনাজ ফোর্সের ভয়াবহ ব্যর্থতা রুশ বাহিনীর জন্যে ছিলো কলংকের অধ্যায়, পরাজয়ের শেষ পর্যায়। বিশজন সুশিক্ষিত মুজাহিদের শাহাদাতের মাধ্যমে মুজাহিদদের জন্য যে গৌরবময় বিজয় অর্জিত হয়েছিলো, এর জন্য তাদের মধ্যে যেমন ছিল সফলতার সুখ সেই সাথে শহীদদের জন্য ছিলো গভীর দুঃখবোধ।

এই অসীম দুঃখ ও আনন্দঘন মুহূর্তে সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশে আলী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলো।

আলী তার ভাষণে বললোঃ 'ইসলামের বিজয়ী সেনানীরা! স্পটনাজ হামলার মোকাবেলায় বিস্ময়কর এ বিজয়ে আমি সর্বাগ্রে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া এ বিজয় সম্ভব ছিলো না।

কমান্ডার আব্দুর রহমান ও সকল মুজাহিদকে বিশেষ মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগের ফলে এ বিজয় সম্ভব হয়েছে। আমার বিশ্বাস, স্পটনাজ ফোর্সের শোচনীয় পরাজয়ের পর রুশবাহিনী আফগানিস্তানে থাকার চিন্তা ত্যাগ করবে। অতি শীঘ্র শ্বেত ভল্লুকদের অপবিত্র অবস্থান থেকে পবিত্র আফগান ভূমি মুক্ত করাই আমাদের ব্রত। আজকের এ বিজয়ের দিনে স্পটনাজ মোকাবেলা ও আফগান যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সকল মুজাহিদকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং তাদের প্রতি জানাচ্ছি স্বশ্রদ্ধ সালাম।

যে সকল মুজাহিদ নিজের জীবন উৎসর্গ করে রুশদের স্পটনাজ ফোর্সের গর্ব চূর্ণ করে দিয়েছে, আমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করে শাহাদতের পেয়ালায় চুমু খেতে পারি আমাদের সকলেরই এই কামনা পোষণ করা উচিৎ। আমি শপথ করছি, মৃত্যু পর্যন্ত শহীদদের অনুসৃত পথে অবিচল থাকবো এবং এতেই আমাদের জীবন ও কর্মের সফলতা নির্ভরশীল।'

আলীর অগ্নিঝরা বক্তৃতার পর সমবেত সকল মুজাহিদের সমকণ্ঠে 'আল্লাহু আক্‌বার, নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব' শ্লোগানে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠলো। এর পর স্পটনাজ যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী মুজাহিদদেরকে যথাযথ সম্মানে দাফন করা হলো।

মুজাহিদরা যখন কাঙ্খিত সাফল্যে বিজয় উৎসব করছিলো, ওদিকে রুশ কমান্ডার ক্যাপ্টেন জেবুনব ও ক্যাপ্টেন অজিরফ তখন মুজাহিদ ক্যাম্প দখল করে আলীর গ্রেফতারের খবরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। ওদের ধারণা ছিলো, কার্যকর কোন বাধা ছাড়াই নির্বিঘ্নে স্পটনাজ ফোর্স ক্যাম্প দখলে সক্ষম হবে। উভয় রুশজান্তা বিজয় সংবাদের অপেক্ষায় একত্রে বসে গ্লাসের পর গ্লাস ভদকা গিলছিলো। দুপুর গড়িয়ে যখন আসরের নামাযের সময় হয়ে এলো, তখন রুশ অফিসারদের মনে দেখা দিলো সন্দেহ! ওরা একটি সামরিক হেলিকপ্টারে চার রুশ সেনাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালো যে, গিয়ে জিজ্ঞেস করো, মুজাহিদ ঘাঁটি পতনের পরও এখন পর্যন্ত খবরটি আমাদের পাঠায়নি কেন?

হেলিকপ্টারবাহী রুশ সেনারা একেবারে মুজাহিদ ক্যাম্পের চৌহদ্দিতে এসে অবতরণ করলো। হেলিকপ্টার থেকে নামা মাত্রই মুজাহিদরা চার রুশ সেনাকে গ্রেফতার করে ফেললো। পাইলট দ্রুত হেলিকপ্টার নিয়ে পালাতে চাইলে মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত রকেটের আঘাতে সে-ও অবতরণে বাধ্য হলো। কমান্ডার আলী গ্রেফতারকৃত রুশ সেনাদের একজনের হাতে ক্যাপ্টেন অজিরফের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে পাঠালঃ

'কমান্ডার অজিরফ,

বিজয়ের সংবাদের জন্যে তোমরা অপেক্ষা করছো। শুভ সংবাদ নেয়ার জন্য আরো চার সেনাকে পাঠিয়েছো। তবে শোন! যে সব রক্তপিপাসু হায়েনাদের তোমরা পাঠিয়েছিলে, যে স্পটনাজ ফোর্সের উপর তোমাদের নির্ভরতা ও গর্বের অন্ত ছিলো না, আল্লাহর ফজলে মুজাহিদরা তোমাদের প্রশিক্ষিত গন্ডারদের একটিকেও জ্যান্ত ছাড়েনি। ফলে তোমরা পরাজয়ের দুঃসংবাদটিও পাওনি। তোমরা হয়তো খুবই দুঃখ পাবে যে, তোমাদের সুশিক্ষিত রুশ হায়েনাগুলো সাধারণ ভদ্র মুজাহিদদের ক্ষতি সাধন না করতে পেরে ভেড়ার মতো নিহত হয়েছে। তোমাদের শক্তি ও গর্বের স্পটনাজ ধ্বংস করে আল্লাহ তাআলা আমাদের বিশেষ সাহায্যে পুরুস্কৃত করেছেন, বিজয় দিয়েছেন।

আশা করি, এখন তোমাদের বোধোদয় হবে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জকারীদের পরিণাম কখনো শুভ হয় না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আবরাহার মতো বিশাল শক্তিকে অতি ক্ষুদ্র আবাবিল দ্বারা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। তোমাদের শক্তিশালী ট্যাংক, বিমান, মিসাইল, বোমা আল্লাহর শক্তির কাছে কোন হিসাবের বিষয় নয়।

এখনও সময় আছে। তোমাদের নেতাদের বলো, আফগান থেকে সকল রুশ সৈন্যদের ফিরিয়ে নিতে। অন্যথায় এমন দিন হয়তো বেশী দূরে নয় যে, তোমরা ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইবে, আর আমরা তোমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে মস্কো পর্যন্ত তোমাদের তাড়া করবো। মার্কিন বৃটিশের কোন সপ্ত নৌবহরও তোমাদের পরাজয় ঠেকাতে পারবে না। হিটলারের বাহিনীর মতো সময়ও তোমাদের অনুকূলে থাকবে না। কারণ, সময় আল্লাহর নির্দেশে পরিবর্তনশীল এবং আল্লাহ মুজাহিদদের সাহায্যে প্রতিশ্রুত।

ইতি
তোমাদের প্রতিপক্ষ
কমান্ডার আলী'

স্পটনাজ ফোর্সের সাফল্য ও মুজাহিদ ক্যাম্পের ধ্বংসের খবর শোনার জন্যে অজিরফের অফিসে রুশ অফিসারদের ভীর নেমেছিলো। কাবুলের হেড অফিসও খবর শোনার জন্য ছিলো উদগ্রীব। রুশ সেনা আলীর চিঠি নিয়ে পৌঁছলে অজিরফের অফিসে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা।

নীরবতা ভেঙ্গে এক অফিসার বললোঃ 'আমি আগেই সতর্ক করেছিলাম,বলেছিলাম, এটা আফগানিস্তান, পোল্যান্ড কিংবা চেকোশ্লাভিয়ার মতো এখানকার মানুষ স্পটনাজের কথা শুনলে প্রাণ ভয়ে পালাবে না।

স্পটনাজ ফোর্সের শোচনীয় পরাজয় ও ধ্বংসের কথা বিস্তারিত শুনে রুশ অফিসারদের চেহারা আঁধারে ছেয়ে গেলো। অন্য এক অফিসার বললোঃ 'এতোদিন স্পটনাজ নিয়ে আমাদের একটু গর্ব ছিলো আজ তা-ও নিঃশেষ হলো। ইউরোপ, আমেরিকায় এ সংবাদ পৌঁছলে আমাদের আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না।'

অন্য এক রুশ অফিসার বললো, 'আমি প্রশাসনকে প্রস্তাব করেছিলাম আলীকে উর্ধ্বতন সরকারী পদের লোভ দেখানো হোক। পদের লোভে অনেক বড় বড় ধর্মীয় দিকপালকেও বাগে আনা যায়। আলী আর কতো বড় মুজাহিদ নেতা।'

তৃতীয় আর এক অফিসার বললো, 'আমার কথা মানলে আজকে রুশ বাহিনীর এই মর্মন্তুদ পরাজয় ঘটতো না। আমি বলেছিলাম, কোন সুন্দরী রুশ মেয়েকে অত্যাচারিতের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে আলীর সাহায্যের জন্য পাঠাতে। মেয়েদের দ্বারা অনেক অসাধ্য কাজও নির্বিঘ্নে সমাধান করা যায়। মেয়ের ফাঁদে পড়ে না, এমন পুরুষ পৃথিবীতে কমই আছে। মেয়ে হাতিয়ারের চেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার দ্বিতীয়টি আর নেই। মেয়ের ফাঁদে ফেলে শুধু আলীকেই ফাঁসানো যেতো না, হাজার হাজার মুজাহিদকে আলীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতো। কিন্তু আমার কথায় কর্তৃপক্ষ কোন কর্ণপাত করলো না।'

রুশ কমান্ডার জেভোনভ বললো, 'এসব কৌশল এখনও ব্যবহার করা যাবে। তবে আমার মনে হয়, ওসবে কোন উপকার হবে না। আমার কাছে আলী শুধু একজন বিচক্ষণ মুজাহিদ কমান্ডারই নয়, তার সাহযোগীদের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত দূরদর্শী ব্যক্তি। স্পটনাজ ফোর্সের মুকাবিলায় এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন শক্তি টিকতে পারেনি। তিনশত স্পটনাজ ফোর্স ইচ্ছে করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো কাবুলকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। কিন্তু তারা আজ একটি সামান্য ক্যাম্প দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। মনে হয় আলীর নিকট স্পটনাজ ফোর্সের চেয়েও শক্তিশালী বাহিনী রয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি না, আলী কীভাবে এ অস্বাভাবিক শক্তির অধিকারী হলো। বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত আলী অকার্যকর করে দিলো। কয়েক বছর কোটি কোটি রুবল খরচ করে আমরা যে স্পটনাজ ফোর্স গড়ে তুললাম, তাকে পর্যুদস্ত করে দিলো! দেড় হাজার ছত্রীসেনাও আলীর পতন ঘটাতে পারলো না!

আমার মতে রুশ সরকারের কাবুল থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ। এমনও হতে পারে যে, কিছু দিন পর প্রত্যেকটি প্রদেশেই মুজাহিদ গ্রুপগুলো আলীর মতো ভয়ংকর রূপে দেখা দিবে।'

উপস্থিত রুশ অফিসারদের উদ্দেশে অজিরফ বললো, তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, বিগত আট বছরে আমাদের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে তারা কতটুকু হীনবল হয়ে গেছে।

আমাদের সেনাদের মনোবল এতোই দুর্বল হয়ে গেছে যে, ওরা আল্লাহতে বিশ্বাস না করলেও মুজাহিদদের গোলার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য উচ্চ দামে আফগানী হুজুরদের কাছ থেকে কুরআনের আয়াত লেখা তাবিজ গলায় ঝুলাচ্ছে। কোন সেনা বাহিনীর মনোবল এ পর্যায়ে উপনীত হলে ওদের পক্ষে কখনও বিজয় সম্ভব নয়।' জেভোনভ বললো।,

অপর এক রুশ অফিসার কর্নেল জেভোনভের প্রতিবাদ করলে কর্ণেল জেভোনভ বললো, মাই ডিয়ার অফিসার! তুমি নিজের বাম বাহুটাই একটু খুলে দেখাও না? তোমার বাজুতেও তো তাবিজ বাঁধা রয়েছে। তোমার মতো আরো অনেক উর্ধ্বতন অফিসারকেও তাবিজ ব্যবহার করতে আমি দেখেছি। আল্লাহতে বিশ্বাস না করলেও অনেক সেনা সদস্য মুজাহিদ আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তাদের কক্ষে কুরআন রেখে দিয়েছে। আমার আশংকা হয়, মুজাহিদদের ভয়ে আবার না রুশ সেনারা মুসলমান হতে শুরু করে! অবস্থা যদি এমনই হতে থাকে, তবে সমরকন্দ বুখারাও রক্ষা পাবে না।

যুদ্ধ যতই দীর্ঘায়িত হবে, রুশ সরকার ততই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। গত বছর থেকেই আমি রুশ কর্তৃপক্ষকে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরামর্শ কেউ গ্রহণ করছে না।

উর্ধ্বতন রুশ অফিসারদের মুখ থেকে এই প্রথম নিজেদের দুরবস্থার স্বীকৃতি পাওয়া গেলো। কর্ণেল জেভোনভকে এ স্বীকারোক্তির চড়া মূল্য দিতে হলো। পর দিনই রুশ কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতার করে মস্কোতে নিয়ে গেলো। আঞ্চলিক গোয়েন্দা প্রধান ক্যাপ্টেন ওবায়দুল্লাহ যথাযথভাবেই কর্ণেল জেভোনভ ও রুশ অফিসারদের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত ছিলো। কর্ণেল জেভোনভের গ্রেফতারীর খবরও যথা সময়ে সে জানতে পায়। ওবায়দুল্লাহ আলীকে এখানকার পরিস্থিতি ও জেভোনভের গ্রেফতারী সম্পর্কে অবহিত করলে আলী ওদের অর্বাচীন মন্তব্যে হাসলো।

আব্দুর রহমানের সাথে কথা প্রসঙ্গে আলী বললো, কর্ণেল জেভোনভ এক বাস্তববাদী বিজ্ঞ অফিসার ছিলো। সে রুশ বাহিনীর কল্যাণ করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলো। রুশ সরকার ওকে মস্কো ফেরত না নিয়ে গেলে জেভোনভকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতাম। আমার বিশ্বাস, এখানে নিয়ে আসতে সক্ষম হলে সে মুসলমান হয়ে যেতো। তাহলে আমরা একজন দক্ষ কমান্ডার পেয়ে যেতাম। আফসোস যে, ওর গ্রেফতারীর খবর আমার কাছে অনেক বিলম্বে পৌঁছেছে। যখন আর কিছু করার সময় ছিলো না।

বসন্তের এক বিকেল বেলা। আব্দুর রহমান একটি পাহাড়ী ঝর্ণাধারে বসে আনমনে পানিতে কাঁকর ছুড়ছে। আলী আব্দুর রহমানকে নীরবে বসে থাকতে দেখে চুপিচুপি তার পাশে এসে বসলো। আলী গভীরভাবে আব্দুর রহমানের দিকে লক্ষ্য করে বুঝলো, আব্দুর রহমান খুবই উদ্বিগ্ন।

আলী আব্দুর রহমানের উদ্দেশে বললো, আব্দুর রহমান! তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে, কী ব্যাপার?'

না! তেমন কোন দুঃশ্চিন্তা নেই, একটু ভাবছি আর কি। আব্দুর রহমান শুকনো জবাব দিলো।

আলী গভীর সমবেদনার স্বরে বললো, এমন কী ব্যাপার যে, তোমাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। আমি ব্যাপারটি জানতে পারি না?

আব্দুর রহমানঃ আজ রাতে আব্বা-আম্মাকে স্বপ্নে দেখলাম। এরপর থেকে মনটা তাদের জন্য তোলপাড় করছে। তা ছাড়া আজকে যুবায়দার কথাও খুব বেশী মনে পড়ছে। যুবায়দাকে তাহেরার প্রতিচ্ছবি বলা যায়। রুশ সমাজের কোন কুসংস্কারই ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। বৈরী পরিবেশে ও নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। ধর্মীয় ব্যাপারে সে অনেক জ্ঞান রাখে। আসার সময় আমি ওর সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। তখন সে কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলো।

আব্দুর রহমানের মনোবেদনা শুনে আলী নীরব হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললো, আব্দুর রহমান, তোমাকে যদি আমি আমু দরিয়া পার করে দেই, তাহলে নির্বিঘ্নে বাড়ী গিয়ে ফিরে আসতে পারবে?

বাড়ী যাওয়া আমার জন্য তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তবে আমি একা যেতে চাচ্ছি না। যদি তোমাকে সাথে নিয়ে যেতে পারি তাহলে শত বাধার পথও আনন্দ বিহারে পরিণত হবে। আব্দুর রহমান বললো।

আলীঃ রুশদের জীবনচিত্র নিজ চোখে দেখতে আমার খুবই মন চায়। তাছাড়া তোমার আব্বা-আম্মার কথা শুনে তাদের সাথে দেখা করার আগ্রহও প্রবল। কিন্তু চীফ কমান্ডার ছুটি দিবেন কি-না কে জানে। অবশ্য এর আগে আমাদের যেতে ক'দিন সময় লাগে তা হিসাব করা দরকার।

উভয়েই নিজ নিজ খেয়াল মতো সময় নির্ধারণে কতক্ষণ ভাবলো।

আব্দুর রহমান বললোঃ এক মাস সময় হলেই আমরা ঘুরে আসতে পারবো।

আলী প্রতিবাদ করে বললো, অন্ততঃ আমাদের হাতে দু'মাস সময় নেয়া দরকার। রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের জানা নেই। পথে কোত্থেকে কোন মুসিবতে আটকে যাই, এর কোন নিশ্চয়তা আছে? শেষ পর্যন্ত দু' মাসের ব্যাপারে উভয়ে এক মত হলো।

আলী সে দিন রাতেই চীফ কমান্ডারের সাথে ওয়্যারলেসে ছুটির আবেদন ও রাশিয়া ফরের কথা জানালো।

চীফ কমান্ডার শুনে বললো, এ মুহূর্তে রাশিয়া যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। জেনে বুঝে এমন ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়াতে আমি তোমাকে নিষেধ করছি। স্বেচ্ছায় নিজেকে বিপদে ঠেলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রাশিয়া যাতায়াত ঝুঁকিপূর্ণ তা আমি জানি। কিন্তু জীবন মৃত্যু সব আল্লাহর হাতে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে দু'মাসের ছুটি দিন।

ছুটি দু'মাস কেনো তিন মাসেরও দেয়া যাবে। কিন্তু রাশিয়ার পরিস্থিতি চিন্তা করে আমার ভয় হচ্ছে। এ ছাড়া মাত্র ক'দিন আগে তুমি বিয়ে করলে। ছুটিটা বরং তাহেরাকে নিয়ে কাটিয়ে এসো। চীফ কমান্ডার আলীকে আবারো বোঝালো।

আলী বিনীত কণ্ঠে আরজ করলো, আমার মনে হচ্ছে, রাশিয়ায় আমাদের কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না। আশা করি ওখানে আমরা মুজাহিদদের সহযোগী ও সহমর্মী পেয়ে যাবো। তাদেরকে আফগান জিহাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলে আমাদের পক্ষে জনমত গঠনে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারবো। আর তাহেরার কথা বলছেন– সফরে তো আমাদের মাত্র দু'মাস সময় লাগবে। বাকি মাসটা তাহেরাকে নিয়ে কাটাবো।

ছুটি মঞ্জুরের জন্য আলী চীফ কমান্ডারকে নানাভাবে আবেদন নিবেদন করছিলো। আলীর বারংবার আবেদনে চীফ কমান্ডার বললো, ছুটির জন্য তুমি জেদ ধরেছো যখন তোমার ছুটি আমি মঞ্জুর করছি। তবে আমার পরামর্শ থাকবে, সফরে খুবই সর্তক থাকবে।

আলী চীফ কমান্ডারের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছুটি মঞ্জুরীর জন্য কৃতজ্ঞতা জানালো।

আলী অতি সংগোপনে রাশিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নিলো। কাউকে না জানিয়ে বাজার থেকে কাপড় এনে রুশ ডিজাইনের দু' জোড়া কাপড় তৈরী করিয়ে নিলো। পর্যাপ্ত পরিমাণ রুশ কারেন্সীও (রুবল) সংগ্রহ করলো। আলী মুহাম্মদুল ইসলামকে রাশিয়া ভ্রমণে সফরসঙ্গী হওয়ার কথা বল্লে মুহাম্মদ ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে জানালো, আমি কি উদ্দেশ্যে রাশিয়া যাবো। মা-বাবা অনেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন। ভাই-বোনদের কেউই বেঁচে নেই। রাশিয়া আমি তখনই যাবো, যখন রাশিয়ার মুসলমানরা বলশেভিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাবে। এখন আফগানিস্তানই আমার ঠিকানা। এখানেই আমি থেকে যাবো। যদি কোন রুশ মুসলমানের দেখা পান, বলবেন, 'পরাধীনতার জিঞ্জিরাবদ্ধ জীবনে কখনও স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যাবে না। তারাও যদি স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে অবগাহন করতে চায়, তবে আফগানীদের মতো মৃত্যুর কঠিন পথ বেছে নিতে হবে। আলস্য ঝেড়ে পিঠ টান করে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াতে হবে।'

আলী ও আব্দুর রহমানের রাশিয়া সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। আব্দুর রহমান রাশিয়ান নাগরিক পরিচয় পত্র স্বযত্নে নিজ ব্যাগে রেখে দিলো, যাতে প্রয়াজনে কাজে লাগানো যায়।

আলী দরবেশ খানকে স্থলাভিষিক্ত কমান্ডার নিযুক্ত করে মুজাহিদদের ডেকে বললো, এক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে আমি বাইরে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে দরবেশ খানের নির্দেশ সবাই মেনে চলবে।

দরবেশ খানকে আলী বোঝালো, শত্রুপক্ষ বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। এ সব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিজে যথাযথ খোঁজ-খবর রাখতে চেষ্টা করবেন এবং সকল ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সতর্ক থাকবেন। এমনও হতে পারে যে, শত্রুরা কোন সুন্দরী মেয়েকে মজলুমের ভূমিকায় নামিয়ে আপনার এখানে পাঠাবে। কখনও কোন মহিলাকে ক্যাম্পে ঠাই দেবেন না। এলেও তখনই বিদায় করে দেবেন।

মুজাহিদদের মধ্যে দরবেশ খান একজন বীর মুজাহিদ হিসেবে খ্যাত। মুজাহিদরা তাঁকে লৌহ মানব বলে অভিহিত করে। দরবেশ খানের বীরত্বপূর্ণ একটি ঘটনা মুজাহিদ ক্যাম্পে সবার মুখে মুখে আলোচিত হয়ে থাকে।

একদিন ঘটনাচক্রে রুশ বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হলো দরবেশ খান। সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে রুশ অফিসারদের কাছে নিয়ে গেল। যে অফিসটিতে দরবেশ খানকে হাজির করা হলো, সেখানে তিনজন সিপাই ছাড়া আরো সাতজন রুশ অফিসার উপস্থিত। অফিসারদের নির্দেশে সিপাইরা দরবেশ খানের বন্ধন খুলে দিলো। এক পর্যায়ে রুশ অফিসাররা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে অশালীন উক্তি করতে শুরু করলে রাগে-ক্ষোভে দরবেশ খান পাগলের মতো হয়ে উঠেন। দরবেশ খান আকস্মিক থাবা মেরে এক সিপাইয়ের ক্লাসিনকভ ছিনিয়ে নেন। দরবেশ খানের হাতে বন্দুক দেখে অন্য দুই সিপাই নিজেদের বন্দুক মাটিতে ফেলে দেয়। দরবেশ খান অন্য বন্দুকগুলোকে এক পাশে রেখে ঘরের দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। এর পর সিংহের মতো কারাতে মার দিয়ে ঘরের সিপাহি অফিসারসহ দশ শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে পালিয়ে আসেন। দরবেশ খানের হাত লোহার হাতুড়ীর চেয়েও শক্ত। মুজাহিদদের কাছে দরবেশ খান গম্ভীর, দৃঢ় ও ভদ্র। শত্রু ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর ব্যক্তিরূপে সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

আলী আব্দুর রহমান ও আরো চার মুজাহিদ তিনটি মোটর সাইকেলে ক্যাম্প থেকে রওয়ানা হলো। পথে আব্দুর রহমান আলীকে বললো, আমাদের হাতে সময় কম। পথে কোন শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হলে মোকাবেলা এড়িয়ে চলে যেতে হবে।

একটানা চারদিন মোটর সাইকেল চালিয়ে আলীরা রুশ সীমান্তের নিকটবর্তী একটি মুজাহিদ ক্যাম্পে এসে পৌঁছলো। ক্যাম্পটি ছিলো আমু দরিয়ার তীরে অবস্থিত। মুজাহিদ ক্যাম্পের কমান্ডার যবানগুল খান আলীর পরিচিত। গুলখান কয়েকবার আলীর ক্যাম্পে গিয়েছে।

আলী গুল খানকে তার আগমনের কারণ সবিস্তারে জানিয়ে বললো, অন্য কোন মুজাহিদকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাবেন না।

কমান্ডার গুলখান পরদিন তাদেরকে আমু দরিয়ার তীরে একটি বাগানে নিয়ে গেলো। বাগানের মালিক আহমদ খানকে বাগানেই পাওয়া গেলো। আহমদ খান এ এলাকার এক ভূস্বামী হওয়ার পাশাপাশি বড় মাপের স্মাগলার। রাশিয়ান পন্য আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানে পাচার কাজে সে অত্র এলাকার অপ্রতিদ্বন্ধি ব্যক্তি। সর্ব মহলে তার সমান প্রতাপ। রাশিয়ার বড় বড় স্মাগলারদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক। কেজিবির উর্ধতন কর্তৃপক্ষও তাকে জানে। মুজাহিদদেরও সে সহযোগিতা করে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে মুজাহিদদের গেরিলা আক্রমণ আহমদ খানের দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শেই হয়ে থাকে। মুজাহিদদের অস্ত্র সরবরাহেও তার অবদান অনস্বীকার্য।

কমান্ডার যবান গুল খান আহমদ খানের কাছে আলীর আগমন ও রাশিয়া ভ্রমণের কথা জানালে আহমদ খান বললেন, রাশিয়ায় প্রবেশ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তবে একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কিছু দিন যাবত আমার স্টিমারটি নষ্ট। মেরামত চলছে। এখনই ওপারে যেতে হলে দরিয়া আপনাদের সাতরিয়ে পারে হতে হবে। না হয় সপ্তাহখানিক অপেক্ষা করতে হবে।

আহমদ খানের কথা শুনে আলী বললো, দরিয়া আমরা সাতরে পার হতে পারবো।

আহমদ খানের বিশাল বাগানের এক সুরক্ষিত গুপ্ত কক্ষে আলী ও সাথীরা রাত যাপন করলো। সকালে আহমদ খান মুজাহিদদের জন্য বাগানের নানা ধরনের তাজা ফল ও রান্না করা নাশতা নিয়ে এলেন ঘর থেকে। নাশ্তা খেতে খেতে আহমদ খান আলীর উদ্দেশে বললেন, দরিয়া পার হয়ে কয়েক মাইল হেটে গেলে তোমরা ইসমাইল সমরকন্দির গ্রাম পাবেন। এর মধ্যে আর কোন জনবসতি তেমন নেই। সে এ অঞ্চলের বড় স্মাগলার এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি। কেজিবির শীর্ষ পর্যায়ে তার হাত আছে। তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। সে আমার কোন সুহৃদকে কিছুতেই অমর্যাদা করবে না, বরং সর্বাত্মক সাহায্য করবে।

তার বাড়ী পর্যন্ত যাওয়ার আগে কোন রুশ পুলিশ, আর্মি কিংবা পাবলিক যদি তোমাদের পথ রোধ করে কিংবা কোন প্রকার হয়রানি করে, তা হলে 'আমরা ইসমাঈল সমরকন্দির মেহমান, তাঁর বাড়ীতে যাবো' বললেই আটকাবে তো দূরে থাক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ইসমাঈল সমরকন্দির ওখানে পৌঁছানোর পর সে-ই তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছার যাবতীয় ব্যবস্থা এবং কাগজপত্র তৈরী করে দেবে। আর একটা কথা তোমাদের বলে দেই যে, 'কোন প্রশাসনিক কিংবা পুলিশী সমস্যার সম্মুখীন হলে ঘুষ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। রাশিয়ান পুলিশকে কুড়ি-পঁচিশ রুবল ঘুষ দিলে অনেক বড় কাজও আদায় করা যায়। আর ছোট-খাটো কাজে ওদের দু'-এক রুবল দিলেই হলো।'

একটু থেমে আহমদ খান আবার বললে, আমার একটি কাজ করে দিলে খুবই উপকার হবে। ইসমাইল সমরকন্দী কিছু কুরআন শরীফের আবদার করেছিলেন। কয়েক মাসেও আমি তার এ কাজটুকু করতে পারিনি।

কুরআন শরীফের কথা শুনে আব্দুর রহমান বললো, 'খান সাহেব! আমারও কয়েক জিল্‌দ কুরআন শরীফ দরকার।' আহমদ খান বললেন, 'কুরআন শরীফ তো ভাই এ এলাকায় পাওয়া মুশকিল। তোমাকে দিতে হলে শহর থেকে আনাতে হবে। তাতেও দু' দিনের সময় লেগে যাবে।

কমান্ডার যবানগুল খান আবদুর রহমানের কুরআনুল কারীমের আবদার শুনে বললেন, দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে না আমি ক্যাম্প থেকে কুরআন শরীফ আনিয়ে দিচ্ছি। এই বলে এক মুজাহিদকে মোটর সাইকেলে ক্যাম্পে পাঠালেন।

আহমদ খান বললেন, 'রাশিয়ার মুসলমানদের কাছে সব চেয়ে বেশী মূল্যবান উপহার কুরআন শরীফ। আমি অনেক বার দেখেছি, রাশিয়ায় কম্যুনিস্টরাও নিজেদের ঘরে কুরআন শরীফ রাখে। মুসলমানদের কাছে ওরা দৈনিক পনের বিশ রুবল ফিস নেয়। রমযানের সময় ফিস আরো বেড়ে যায়। রুশ সমাজে এমন একটি ধারণা চালু আছে যে, যার ঘরে এক কপি কুরআন শরীফ আছে, জীবিকা নির্বাহে তার আর কাজের দরকার নেই। কুম্যানিস্টরা কুরআন শরীফ দিয়ে এমন নির্মম ব্যবসা করে যে, কোন মুসলমানকে তা একটু দেখতে দিলেও দু'এক রুবল আদায় করে।'

আহমদ খানের কথা শুনে আলী প্রশ্ন করলো, মুসলমানরা এতো টাকা কি খরচ করতে পারে?

আহমদ খান বললেন, রুশ মুসলমানরা কয়েক পরিবার মিলে একদিনের জন্য কুরআন শরীফ সংগ্রহ করে। একজনে দেখে তিলাওয়াত করে আর বাকীরা শুনে শুনে পড়ে।

আপনারা বেশী করে রাশিয়ায় কুরআন শরীফ সরবরাহ করতে পারেন না? আব্দুর রহমানের প্রশ্ন।

আহমদ খান বল্‌লেন, 'হ্যাঁ। এ ব্যাপারে ইসমাইল সমরকন্দীর সাথে আমার কথা হয়েছে। একটি পাকিস্তানী প্রিন্টিং কোম্পানীর সাথেও আলোচনা হয়েছে। রুশ ভাষায় তরজমাসহ কুরআন শরিফ রাশিয়ায় সরবরাহ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।'

এটা ভালো উদ্যোগ। এতে আপনাদের প্রচুর টাকা যেমন আসবে, বিপুল সওয়াবের অধিকারীও হবেন, আলী বললো।

এ সব দিক বিবেচনা করেই এ কাজে হাত দিয়েছি, আহমদ খানের স্বীকারোক্তি।

আলী বললো, আফগান রেডিও থেকেও রুশ ভাষায় একটি অনষ্ঠান প্রচারিত হয়।

আহমদ্দ খান জানালেন, রাশিয়ার মুসলমানরা রেডিও আফগানিস্তানের ইসলামী প্রোগ্রাম খুব নিষ্ঠার সাথে শুনে থাকে। বিশেষ করে রুশ মুসলমান মেয়েরা আফগান মুজাহিদদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাপরায়ন।

ইসমাঈল সমরকন্দী একদিন আমাকে বলেছিলেন, আমাদের মেয়েরা তো আফগান মুজাহিদদের জিহাদী প্রোগামে এতই প্রভাবান্বিত যে, আমাদেরকে রীতিমত জিহাদ শুরু না করার জন্য নিন্দা করে। ওরা বলে, নিরীহ আফগান মুসলমানরা যদি অপ্রতুল অস্ত্র-বারুদ দিয়েই রুশ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করতে পারে, তোমরা (রাশিয়ার মুসলমানরা) কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছো না কেন?

আলী শুনে বললো, এটা অত্যন্ত খুশীর কথা। আল্লাহ অচিরেই হয় তো এমন সুযোগ করে দিবেন যে, রাশিয়ার মুসলমানরা আযাদীর জন্য কুম্যনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করবে।

খানিক পর ক্যাম্প থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে ফিরে আসল মুজাহিদ। সে বললো, অল্প সময়ের মধ্যে খোঁজা-খুঁজি করে মাত্র তিন কপি পেয়েছি। আব্দুর রহমান ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, ব্যস, এ তিন জিলদই যথেষ্ট।

আহমদ খান আলীকে তার পরিচিত আরো কয়েকজন ঘনিষ্ট বন্ধুর ঠিকানা বলে দিলেন। আর ইসমাঈল সমরকন্দীর কাছে একটি চিরকুট লিখে দিলেন। আহমদ খান লিখলেন, 'এ যুবকরা আমার ছেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক জরুরী কাজে তারা শেরআবাদ পর্যন্ত যাবে। তাদের শেরআবাদ পর্যন্ত পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।'

আলী ও আব্দুর রহমান সাতরিয়ে দরিয়া পার হওয়ার প্রস্তুতি নিলো। তারা এমন এক জায়গা দিয়ে সাতার দেয়ার ইচ্ছা করলো, যে জায়গাটি রুশ সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে। আহমদ খান আলী ও আব্দুর রহমানকে বললেন, 'এ দরিয়া খুব বেশী খরস্রোতা এবং গভীর, চওড়াও একটু বেশী। তোমরা সাথে করে মোটরের বা রাবারের টিউব আর প্লাষ্টিক কন্টেইনার নিয়ে নেও। মুজাহিদরা সাধারণত টিউব ও প্লাষ্টিক কন্টেইনারের সাহায্যেই দরিয়া পার হয়ে থাকে। বাগানে আমি হাওয়া ভর্তি টিউব আর কন্টেইনার এ জন্যেই রেখে দিয়েছি। কারণ, অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে গেরিলা অপারেশনে ষ্টিমার বা নৌকা দিয়ে সুবিধা করা যায় না।

ক্যাম্প থেকে আসা আলীর সহযাত্রী মুজাহিদরা নদীর পার পর্যন্ত আলী ও আব্দুর রহমানের আসবাবপত্র এগিয়ে নিয়ে গেলো। দরিয়ার তীরে কমান্ডার যবানগুল ও আহমদ খান আলীকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলেন।

প্রতিকূল পরিবেশের সাথে দীর্ঘ দিনের বীরত্বপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে আফগান মুজাহিদরা যে কোন সমস্যাকে সহজে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছিলো। অত্যাধিক শীত, তুষারপাত কিংবা মগজ উৎলানো গরম আফগান মুজাহিদদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারতো না। তদুপরি আলীর মনে হলো, দরিয়ার পানি বরফের চেয়েও ঠান্ডা। দীর্ঘক্ষণ দরিয়ার গাঢ় নীল পানিতে সাতরিয়ে মনে হচ্ছিলো যে, সারা শরীর জমে গেছে।

রাবারের টিউব ও প্লাষ্টিক কন্টেইনার ব্যবহার করে আলী ও আব্দুর রহমান আসবাব-পত্র বয়ে নিয়েই এক সময় ওপারে পৌঁছলো। এতগুলো আসবাবপত্র নিয়ে আফগান মুজাহিদ ছাড়া আর কোন মানুষের পক্ষে সাতরিয়ে দরিয়া পার হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। এ সময়ে এ স্থান দিয়ে দক্ষ সাতারুকেও খালি গায়ে মোটা অংকের পুরস্কার দিলেও নামানো যেতো না।

ক্যাম্প থেকে আসা মুজাহিদদেরকে আলী রুশ সফর শেষে ফিরে আসা পর্যন্ত যবানগুল খানের ক্যাম্পে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে বিদায় জানালো। তারা আল্লাহ হাফেজ বলে আলীকে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে এলো।

জনমানবহীন উষ্ণ মরু এলাকা পাড়ি দিয়ে আলী ও আব্দুর রহমান গন্তব্যের পথে রওনা হলো। মরুভূমির ধারালো কাঁকর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে পথ চলা ছিলো অত্যন্ত দুষ্কর। বার বার লতাগুল্মে পা পেচিয়ে যাচ্ছিলো। তীক্ষ্ণধার পাথরে আঘাত খেয়ে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিলো। এমতাবস্থায় সামনে পড়লো একটি মরু ঝর্ণা। ঝর্ণার স্বচ্ছ পানি তীর থেকেই দেখা গেলো। অতি কষ্টে ও সতর্ককার সাথে তারা ঝর্ণার অপর তীর পৌঁছলো।

ঝর্ণা পেরিয়ে তারা দেখলো, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সবুজ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ বৃক্ষতরুর সমারোহ। নয়নাভিরাম নানা রং ও বর্ণের বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত স্রোতস্বিনী মরু ঝর্ণা ঘন বৃক্ষ ছায়ায় অজ্ঞাত অপরিচিত বহু বন্য জন্তুর আনাগোনা। নানা পাখির কল-কাকলীতে ঝর্ণা তীরবর্তী এলাকা মুখরিত। এ যেন পাষাণ মরুর হৃদয় স্পন্দন।

আব্দুর রহমান আলীকে বললো, পথে কোন লোকের সাথে কথা বলবে না। কারণ তোমার রুশ ভাষা তেমন স্পষ্ট হয় না এবং যে পশতু ভাষা তোমাদের ওখানে বলা হয় তা থেকে এখানকার পশতুর মধ্যে ব্যবধান অনেক।

আব্দুর রহমানের কৌশল আলীর পসন্দ হলো। সে বোবার অভিনয় করতে সম্মত হলো।

আলী ঝরণা তীরবর্তী প্রাকৃতিক নৈসর্গে ভরা সুন্দর জায়গা দেখে বিমুগ্ধ কণ্ঠে বললো, 'আব্দুর রহমান। এই সুন্দর যমীনে মুসলমানদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত হতে আর কতো দিন লাগবে, এ সব স্থানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে মসজিদের সুউচ্চ মিনার, ইথারে ইথারে ভেসে বেড়াবে আযানের মধুর আহবান।'

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ সুনির্দিষ্টভাবে সে কথা বলতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এসব এলাকায় পুনরায় মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেতে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না। এ রাশিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে, ধুলায় মিশে যাবে কম্যুনিজমের সকল দুর্গ। সেদিন হয়তো এ দেশ হবে পৃথবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। এমনও হতে পারে যে, রাশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তুর্কিস্তান মিলে একটি বৃহৎ ফেডারেল মুসলিম ষ্টেটে রূপান্তরিত হবে, আর সেই গ্রেট মুসলিম ষ্টেট সারা বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্ধী শক্তি হিসবে আর্বিভূত হবে। সেই মুসলিম রাষ্ট্রের গৌরব, মর্যাদা ও উন্নতি অগ্রগতিতে মার্কিন-বৃটেনের অহমিকা চূর্ণ হয়ে যাবে। আমার তো খুবই ইচ্ছে হয়, এমন বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রটি যদি নিজ চোখে দেখে যেতে পারতাম। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো আব্দুর রহমান।

আলী বললোঃ আব্দুর রহমান! তোমার চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কিন্তু এসব এখন কল্পনা বিলাস বৈ কিছু নয়। বাস্তবে এমন ইসলামী ষ্টেট অনেক সময়ের ব্যাপার।

একথা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারো না যে, পৃথিবীর চোখ ধাঁধানো যতো বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে এগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার আগে কল্পনাই ছিলো। মনোশক্তি ও কল্পনাই সকল কর্মের উৎস। বললো আব্দুর রহমান।

একটা উষ্ণ আলাপ-চারিতার মধ্যে কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে আলী ও আব্দুর রহমান ইসমাঈল সমরকানন্দীর গ্রামে পৌঁছে গেলো। তখন প্রায় তিনটা বেজে গেছে।

ইসমাঈল সমরকন্দি অভ্যাতগদের উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে কোলাকুলি করলো। আব্দুর রহমান ইসমাঈল সমরকন্দির সম্মানে আহমদ খানের প্রেরিত উপহার পবিত্র কুরআন শরীফের কপি ও চিঠি পেশ করলো। ইসমাঈল সমরকান্দি আগে আহমদ খানের চিঠি পড়লো। অতঃপর কুরআন শরীফগুলো অত্যন্ত যত্নে বুকে চেপে ধরে বললো, 'আপনারা অনেক কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন, এখন পানাহার শেষে বিশ্রাম করুন। আগামী কাল আপনাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে শেরআবাদ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

পরদিন ইসমাঈল সমরকন্দি আলী ও আব্দুর রহমানের পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি কাগজপত্র তৈরী করার জন্য বেরিয়ে যেতে উদ্যোগী হলে আব্দুর রহমান সমরকন্দির উদ্দেশে বললো, জনাব! কাগজ তৈরী করতে তো খরচ পত্রের প্রয়োজন হবে, আমরা আপনাকে খরচের টাকা দিতে চাচ্ছি। এই নিন আমার কসমসোসল কার্ড। এটা দেখালে পাসপোর্ট তৈরী করা অনেকটা সহজ হবে।

আব্দুর রহমানের টাকা দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সমরকন্দি বললেন, আপনারা আহমদ খানের ছেলের বন্ধু, আমার পুত্রের সমতুল্য। আপনাদের কাছ থেকে এই সামান্য খরচের জন্য টাকা নেয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আর হ্যাঁ, আমি তো মনে করেছিলাম, আপনারা উভয়েই আফগানী। আপনার কসমোসল কার্ড থাকলে তো কোন

ঝামেলাই নেই। অতি সহজেই আমি কাগজ তৈরী করিয়ে নিতে পারবো। অবশ্য কাগজ তৈরীর কাজ দ্রুত সম্পন্ন হলেও দু' একদিন লেগে যেতে পারে। (উল্লেখ্য সোভিয়েত আমলে দেশের এক অঞ্চল থেকে দূরের কোন অঞ্চলে যেতে সরকারী অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হতো।)

অত্যাবশ্যকীয় সরকারী ছাড়পত্র পেতে দু'দিন লেগে গেলো। এ দু'দিন আলী ও আব্দুর রহমান ইসমাঈল সমরকন্দির বাড়ীতে অবস্থান করলো। দু'দিন পর সব কিছু ঠিক করে আলীকে নিয়ে শেরআদের পথে রওয়ানা হলো আব্দুর রহমান। রাত ন'টায় তারা শেরআবাদে পৌঁছে গেলো। বহুদিন পর নিজ শহরে পৌঁছে আব্দুর রহমানের কাছে মনে হলো, সব কিছুই যেনো কেমন ভুতুড়ে হয়ে গেছে। বদলে গেছে শহরের সব কিছু। নিষ্প্রাণ মৃতপুরীর মতো লাগছিলো চোখ ধাঁধানো শেরআবাদ শহরটিও।

শহরে পৌঁছে আব্দুর রহমান আঁচ করলো, এখানে জনজীবনের গতি স্বাভাবিক নয়। ভয়াবহতার ছাপ স্পষ্ট। রাত ন'টায় সারা শহর নিঝুম নিঃস্তব্ধ। অথচ এক সময় গভীর রাত পর্যন্ত এ শহরের প্রতিটি গলি থাকতো কোলাহল ও জনরব মুখরিত। তার মানে প্রশাসন জনগণের উপর সীমাহীন জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছে এখন।

মেইন রোড এড়িয়ে নির্জন অন্ধকার রাস্তা ধরে আব্দুর রহমান বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। যাতে পুলিশী ঝামেলার মুখোমুখী না হয়ে বাড়ী পৌঁছতে সহজ হয়। খুব সতর্কভাবে পা চালিয়ে আব্দুর রহমান বাড়ীর কাছে পৌঁছে দেখলো, তাদের বাড়ীর সামনের দিকে দু' একজন লোক যাতায়াত করছে। তাই আলীকে নিয়ে সামনের দরজা এড়িয়ে ঘরের পিছনের দরজায় কড়া নাড়লো।

ঘরের দরজার সামনে গিয়ে আব্দুর রহমানের দীর্ঘ দিনের বিরহ ব্যথা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো হৃদয়ে প্রচন্ড আঘাত হানলো। মা-বাবার সাথে মিলিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্খায় তার বুকের পাজরগুলো যেনো ভেঙ্গে যাচ্ছিলো। স্নেহময়ী মায়ের আদুরে স্পর্শ থেকে দূরে থাকার কথা অনুভব করে দরদর করে দু'চোখে অশ্রু ঝরছিলো। যেন এখন আঝোর ধারায় শুরু হয়েছে শ্রাবনের বর্ষণ। প্রথম কড়া নাড়ার পর অনেকক্ষণ অতিবাহিত হলেও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আব্দুর রহমান আবার কড়া নাড়লো। দ্বিতীয় বার কড়া নাড়লে ভিতর থেকে মাহিলা কণ্ঠে ভেসে এলো, আসছি, কে?

এ আওয়াজ ছিলো আব্দুর রহমানের স্নেহময়ী মায়ের চির পরিচিত আওয়াজ। তিনি দরজার কাছে এসে আবার বল্লেন, কে?

আব্দুর রহমান দরজার কাছে মুখ নিয়ে ক্ষীণস্বরে বললো, মা! আমি, আব্দুর রহমান।

আব্দুর রহমানের ডাক শুনে মায়ের হৃদয় আনন্দে ভরে গেলো। তিনি দ্রুত দরজা খুলে আদুরে পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন। সুখের আতিশয্যে মায়ের দু'চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

মা-পুত্রের আলিঙ্গনে আলীর হৃদয় পটে ভেসে উঠলো তার শাহাদাতবরণকারী মায়ের কান্তিময় অবয়ব। আলীর মনে হলো, কালো, সাদা, গৌড় যাই হোক পৃথিবীর সব মায়েরই নিজ সন্তানের প্রতি দরদের কোন পার্থক্য নেই। মা-পুত্রের আবেগময়তা স্বাভাবিক হয়ে এলে আব্দুর রহমান আলীকে পরিচয় করিয়ে দিলে আলী তাকে বিনীত সালাম জানালো। আব্দুর রহমানের মহিয়সী মা আলীকে মুবারকবাদ জানিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

পরিচয়ের পর মা তাদেরকে ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসালেন। আব্দুর রহমান মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা! আব্বু কোথায়, দেখছিনা যে?

মা বললেন, এই একটু আগে বাইরে গেছেন। এক্ষুণি এসে পড়বেন। তোমরা বসো, আমি তোমাদের জন্য খানা তৈরী করি। তোমার আব্বু এলে সবাই এক সাথে বসে কথা বলবো।

আব্দুর রহমানের মা আলীর উদ্দেশে বললেন, বেটা, আমার আব্দুর রহমানের খাবারের পছন্দ-অপছন্দ আমি জানি। তবে তুমি কি খাবে? আজ আমি আমার পুত্রদের পছন্দের খাবার রান্না করবো।

আলী বললো, 'খালাম্মা, আজ আমি আব্দুর রহমানের পছন্দের খাবারই খাবো। আগামীকাল আব্দুর রহমান আমার পছন্দের খাবার খাবে। এতে আপনার সময়ও বাঁচবে, উভয়ের পছন্দের খাবারও খাওয়া হবে।'

আলীর কথা শুনে মা রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। আব্দুর রহমান মাকে ডেকে বললো, মা! আমাদের আসার খবর আব্বু ছাড়া আর কেউ যেন না জানে। আমরা খুব গোপনে এসেছি।

দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি, ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার সীমাহীন উদ্বেগ আলী ও আব্দুর রহমানের দেহ-মনে কষ্টের গভীর ছাপ সুস্পষ্ট। তারা উভয়েই ক্লান্তি দূর করার জন্য ঠান্ডা পানিতে দীর্ঘক্ষণ গোসল করলো। তৃপ্তিময় গোসল সেরে জামা-কাপড় বদলিয়ে উভয়ে সটান বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। বিছানায় পিঠ লাগানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুমিয়ে গেলো।

ইত্যবসরে আব্দুর রহমানের আব্বা ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে ডাকতে সোজা রান্না ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, কি গো! এতো রাতে তুমি রান্না ঘরে কি করো?

ড্রয়িং রুমের লাইট অফ করে দিয়েছিলো আব্দুর রহমান, আর তার আব্বু ঘরে ঢুকেছিলেন অন্য দরজা দিয়ে। আব্দুর রহমানের মা ফাতেমা স্বামীকে বললেন, রান্না করছি। ড্রয়িং রুমে দেখো গিয়ে কে এসেছে।

আব্দুর রহমানের আব্বা ধারণাই করতে পারছিলেন না যে, আব্দুর রহমান আসতে পারে। তিনি দ্রুতপদে ড্রয়িং রুমে ঢুকে লাইট অন করলেনঃ আব্দুর রহমানকে ঘুমন্ত

দেখে তিনি যেই তার মাথা ধরে নিজের কোলে উঠাতে চাইলেন, তখন আলী ও আব্দুর রহমান উভয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আব্দুর রহমান উঠে তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরলো। বাবা পুত্রকে জড়িয়ে ধরে অনেক্ষণ পর্যন্ত আদর করলেন আর অবচেতন মনে বলে গেলেন আবেগাপ্লুত কত কথা । আব্দুর রহমান যখন বললো, 'ইনি কমান্ডার আলী, আমার পরম বন্ধু।' আব্দুর রহমানের আব্বা আলীকেও এক হাতে বুকে চেপে বললেন, 'বেটা! তোমার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা তো ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো যুদ্ধে নিহত হয়েছো। আমি তোমার কমান্ডারের সাথে টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে, তোমার কোন খোঁজ নেই। একটি অপারেশন গ্রুপ থেকে তুমি হারিয়ে গেছো। রুশ সরকারের ধারণা তোমাকে মুজাহিদরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। এরপর আমরা তোমাকে ফিরে পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলি। একমাত্র তোমার আত্মার শান্তির জন্য দু'আ করা ছাড়া আমাদের সান্ত্বনার কোন পথ ছিলো না।

তোমার হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ আমি তোমার মাকে কখনও জানতে দেইনি। কিন্তু তোমার চিঠি আসা বন্ধ হতেই সে তোমার জন্য কাঁদতে শুরু করে। গত নভেম্বরে তোমার জন্ম দিনে তো এমন কান্নাকাটি শুরু করেছিলো যে, তাকে সান্ত করতে গিয়ে আমিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম।

পিতা-পুত্রের কথোপকথনের ফাঁকে আব্দুর রহমানের মা খাবার নিয়ে এলেন। আব্দুর রহমান বললো, 'আব্বু! সেদিন রাতে আমি আপনাদের স্বপ্নে দেখলাম। তখন থেকে বাড়ীতে আসার জন্য আমার মন পাগল হয়ে উঠলো। কিছুতেই নিজেকে শামাল দিতে পারছিলাম না।

আপনাকে তো আমি বলেই গিয়েছিলাম, সুযোগ পেলেই আমি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেবো। এতে আপনাদের এতো পেরেশান হওয়ার কি ছিলো। আফগানিস্তানে যদি কোন মুজাহিদ শহীদ হয় তার বাপ-মা-ভাই-বোন শহীদকে নিয়ে গর্ববোধ করে। জিহাদে আত্মদানের জন্য আমি কোন আফগানকে এতটুকু কুণ্ঠিত হতে বা দুঃখবোধ বা কাঁদতে দেখিনি। আমার শাহাদতের জন্য আপনারা দুঃখ পেলে আমার খুব কষ্ট হতো।'

পুত্রের প্রতিউত্তরে মা বললেন, 'বেটা তোমার শাহাদাতের জন্য আমাদের কোন দুখঃবোধ নেই। কিন্তু আমার তো আশংকা ছিলো, তুমি হয়তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফেরদের পক্ষ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছো। এখানে কম্যুনিস্টরা একথা প্রচার করে যে, মুজাহিদরা কোন রুশ সৈন্যকে ধরে নিলে আর জীবিত রাখে না। কম্যুনিস্ট হোক আর মুসলমান হোক কোন বিপক্ষের সৈনিক মুজাহিদের হাতে রেহাই পায় না। আমাদের আরো বেশী ভয় হচ্ছিলো এই ভেবে যে, তুমি রুশ ব্যারাক ছেড়ে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিতে গিয়ে না আবার মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়েছো। না বেটা, অপমৃত্যুর আশংকা না থাকলে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে তুমি আমার একমাত্র পুত্র কেন দশ পুত্র শহীদ হলেও আমি এক বিন্দু চোখের পানি ফেলবো না।

আব্দুর রহমানের মা'র কথা শুনে আলী বললো, খালাম্মা! এসব রুশ সরকারের প্রোপাগান্ডা। কেবল মুসলমানকে কেন, অতি জঘন্য কম্যুনিস্টকেও মুজাহিদরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোন শাস্তি দেয়না। এখনো আমাদের বন্দী শিবিরগুলোতে অসংখ্য রুশ সৈন্য বন্দী রয়েছে। আমরা বন্দী বিনিময় করতে চাই, কিন্তু রুশ কমান্ডাররা বন্দী বিনিময়ে রাজী হয় না। রুশ কয়েদীরা মুজাহিদ বন্দী শিবিরে মুজাহিদদের আদর্শবাদিতায় ও সুন্দর আচরণে ইসলাম গ্রহণ করে রুশ বাহিনীর মোকাবেলায় যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, রুশ সরকারের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রচারযন্ত্র আছে, আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে। আর আমাদের হাতে আধুনিক কোন প্রচার মিডিয়া নেই, ইসলাম বৈরী আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলো আমাদের কার্যক্রমের প্রকৃত চিত্র তুলে না ধরে বিকৃতভাবে প্রচার করে থাকে।

আমরা তো রুশ-কম্যুনিস্টদের মধ্যে বসবাস করে ওদের প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ি। ওরা তো সব সময়ই প্রচার করে যে, মুজাহিদরা খুবই অত্যাচারী জালেম। কথাগুলো বললেন আব্দুর রহমানের আম্মা। তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ওহ! তোমাদের তো ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার রেখে আমরা গল্পে ডুবে গেছি। এসো, খেয়ে নাও।

আহারান্তে আব্দুর রহমানের আব্বু বললেন, 'বেটা! এখন তোমাদের জিহাদের কথা ও মুজাহিদদের কার্যক্রম শোনাও।'

আব্বু! রাত বারোটা বেজেগেছে। আগামীকাল শুনলে হয় না? আপনার তো আবার রাত জাগলে অসুখ বাড়ে। বিনয়ের স্বরে বললো আব্দুর রহমান।

বেটা! আমরা তো জিহাদী কার্যক্রম শোনার জন্য বেকারার হয়ে আছি। তোমরা পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের দরকার। তোমাদের কষ্ট হলে ভিন্ন কথা। যে পর্যন্ত আমি তোমাদের সকল কথা না শুনবো, ততক্ষণ এমনিতেও ঘুম হবে না।

অগত্যা আব্দুর রহমান আফগানিস্তানে তার যাওয়ার পর থেকে রুশ বাহিনীর উপর্যুপরি ব্যর্থতা ও মুজাহিদের অব্যাহত সাফল্যের কথা বলতে শুরু করলো। রুশ বাহিনীর পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বাড়ী ফেরা পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা ও পূর্বাপর সংঘটিত রুশ বাহিনী ও মুজাহিদদের কীর্তি গাঁথা সবিস্তারে বর্ণনা করলো।

সোভিয়েত বাহিনীর অকল্পনীয় জুলুম, নিরীহ আফগানদের উপর পরিচালিত তাদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে আব্দুর রহমানের আব্বা-আম্মার চোখে পানি এসে গেলো। আবার ঈমানী শক্তিবলে বলীয়ান আফগান মুজাহিদদের ধারাবাহিক সাফল্যের কথা, আল্লাহর রহমত ও মদদের কথা শুনে তাদের চোখমুখ খুশীতে দীপ্তিময় হয়ে উঠলো।

মা বললেন, দেখবে অচিরেই মুজাহিদদের বিজয় হবে। যাদের সাহায্যকারী প্রভূ, তাদের পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে নেই।

আব্দুর রহমানের দীর্ঘ বর্ণনা শেষ হলে তার আব্বা বললেন, বেটা! রাশিয়ার কম্যুনিস্ট সরকার মুজাহিদদের জালেম, অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, ডাকাত, লুটেরা, খুনী বলে প্রচার করে। অথচ এখানকার মুসলমানরা মুজাহিদদের উত্তরোত্তর বিজয়ে উৎফুল্ল বোধ করেছে। কম্যুনিস্টদের সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়নে ওদের প্রতি জনগণ প্রচন্ড বিতৃষ্ণ। তাদের ধারণা, রুশ বাহিনীর ক্রমাবনতি ও পরাজয়ের কারণে সরকার মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে। রাশিয়ার সাধারণ মানুষ মুজাহিদ বাহিনীকে ঐশী সাহায্যে বলীয়ান মনে করে।

অনেককেই বলতে শুনেছি, মুজাহিদদের পরাজিত করা কোন সামরিক শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিজেও কয়েকজন আফগান ফেরৎ রুশ সেনা অফিসারের সাথে কথা বলেছি। গত বছর এক অফিসার আমাকে বললো, আমাদের সেনারা এক মুজাহিদকে বন্দী করে নিয়ে এলো। আমি আফগান মুজাহিদদের অনেক অলৌকিক কাহিনী সেনাদের কাছে শুনেছি। তবে এসব কখনই বিশ্বাস করিনি।

মুজাহিদকে বন্দী অবস্থায় পেয়ে আমার মনে ওদের ঐশ্বরিক শক্তি পরীক্ষা করার কৌতূহল জাগলো। আমি বন্দী মুজাহিদকে বললাম, তোমরা নাকি পাথর নিক্ষেপ করে ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দিতে পারো? ও বলল, হ্যা, আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমি ওকে বললাম, এখন যদি তার প্রমাণ দিতে পারো, তবে তোমাকে ছেড়ে দেবো। সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললো, হ্যাঁ! আল্লাহর ইচ্ছা হলে পারবো।

সে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক ঘটি পানি চাইলো। উপস্থিত এক সিপাই এক ঘটি পানি এনে দেয়। ওকে দেখলাম, হাত মুখ পা ধুয়ে একবার মাথায় হাত বুলালো। (অর্থাৎ-অজু করলো) এর পর কি যেন পাঠ করে রাস্তা থেকে কয়েকটি পাথর কুড়িয়ে আমাদের একটি ট্যাংকে ছুড়ে মারলো, আর সাথে সাথেই দাউ দাউ করে ট্যাংকে আগুন ধরে গেলো।

দু'মাস আগে অনুরূপ আরেক রুশ অফিসারের সাথে আমার দেখা। আফগানিস্তানে মারাত্মক আহত হয়ে কিছু দিন আগে সে দেশে ফিরে এসেছে। সেও বহু অলৌকিক ঘটনা শুনিয়েছে। অফিসারটি বলেছিলো, সে দেশে ফিরে আসার ক'মাস আগে নাকি দু'টি রুশ কনভয় একটি মুজাহিদ ক্যাম্প দখল করতে গিয়ে একজনও ফিরে আসতে পারেনি। এমনকি ওদের কোন চিহ্নও রুশ বাহিনী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। এভাবে দু'তিনটি কনভয় পাঠানো হলো। কিন্তু একজন রুশ সেনাকেও খুঁজে পাওয়া গেলো না। রুশ বাহিনীর কনভয়গুলো কি আকাশে মিলিয়ে গেলো না যমীনে ধসে গেলো কিছুই বোঝা গেলো না।

মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তথ্য শুনলাম কেন্দ্রীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও আমাদের জেলা সেক্রেটারীর কাছে। সেক্রেটারী সাহেব আমাকে জানালেন,

তিনি ক'দিন আগে কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দিতে মস্কো গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এলে তাকে বিমর্ষ দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, আপনাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে যে! তিনি বললেন, আমি কেন, দেশের সকল নেতৃবৃন্দই খুব উদ্বিগ্ন। যে ব্যাপারটি রাশিয়ার মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছে, তা তোমাকে শোনালে তুমিও চিন্তিত হয়ে পড়বে।

আব্দুর রহমানের আব্বু বললেন, আমি কিছুক্ষণ আগে এক বৈঠক থেকে এসেছি। বৈঠকটি ছিলো সরকারী গোয়েন্দা বাহিনীর উঁচু অফিসারদের পর্যালোচনা সভা। সে বৈঠকের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিলো সদ্য আফগান সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পেশকৃত রিপোর্ট। রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আফগানিস্তান সফর করে এসে রুশ সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্টে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের অনুকূলে সংঘটিত দু'টি ঘটনাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে।

ঘটনার একটি হলো– রুশ বাহিনীর দু'টি কনভয় মুজাহিদদের একটি ক্যাম্পে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলে পুরো দু'টি কনভয় অদৃশ্য হয়ে যায়। কনভয়ে অংশ গ্রহণকারী রুশ সেনাদের কোন চিহ্নই খোঁজে পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিলো ঐ কনভয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার রহস্য উন্মোচনের পরিচালিত অপারেশন। আমাদের এরিয়া কমান্ডার কনভয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর উদ্দিষ্ট মুজাহিদ ক্যাম্প আক্রমণের জন্য যেখানে তিনশ' স্পটনাজ সেনা পাঠায়। কিন্তু আশ্চর্য জনকভাবে স্পটনাজ সেনাও জীবন্ত ফিরে আসতে পারেনি।

অথচ স্পটনাজ সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিশ্বাস যে, স্পটনাজ পৃথিবীর যে কোন দুর্ধর্ষ বাহিনীকেও পরাস্ত করতে সক্ষম। প্রতিটি স্পটনাজ সৈন্য একশজন উঁচুমানের প্রশিক্ষিত ছত্রীসেনাকে অবলিলায় হত্যা করার মতো ক্ষমতা রাখে।

রুশ সুপ্রিম কাউন্সিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর রিপোর্ট শুনে যখন জানতে পারলো, তিনশ' স্পটনাজ সেনা ও এক মুজাহিদ বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারেনি, তখন অনেকের চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করে। সবার চেহারায় ধরা পড়ে অজানা শংকাবোধ। এক কাউন্সিলর তো শংকাবোধ চেপে রাখতে না পেরে বৈঠকেই বলে ফেললো, তা হলে তো দেখা যায় মুজাহিদদের হাতে আমরাও নিরাপদ নই। ওরা যদি দুর্ধর্ষ স্পটনাজ সেনাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, তবে তো, রাশিয়ায় এসে আমাদেরকেও মৃত্যুর দু'য়ারে পৌছে দিতে পারে! কি বলেন–ভয়াবহ খবর নয়কি এটি?

আব্দুর রহমানের আব্বু কথা শেষ করলে আলী স্মীত হেসে বললেন, চাচাজান! কনভয় দু'টো গায়েব করে দেয়া এবং স্পটনাজ সেনাদের ধ্বংস করে দেয়ার এ বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী আপনার ছেলে আব্দুর রহমান।

- না আব্বু! এসবই আলীর কমান্ডিং ও বিচক্ষণতার ফল। আব্দুর রহমান বললো।

আব্দুর রহমানের আব্বু বললেন– এটা তো আমার জন্য চরম গর্বের বিষয়, কৃতিত্ব যারই হোক তোমরা উভয়েই আল্লাহর পথের সৈনিক ও আমার পুত্র।

ছেলের বিস্ময়কর কৃতিত্বের কথা শুনে পাশে বসা আব্দুর রহমানের আম্মা উঠে এসে উৎফুল্লচিত্তে আব্দুর রহমানের কপালে চুমু খেলেন; পরম আনন্দে প্রিয়পুত্রকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর আলীর মাথা-মুখে আদুরে হাত বুলিয়ে বললেন, প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের দু'জনকে শান্তিতে রাখুন। নিত্য যেনো সাফল্য তোমাদের পদচুম্বন করে সব সময় পরওয়ারদিগারের দরবারে এ কামনাই করি।

জিহাদের কাহিনী বলতে বলতে রাত পেরিয়ে ফজরের সময় হয়ে গেলো। ঘড়িতে সময় দেখে আলী ও আব্দুর ররহমান নামাযের অযু করতে উঠে গেলো। নামায শেষে সবাই নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি দূর করতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠে সবাই নাস্তা খেয়ে নিলো। নাস্তা শেষে আলী ও আব্দুর রহমান আবার ঘুমিয়ে পড়লো। বেলা যখন দুপুর ছুঁই ছুঁই করছে, তখন আব্দুর রহমান ঘুম থেকে উঠলো। তার মা তখনও রান্নার কাজে ব্যস্ত। অনেক দিন পর একমাত্র আদরের পুত্র বাড়ী এসেছে, মায়ের মায়াবী মনের কোনে পুত্রের প্রিয় খাবারের যতসব নাম তার মনে পড়ছে সব একসাথে রান্ন করতে ইচ্ছে করছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা রাঁধবেন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় পেছন থেকে আব্দুর রহমান এ ঘর ও ঘর খুঁজে রান্না ঘরে গিয়ে হাজির।

মায়ের কাছে গিয়ে এ কথা ও কথা বলার পর আনমনে এক ফাঁকে মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা, যুবাইদার কি কোন খবর আছে? সে কোথায়?

আব্দুর রহমান যে যুবাইদার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যই আরো কিছু অনাবশ্যক কথার অবতারণা করেছে, মায়ের খেয়াল সে দিকটা এড়িয়ে গেলো না। রাশিয়ায় প্রেম, বিয়ে এ সব ব্যাপারে ছেলে মেয়েরা মা বাপের সাথে কথা বলতে কোন প্রকার দ্বিধা করে না। কিন্তু মা তাও অনুধাবন করলেন যে, আব্দুর রহমানের মধ্যে কেমন যেন একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছে।

মা বললেন, বেটা! জুবায়দা আগের মতই আছে। ও তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে। আমাদের মতো যুবাইদাও তোমার কুশল-চিন্তায় উদ্বিগ্ন।

মা! যুবায়দার সাথে দেখা করা যাবে কি? ওরা বাড়িতেই আছে তো? আব্দুর রহমান বললো।

কেন দেখা করা যাবে না। কোন অসুবিধা নেই। বেটা সে ব্যবস্থা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। মনে রেখো, যে মা তার সন্তানের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারে না, সে মা হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

আমি তোমার বলার আগেই তোমার আব্বুকে বলে দিয়েছি, অফিস থেকে ফেরার পথে যুবায়দাদের বাড়ী হয়ে ওকে নিয়ে আসার জন্য। তা ছাড়া এতো দিন পরে তুমি বাড়ী এসেছো, তোমার সব পছন্দের খাবার আমি একা রাঁধতে পারবো না। তুমি যেমন অনেক দিন পর মায়ের কাছে এসেছো, তোমার বন্ধু আলীও তো ওর মায়ের কাছ থেকে এসেছে অনেক দিন হলো। আমি এমন ব্যবস্থা করতে চাই, যাতে উভয়েই নিজ ঘরের আহারাদি করতে পারো।

বেটা! আমি রোগে-শোকে এখন দুর্বল হয়ে পড়েছি। এ জন্য তোমরা যতদিন এখানে থাকবে যুবায়দা আমার কাজে সহায়তা করবে। আমি অবশ্য এ কথাও ঠিক করে রেখেছি যে, তুমি বাড়ী এলেই যুবায়দার সাথে তোমার বিয়ের কাজটি সেরে ফেলবো। বিয়ের পর ওকে তুমি সাথে নিয়ে যাবে এটাও আমার সিদ্ধান্ত। বেচারী তোমাকে ছাড়া একাকী এখানে কষ্টে ছটফট করবে, মা হয়ে আমি তা সহ্য করব কিভাবে!

মায়ের কথা শুনে খুশীতে আবেগাপ্লুত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আব্দুর রহমান মায়ের কপালে চুমু খেলো। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আব্দুর রহমান মাকে উদ্দেশ করে বললো, মা! তুমি যা চিন্তা করেছো, ভালো কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে একটু ভাবতে হবে। কথা শেষ করে আব্দুর রহমান আলীর কাছে চলে এলো।

অফিস ছুটির পর আব্দুর রহমানের আব্বা সোজা যুবায়দাদের বাড়ী এলেন। এ সময়ে যুবায়দা বিছানায় অলসভাবে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলো আব্দুর রহমানের কথা। কিছুদিন যাবৎ যতসব উল্টো-পাল্টা খবর আসছে আফগানিস্তান সম্পর্কে। আব্দুর রহমান ভাই কোথায় আছে, কি করছে কোন খবর নেই অনেক দিন যাবৎ, মানুষটা একটা চিঠি পর্যন্ত লিখে না।

মামনি কেমন আছো? আব্দুর রহমানের আব্বার কণ্ঠস্বর শুনে যুবায়দার ভাবনায় ছেদ পড়লো। হুড়মুড় করে উঠে সালাম জানালো। অভিমানী স্বরে বললো, মামা কি পথ ভুলে এদিকে এসেছেন?

পথ ভুলে নয় মা! সময়ের অভাবে আসতে পারি না। তা যাক মামনি জলদি কর, তোমার মামীমা তোমার পথ চেয়ে বসে আছে, এখনই তোমাকে যেতে হবে।

এমন কী দরকার পড়লো যে, আমাকে এখনই যেতে হবে? তা ছাড়া মা বাড়ীতে নেই, পাশের বাড়ীতে একটা দরকারে গেছেন। মা বাড়ী না এলে তো আর যাওয়া যাচ্ছে না।

তা সে আসুক। এর মধ্যে তুমি কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। বেশ কিছুদিন থাকতে হতে পারে, দরকারী সব জিনিস ব্যাগে ভরে নাও। আর হ্যাঁ তোমার মামীমা বলতে

নিষেধ করেছে, এ জন্য বলছি না। নিজেই তোমাকে বিষয়টা জানাতে চায়। তোমার একটা বড় খুশীর খবর আছে মা।

মামার কথায় যুবায়দা মুচকি হেসে প্রয়োজনীয় সামগ্রী গোছাতে লেগে গেলো। ইত্যবসরে যুবায়দার মাও এসে গেলেন। ভাইকে কুশল জিজ্ঞেস করে ব্যাগে কাপড়-পত্র গোছাতে দেখে যুবায়দাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বেটী! এ সব কি হচ্ছে।

যুবায়দা মায়ের উদ্দেশে বললো, 'আমি জানি না আম্মু! মামাকে জিজ্ঞেস করুন।'

আব্দুর রহমানের আব্বা যুবাইদার আম্মা রুখসানাকে বললো, যুবায়দাকে কয়েক দিনের জন্য আমি নিয়ে যাচ্ছি। ক'দিন আমাদের বাড়ীতে থাকবে। তুমি কি বলো?

ভাইজান, আপনি নিয়ে যাবেন, এতে আবার আমার কি বলার আছে। যতো দিন ইচ্ছা আপনারা ওকে রাখুন। ও তো বরং ভাবীর কাছে গেলে বেশী ভালো থাকে। কথা বলার এক পর্যায়ে যুবায়দার আম্মা রুখসানা বললেন, ভাইজান! আব্দুর রহমানের কি কোন খবর আছে? অনেক দিন যাবত কোন খবরা-খবর পাচ্ছি না।

আব্দুর রহমানের আব্বা বললেন, হ্যাঁ খবর আছে। কিছু দিনের মধ্যে বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে।

যুবায়দার পিতা ছিলেন একজন কট্টর কম্যুনিস্ট। এ জন্যে রুখসানা নিজের বোন হলেও তার ওপর এতোটা আস্থা রাখতে পারছিলেন না আব্দুর রহমানের আব্বা। তা ছাড়া যুবায়দা ছাড়া আব্দুর রহমানের আগমনের খবর বেশী মানুষে জানুক, এ ব্যাপারটি যথাসম্ভব সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

যুবায়দা যখন আব্দুর রহমানদের বাড়ী পৌঁছলো, তখন আব্দুর রহমানের আম্মা উঠানে কাজ করছিলেন। তাকে সালাম দিয়ে যুবাইদা ঈষৎ মায়াবী স্বরে বললো, মামীমা! বলুন তো এমন কি সুখবর দেয়ার জন্য আমাকে এতো তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন?

আব্দুর রহমানের আম্মা বললেন, মা মণি তুমিই বলতো দেখি, এ বাড়ীতে তোমার সবচেয়ে খুশীর খবর কী হতে পারে?

মামীমা। এটা অবশ্য আপনি খুব ভালই জানেন, কিন্তু..... মুখের কথা অসম্পূর্ণই রয়ে গেলো, জুবায়দার দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো, সে আবগাপ্লুত হয়ে পড়লো।

আব্দুর রহমানের আম্মা তাকে ধরে ঘরে এনে বসালেন এবং বললেন, মা মণি! তুমি এখানে একটু বসো! আমি এখনই তোমার খবর নিয়ে আসছি।

আব্দুর রহমানের ঘরে গিয়ে মা তাকে ডেকে বললেন, বেটা! যুবায়দা আমার ঘরে বসে আছে, তুমি ওর সাথে কথা বলো।

আব্দুর রহমান চকিতে আলীকে বললো, দোস্ত! আমি আসছি।

আব্দুর রহমান যখন জোবায়দার কাছে গিয়ে দাঁড়াল যুবায়দা তাকে দেখে বিস্ময়াবিভূত হয়ে বলে উঠলো, আ-প-নি, আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না তো!

না না, স্বপ্ন নয়, বাস্তবেই দেখছো। আমিই তোমার আব্দুর রহমান! তোমার পাশে জীবন্ত দাঁড়ানো।

অনেকদিনের জমাটবাধা বিরহ-যন্ত্রণা মুহূর্তের মধ্যে আনন্দের বন্যায় যেন ভেসে যেতে লাগলো, সুখের আতিশয্যে জুবায়দার দু'চোখ উপছে উঠলো আনন্দাশ্রুতে। বাধভাঙ্গা জোয়ারের পানির মতো সমস্ত দুঃখ অনুতাপ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যুবায়দার হৃদয়ে শুরু হলো মহাপ্লাবন। কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে এলো , কি দিয়ে অভিবাদন জানাবে ভাষা না পেয়ে হু হু করে কাঁদতে শুরু করলো। যুবায়দার কান্নায় আব্দুর রহমানেরও দু'চোখ ভিজে এলো।

কিছুক্ষণ এ ভাবে কেটে যাওয়ার পর নিজেকে সামলে নিয়ে যুবায়দা বললো, আপনি বাড়ী আসার আগে আমাকে খবর দিলেন না কেন? এ ভাবে আমাকে এখানে আনলেন, যেন আমি কোন ব্যারাক পালানো অপরাধী সৈনিকের সাথে গোপনে দেখা করতে এসেছি।

তুমি ঠিকই বলেছো যুবায়দা। আমি সত্যিকার অর্থেই একজন ব্যারাক পালানো সৈনিক। রুশ পক্ষ ত্যাগ করে আমি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছি। আব্দুর রহমান বললো।

এটা তো আমার জন্য আরো খুশীর ব্যাপার। আপনি জানেন না এখানে মুজাহিদদের প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। আমার তো ইচ্ছে করে আফগানিস্তান গিয়ে মুসলমান ভাইদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে। তাদের সেবা করতে।

চমৎকার! খুব সুন্দর চেতনা তোমার যুবায়দা। আল্লাহ তোমাকে জিহাদে শরীক হওয়ার তৌফিক দান করুন। এ মানসিকতার জন্য তোমাকে একটা উপস্থিত প্রতিদান দিতে ইচ্ছে করছে। মুচকি হেসে কথাটি বললো আব্দুর রহমান।

যুবায়দা ভাবছিল হয়ত আব্দুর রহমান তার এ কথায় ঠাট্টা করছে। যুবায়দা বললো, আপনার মুখে তো ইসলামের কথা খুবই শুনি কিন্তু আমি একটু বললেই এ নিয়ে ঠাট্টা করেন বুঝি।

না যুবায়দা! আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। সত্যিই আফগানিস্তান সম্পর্কে তোমার উপলব্ধি আমাকে খুবই উজ্জীবিত করেছে।

আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে আমি আপনার মুখে আফগানিস্তান ও মুজাহিদদের পরিস্থিতি সবিস্তার শুনতে চাই। প্রস্তাব করলো যুবায়দা।

আব্দুর রহমান যুবায়দাকে সংক্ষেপে আফগানিস্তানের পরিস্থিতির কথা জানালো।

যুবায়দা আফগান পরিস্থিতি জানার পাশাপাশি যখন জানতে পারলো, একজন আফগান মুজাহিদ কমান্ডার আব্দুর রহমানের বন্ধু এবং সে তার সাথে এখানেও এসেছে তখন মুজাহিদ কমান্ডারকে দেখা ও তার সাথে কথা বলার জন্য বায়না ধরলো যুবায়দা।

আব্দুর রহমান যুবায়দাকে জানালো, 'আফগানিস্তানের সমাজে ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। ওখানে কোন মহিলা অপরিচিত পরপুরুষের সাথে দেখা করে না। আমি এক আফগান মেয়েকে বোন বানিয়েছি তার পরও সে আমার মুখোমুখি হয়ে কথা বলে না, কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলে।'

আমিকি নগ্ন নাকি। রাশিয়ায় কোন মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী পর্দানশীল পাবেন না। নারীত্ব ঢেকে রাখার জন্য বান্ধবীরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে পর্যন্ত। কিন্তু তবুও আমি ওদের মতো মিনি স্কার্ট কখনও পরি না।

আব্দুর রহমান বললো, রাশিয়ায় ইসলামী বিধি-নিষেধের কোন চর্চা নেই। সঠিক ইসলামী আকিদা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যেই রাশিয়ার মুসলমান সমাজ ইসলামী বিধান মেনে চলে না। তদুপরি আছে সরকারী নিষেধাজ্ঞা। আর আফগানিস্তান এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওখানে পারিবারিকভাবেই ছেলেমেয়েরা ইসলামী পরিবেশে বেড়ে উঠে, ঘরোয়া পরিবেশেই শিখতে পারে শরীয়তের অনেক কিছু। যাক, তুমি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নাও, মাথা মুখ ঢেকে নাও। আমি আলীকে নিয়ে আসছি।

যুবায়দা আব্দুর রহমানের আম্মার চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে নিলো।

যুবায়দা রাশিয়ার এমন এক সমাজের মেয়ে যেখানে অশ্লীলতা নগ্নতাকে মনে করা হয় প্রগতির প্রতীক। যে সমাজে নারী পুরুষ অবাধ মেলা-মেশা অবাধ যৌনাচার প্রশংসনীয়, নাচ-গান, মদ হলো স্বাভাবিক সমাজিক ব্যাপার। কুরআনুল কারীম যে দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি। তথাপি যুবায়দা চরম বৈরী পরিবেশেও নিজেকে যথেষ্ট শালীনতার সাথে টিকিয়ে রেখেছে। শুধু যে যুবায়দা একা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট তা নয়, আরো অসংখ্য এমন যুবায়দা রাশিয়ার ঘরে ঘরে রয়েছে, যারা ইসলামের পবিত্র ছোঁয়ায় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে উদগ্রীব। কিন্তু কে দেবে তাদের ইসলামী শিক্ষা, ইসলামের দাওয়াত?

রাশিয়া এমন এক শাসন ব্যবস্থার অক্টোপাশে আবদ্ধ, যেখানে সব মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহ। মদ, জুয়া, অশ্লীলতা ও নগ্নতার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। মুসলমান পর্দানশীল মহিলাদেরকে বাড়ী বাড়ী প্রবেশ করে জোর করে তাদের দেহ থেকে শালীন পোষাক ছিঁড়ে ফেলা হয়, মুসলমানকে ইসলামী আকীদায় বিশ্বাস ও শরয়ী নির্দেশ পালনের অপরাধে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। যে সমাজে পর্দা করা রাষ্ট্রীয় আইনে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সেখানে যুবায়দার মতো ভদ্র শালীন মেয়ের অস্তিত্ব শুধু বিরলই নয়, বিস্ময়করও বটে।

আব্দুর রহমান আলীকে বললো, বন্ধু আলী! যুবায়দা তোমার কাছ থেকে আফগানিস্তান সম্পর্কে মুজাহিদদের কাহিনী জানতে উদগ্রীব। তুমি যুবায়দার সাথে কথা বলো।

আলী ও আব্দুর রহমানকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে আলীর সালাম দেয়ার আগেই যুবায়দা আসসালামু আলাইকুম বলে আলীকে সম্বোধন করে বললো, 'কেমন আছেন ভাই আলী!'

সালামের জবাব দিয়ে আলীও যুবায়দার কুশল জিজ্ঞেস করে সংক্ষেপে আফগানিস্তানের সার্বিক পরিস্থিতির বিবরণ শোনাল। এ সময়ে আব্দুর রহমানের আব্বা আম্মাও এসে আলীর কথা শোনার জন্য হাজির হলেন।

আলীর মুখে জিহাদের বিস্ময়কর ঘটনাবলী শোনার পর যুবায়দা জানালো যে, রাশিয়ার মুসলমান মহিলাদের মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি খুবই শ্রদ্ধা ও সমর্থন রয়েছে। মুজাহিদদের বীরত্ব, বিস্ময়কর সাফল্যে তারা অবিভূত এবং রুশ বাহিনীর অত্যাচারে অত্যন্ত মর্মাহত।

যুবায়দা বললো, আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের মুখে মুখে মুজাহিদ বাহিনীর বিস্ময়কর ঘটনাবলী আলোচিত হয়ে থাকে। আমার এক বান্ধবী তিনমাস আগে মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে গল্প করতে গিয়ে বলেছিলো, তার এক সৈনিক ভাই ভারদাক প্রদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে গল্প করেছিলো যে, রুশ কমান্ডার একদিন তাদের নির্দেশ দিলো একটি কবরস্তান বুলডেজার দিয়ে সমান করে সেখানে রুশ বাহিনীর ক্যাম্প তৈরী করার জন্য। সৈন্যরা বুলডোজার নিয়ে কবরস্তানের দিকে অগ্রসর হলো। যখন বুলডোজার বহরের প্রথমটি কবরস্তানের প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলো অমনি বিরাট শক্তিশালী বুলডোজারটি বিকট শব্দে দু'টুকরা হয়ে গেলো।

আমাদের অফিসার মনে করলো, হয়তো বুলডোজারটি খারাপ ছিল এজন্য এমন হয়েছে, না হয় বুলডোজারটি এভাবে ভেঙ্গে যাওয়ার কোন কারণ নেই। এর পরেই ছিলাম আমি। আমার বুলডোজারটি ছিল সম্পুর্ণ নতুন, আধুনিক ও বেশী শক্তিশালী। ভেঙ্গে যাওয়া বুলডোজারটি এড়িয়ে যেই সামনে অগ্রসর হলাম হঠাৎ বিকট শব্দ করে দু'দিকে ভেঙ্গে পড়লো বুলডোজারটি। আমি দূরে ছিটকে পড়লাম। অথচ এখানে মুজাহিদদের পুঁতে রাখা মাইন, বোমার কোন চিহ্নই ছিল না। ছিটকে পড়ে যতো না আহত হলাম এর চেয়ে বেশী ভীত হয়ে পড়লাম। এর পর চলে এলাম ব্যারাকে। অসুস্থতার কথা জানিয়ে দরখাস্ত লিখলাম ছুটির জন্য। কমান্ডার আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে বাড়ীতে আসার সুযোগ দিলেন।

আরেক বান্ধবী বললো, তার আপন ভাই কিছুদিন আগে আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছে। সে বলেছে, মুজাহিদরা শহরে ও রুশ ক্যাম্পে হামলা করে এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় যে, কেউ তাদের খুঁজে পায় না। বান্ধবীর ভাইটি বলেছে, একদিন তারা একটি

গ্রামে আক্রমণের জন্য যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে তিনজন মুজাহিদ দেখতে পেয়ে তারা মুজাহিদদের গুলি করলো। মুজাহিদরাও পাল্টা গুলি করলে রুশ বাহিনীর তিনজন নিহত হলো।

এরপর তারা এক সাথে সবাই মুজাহিদদের প্রতি গোলাবর্ষণ করলো। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিন মুজাহিদ মাটিতে পড়ে গেলে রুশ বাহিনী যখন মুজাহিদদের লাশ ও বন্দুক ছিনিয়ে আনতে গেলো তখন ওই স্থানে আর কোন মুজাহিদের লাশ পেলো না। অনেক অনুসন্ধান করেও উদ্ধার করতে পারলো না মুজাহিদদের মৃতদেহ। এরপর একটু অগ্রসর হলে আরো তিন মুজাহিদের মুখোমুখি হলো। আবার তারা গুলি করলো মুজাহিদদের লক্ষ্য করে। মুজাহিদরাও তাদের উদ্দেশে পাল্টা জবাব দিলো। এতে তাদের চারজন সৈন্য নিহত হলো। রুশ বাহিনীর গোলা বর্ষণে মুজাহিদরাও পড়ে গেলো মাটিতে। কিন্তু অকুস্থলে গিয়ে তাদের কোন চিহ্ন পেলো না সৈন্যরা। কিছুক্ষণ পর আরেকটু অগ্রসর হলে অনুরূপ আবার তিনজন মুজাহিদকে দেখতে পেলো তারা এবং পূর্বের মতোই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। সব শেষে তারা একটা নালা পেরিয়ে যাওয়ার সময় তিন সৈন্য নালার পানিতে নামা মাত্র মৃত্যু মুখে পতিত হলো। এরপর ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে গ্রামে হামলার পরিকল্পনা ত্যাগ করে সৈন্যরা ক্যাম্পে ফিরে আসতে বাধ্য হলো। এ ধরনের বহু অলৌকিক ঘটনা দেশে ফিরে আসা সৈন্যদের মুখে শুনে মেয়েরা হরহামেশাই সে কথা সাথীদের সার্থে আলোচনা করে।'

যুবায়দার বর্ণনা শুনে আলী বললো, কবরস্তানের ঘটনাটি অবশ্য আমিও এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে, মুজাহিদদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই, তারাও রুশদের মতো সাধারণ মানুষ। তবে তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মৃত্যুকে রুশদের মতো ভয় করে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, মুজাহিদদের সাহায্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাও আসে। আল্লাহ মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে সাহায্য করেন। আল্লাহর মদদ না হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরাশক্তির বিরুদ্ধে মুজাহিদরা অব্যাহতভাবে সাফল্য লাভে সক্ষম কিভাবে!

আলীর কথা শেষ হলে আব্দুর রহমানের আব্বা বললেন, যেসব রুশ সৈন্য আফগান রণাঙ্গন থেকে দেশে ফিরে আসে, এদের মুখে মুজাহিদদের অব্যাহত বিজয়ের কাহিনী শুনে রুশ সেনাবাহিনীর জেনারেলদের মধ্যেও আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক কম্যুনিস্ট নেতা তো এই ভেবে ভীত যে, অব্যাহত বিজয় ও উত্থানে মুজাহিদরা আফগানিস্তান রুশমুক্ত হবার পর সমরকন্দ বুখারা বিজয়ের জন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরেও হামলা করতে পারে।

আলী বললো, চাচাজান মোটেই অকল্পনীয় কিছু নয়। আমরা তো এ আশাই পোষণ করি যে, জিহাদ শুধু আফগানিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বিশ্বের যেখানেই মুসলমানদের ওপর বিধর্মীদের নির্যাতন চলছে সেখানেই কাফিরদের বিরুদ্ধে

মুসলমানদের হয়ে জিহাদ করবে আফগান মুজাহিদরা। মুসলমানদের সার্বিক আযাদীর জন্য বিশ্বের প্রতিটি জনপদেই সম্প্রসারিত হবে আফগান জিহাদ। পৃথিবীর সকল মুসলমানের পূর্ণাঙ্গ আযাদী অর্জন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ক্ষ্যান্ত হবে না।

বেটা! তুমি ঠিকই বলেছো। রুশ নেতারা সেজন্য ইউরোপ ও মার্কিনীদের ভয় দেখাচ্ছে যে, আফগান মুজাহিদরা শুধু রাশিয়ারই শত্রু নয়, ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রাম বিরোধী ভূমিকায় তোমরা ইসরাঈল সমর্থক হওয়ার কারণে তোমাদেরও প্রতিপক্ষ। এজন্য রুশ মার্কিন নেতারা আফগানিস্তানে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জহীর শাহের মত তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আসীন করাতে তৎপর। যারা ক্ষমতায় গিয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। সে লক্ষ্যে তারা মুজাহিদদের মধ্যে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়েছে। রুশ-মার্কিন পরাশক্তির কেউই চায় না আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় নির্ভেজাল মুজাহিদ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

আব্দুর রহমানের পিতা আলীর কথা সমর্থন করে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।'

এ পর্যায়ে আলাপচারিতায় সমাপ্তি টেনে আব্দুর রহমানকে সম্বোধন করে আলী বললো, 'আব্দুর রহমান ভাই, আমরা আফগানিস্তান থেকে যে কিছু জিনিসপত্র এনেছিলাম ওগুলো একটু এনো তো।' আব্দুর রহমান তাদের ব্যাগ এনে সবার সম্মুখে খুললো।

আলী নিজ হাতে তার সংগৃহীত কয়েকটি উলের চাদর, পশমী স্যুয়েটার ও কয়েকটি থ্রিপিস যুবায়দা ও আব্দুর রহমানের আব্বা আম্মাকে উপহার দিলো। রাশিয়া রওয়ানা হওয়ার আগে আলী পাকিস্তান থেকে এ দামী কাপড়গুলো সংগ্রহ করেছিলো।

অত্যন্ত দামী ও চমৎকার এসব কাপড় পেয়ে আব্দুর রহমানের আব্বা আম্মা খুব খুশী হলেন, যুবায়দা কোন সংকোচ না করে বলেই ফেললো যে, আলী ভাই! রাশিয়া এ কাপড় তৈরীর কল্পনাই করতে পারে না, সারা রাশিয়ার বাজার খুঁজলেও এতো দামী ও সুন্দর কাপড় বর্তমানে পাওয়া যাবে না। আমার অনেক দিনের সখ ছিলো দেশের বাইরের দামী থ্রিপিস পরবো, আপনি সে আশা পূর্ণ করলেন। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আমিও আল্পকিছু এনেছি সব ধন্যবাদটুকু খরচ না করে আমার জন্যও কিছু রেখে দিও। এ বলে আব্দুর রহমান অত্যন্ত যত্নের সাথে ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য প্যাকেটে মোড়ানো একখানা কুরআন শরীফ বের করে তাদের হাতে দিল। কুরআন শরীফ পেয়ে সবাই আলীর লোভনীয় উপহারের কথা ভুলে গেল। সবাই পবিত্র কুরআনুল কারীমকে একজনের কাছ থেকে অন্যজনে নিয়ে চুমু দিতে লাগলো।

আলী এ দৃশ্য দেখে বললো, অবশ্য আমি জানতে পেরেছিলাম রাশিয়ায় মুসলমানদের জন্য কুরআন শরীফের চেয়ে বেশী মূল্যবান উপহার আর দ্বিতীয়টি নেই।

বেটা! শুধু রুশ মুসলমানদের জন্য নয়, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কাছেই কুরআনুল কারীম সর্বাধিক মূল্যবান উপহার। রুশ মুসলমানদের কাছে তো পবিত্র

কুরআন হিরা-পান্নার চেয়েও দামী। সরকার তাদের সমর্থিত আলেমদের সহায়তায় কুরআন শরীফ ছেপেছে বটে, তবে এগুলোতে শুধু মূল আরবী আয়াত বিকৃত করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, তরজমা তাফসীরেও ব্যাপক বিকৃতি সাধন করেছে। এসব বিকৃত কুরআন পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। বললেন আব্দুর রহমানের পিতা।

যুবায়দা বললো, রাশিয়ায় মুসলমান ছাত্রীরা বিশ্বাস করে যে, কুরআন শরীফ স্পর্শ করে কিংবা পাঠ করে পরীক্ষা দিতে গেলে পরীক্ষা খুব ভালো হয়। আমার বান্ধবীরা যদি জানতে পারে যে, আমার কাছে কুরআন শরীফ আছে তবে ওরা আমার কাছে ভীড় করবে।

তবে কুরআন শরীফ আমার মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে তোমার কাছে এসেছে তা কখনও প্রকাশ করবে না, তাহলে আব্বা আম্মার সাথে সাথে তোমারও বিপদ হতে পারে। যুবায়দাকে সতর্ক করে দিয়ে আব্দুর রহমান বললো।

এবার আলী আব্দুর রহমানকে স্মরণ করিয়ে দিতে বললো, তাহেরার কথা কি ভুলে গেলে? ওর পক্ষ থেকেও যে যুবায়দাকে উপহার পাঠানো হয়েছে।

আলীর মুখে তাহেরার নাম শুনে আব্দুর রহমানের আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, তাহেরা কে আব্দুর রহমান?

মায়ের জিজ্ঞাসার জবাবে আব্দুর রহমান বললো, মা সে এক গর্বিত মায়ের মহিয়সী কন্যা। ওহ! তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আফগানিস্তানে আমি একটি মেয়েকে বোন বানিয়েছি। জানো মা! এই তাহেরা নিজের একমাত্র ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আমাদের জীবন রক্ষা করেছিলো।

আব্দুর রহমানের আম্মা বিস্ময়াবিভূত হয়ে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলিস কি বাবা! ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বল।

আব্দুর রহমান যুবায়দা ও মাকে উদ্দেশে করে বলতে লাগলো তাহেরা ও তাদের পরিচয়ের পুরো কাহিনী।

তাহেরার ঘটনা শুনে আব্দুর রহমানের আব্বা, আম্মা ও যুবায়দা চরম বিস্মিত হলেন। আবেগাপ্লুত হয়ে আব্দুর রহমানের আব্বা স্বগতোক্তি করলেন, হায়! এমন সোনার মেয়েটি যদি আমার কন্যা হতো।

পিতার স্বগতোক্তি শুনে আব্দুর রহমান বললো, আব্বা! আমার বোন কি আপনার কন্যা নয়?

'ওহ! ভুলে গেছি বাবা ঠিকই তো, যে মেয়েকে তুমি বোন হিসেবে গ্রহণ করেছো, তা ছাড়া যে নিজ জীবন বাজি রেখে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছে, সে অবশ্যই আমার কন্যা, ঔরসজাত কন্যার চেয়েও আরো কাছের। আব্দুর রহমানের আব্বা বললেন।

যুবায়দা বললো, আমি বিস্মিত, কোন মেয়ে ধর্মের জন্য নিজের আপন ভাইকেও হত্যা করতে পারে! সত্যিই তাহেরা অসাধারণ মেয়ে । অনেক উঁচু মানের ঈমানদার। যদি তাকে আপনি সাথে করে নিয়ে আসতেন, তাহলে আমরাও তাকে দেখে ধন্য হতাম, পরিচিত হতাম। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, আমার জন্যে কেনা আংটিটি এই ক্ষণজন্মা মুজাহিদ মহিলাকে উপহার দেয়া হয়েছে এবং এই বিশাল হৃদয়ের মুজাহিদ মহিলার পক্ষ থেকেও আমি মূল্যবান উপহার পেয়েছি।

আলী যুবায়দাকে জানালো, তাহেরা আব্দুর রহমান ভাইকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলে সে নিজেই তোমাদের সাথে দেখা করতে রাশিয়া আসবে।

যুবায়দা বললো, আমার জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, তাহেরার মতো পুণ্যবতী মেয়ে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসবে।

আব্দুর রহমান জানালো যে, আফগানিস্তানে সত্যিকার অর্থেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে জিহাদ চলছে। ইসলামের স্বার্থে সেখানে পিতা কন্যাকেও ক্ষমা করে না। মা ছেলের কুফরী মতবাদকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করে না। আফগান মেয়েরা জিহাদে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

আমি প্রথমে আফগানিস্তান গিয়ে জানতে পারলাম, কিছুদিন আগে কাবুল বিশ্ব বিদ্যালয়ের মেয়েরা বারবাক কারমালের বিরুদ্ধে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিলে তাদের কাছে কোন পতাকা ছিলো না। এর মধ্যে এক মেয়ে নিজের স্কার্ফ খুলে একটি লাঠির মতো কাঠে বেঁধে উপরে উড়িয়ে দিলো। মেয়েরা মিছিলের এক পর্যায়ে কাবুল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিন্দা বর্ষণ করলে মিছিলকারীদের উপর রুশ বাহিনী গুলী বর্ষণ করে। কয়েকজন ছাত্রী গুলির আঘাতে শহীদ হলো, বহু আহত হলো। কিন্তু গুলী বর্ষণের পর ছাত্রীরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। দেখা গেলো, যে মেয়েটি নিজের স্কার্ফকে পতাকা বানিয়ে বহন করছিলো, গুলি লেগে তার একটি হাত ভেঙ্গে গেছে,তবুও সে অপর হাতে পতাকা ধরে রাখলো। পতাকাবাহী মেয়েটির অপর হাতটিও ভেঙ্গে গেলে সে দু'হাতের বাজু দিয়ে পতাকাটি বুকে চেপে ধরলো। এভাবে পথ অগ্রসর হওয়ার পর মেয়েটি যখন টলে পরে যাচ্ছিলো তখন অন্য একটি মেয়ে এসে পতাকাটি নিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরলো। ওই দিন বহু মেয়ে নিহত ও আহত হয়েছিল।

সৈন্যরা সেনা বাহিনীর গাড়িতে উঠিয়ে আহত ছাত্রীদের হাসপাতালে নিতে চাইলে ওরা রুশ সৈন্যদের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে এবং এই বলে ধিক্কার দিচ্ছিলো যে, আমরা মরতে রাজী কিন্তু নাপাক কাফেরদের সেবা গ্রহণ করতে রাজি নই। কোন কাফের আমাদের গায়ে হাত দেবে না।

আফগান মেয়েদের এ ঔদ্ধত্যের জন্য সেদিন পিশাচ রুশ কমান্ডার সকল আহত ছাত্রীকে গুলী করে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলো।

এ নির্মম কাহিনী শুনে অজান্তেই যুবায়দার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আব্দুর রহমানের আম্মা বললেন, আফগান মেয়েদের অসংখ্য সালাম জানাই, যারা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে ইসলামী ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় সংযোজন ও ইসলামের জন্য কুরবানীর কঠিনতম নজীর স্থাপন করেছে।

এ সময় আলী নিজের পকেট থেকে দেড়শ রুবল আব্দুর রহমানের আম্মার হাতে দিয়ে বললো, এ দিয়ে যুবায়দার জন্য একটি ভালো উপহার কিনে দিবেন। যুবায়দাকে একটি বিশেষ উপহার দেয়ার জন্য আমরা তাহেরার কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আপনি আব্দুর রহমান ও আমার পক্ষ থেকে এ ওয়াদা পূরণ করবেন। সময়ের অভাবে ও নিরাপত্তার জন্য আমরা উপহারটি সাথে করে নিয়ে আসতে পারিনি।

এই আলোচনার মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে এলো। আব্দুর রহমানের মা যুবায়দার উদ্দেশে বললেন, মা এখন ক্ষ্যান্ত থাক, চলো আমরা রান্না ঘরে গিয়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করি। বাকি কথা পরে শুনবো।

ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলী শোনার একান্ত আগ্রহে ছেদ দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও যুবায়দা উঠে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

পর দিন আব্দুর রহমানের আব্বা জানালেন যে, 'কম্যুনিজমের বেড়ী ভেঙ্গে মুসলিম ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে রাশিয়ার অভ্যন্তরেও জিহাদ শুরু হয়ে গেছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক সশস্ত্র জিহাদী কার্যক্রমের সূচনাস্বরূপ আমু দরিয়ার তীরবর্তী একটি পাহাড়ে গোপন ক্যাম্প স্থাপন করে সামরিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ অধ্যাপকের নাম আইয়ুব বোখারী। শেরআবাদে মাহমুদ নামে তার এক ধনী বন্ধু আছেন, তিনি মুজাহিদদের আস্থাভাজন ও একান্ত বন্ধু লোক।

মাহমুদ বোখারী তুর্কী মুজাহিদ বাহিনীর একজন রাশিয়ান প্রতিনিধি। সে বাহ্যত কম্যুনিস্ট। যখন সে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় যে, সে মুজাহিদ বাহিনীতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আগ্রহী, তখন সে অতি সতর্কতার সাথে পাহাড়ের গহীন জঙ্গলে আইয়ুব বোখারীর ক্যাম্পে তাকে পাঠিয়ে দেয়। এই মুজাহিদ বাহিনীর পরিকল্পনা হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত মুজাহিদ তৈরীর পর রাশিয়ার অভ্যন্তরেও তারা সশস্ত্র জিহাদী তৎপরতা শুরু করবে।

আলী বললো, মাহমুদ বোখারীর সাথে সাক্ষাতের কোন সুযোগ করা যাবে?

আব্দুর রহমানের আব্বা বললেন, হ্যাঁ যাবে। যে কোন দিন তাকে চায়ের দাওয়াত জানালে আমার বাড়ীতে আসবে। তখন একান্তে যে কোন ধরনের আলোচনা তোমরা করতে পারবে।

আব্দুর রহমানের আব্বা আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করে আরো বললেন, আফগান মুজাহিদরা এ শতাব্দির মুসলমানদের জন্য একটি অনুকরণীয় নজীর স্থাপন করেছে।

সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে রাশিয়ার মতো একটি পরাশক্তিকে লজ্জাজনক ভাবে পরাস্ত করে অপ্রতিদ্বন্দ্বি পরাক্রমের দর্প চূর্ণ করে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট আগ্রাসন থেকে বহু দেশ ও মানুষকে রক্ষার মন্ত্র শিখিয়েছে। বিগত কিছু দিন ধরে মস্কো, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ায় কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও গণসমাবেশ শুরু হয়েছে। এসবই আফগান মুজাহিদদের সফল জিহাদের ইতিবাচক প্রভাব। আফগান মুজাহিদদের অব্যাহত সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের যাতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমানদেরও শিরদাড়া সোজা করে দাঁড়াতে উৎসাহিত করছে।

এর একদিন পর মাহমুদ বোখারীর সাথে আলীর সাক্ষাত হলো। রাশিয়ার কোন প্রভাবশালী মুক্তিকামী নেতার আফগান মুজাহিদদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের সূত্রপাত আলী ও মাহমুদ বোখারীর মাধ্যমেই শুরু হলো।

দীর্ঘ একান্ত আলোচনায় মাহমুদ বোখারীর পরিকল্পনা জেনে আলী খুবই খুশী হলো। উভয়ের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গেলো। রুশ আফগান প্রসঙ্গ ছাড়াও নানাবিধ বিষয়ে তাদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। এক পর্যায়ে আলী আইয়ুব বোখারীর গোপন ক্যাম্পে যাওয়ার পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলো। মাহমুদ বোখারী আইয়ুব বোখারীর নামে আলীর পরিচয় দিয়ে একটি চিঠিও লিখে দিলেন।

দেখতে দেখতে দশ দিন চলে গেলো। আলী আব্দুর রহমানকে বললো, ভাই! এখন আমাদের ফিরে যাওয়া দরকার।

আব্দুর রহমানের আম্মা আলীর চলে যাওয়ার কথা জেনে বললেন, বাবা মাত্র ক'দিন হলো তোমরা এলে, এখনও তো তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি, আর দু'চারটা দিন থেকে যাও। আব্দুর রহমানের আম্মার কথা রক্ষার্থে আলী আরো চার দিন থেকে যেতে রাজী হলো।

আব্দুর রহমানের আম্মা যুবায়দাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়া-পীড়ি করছিলেন। যুবায়দাও আব্দুর রহমানের সাথেই আফগানিস্তানে গিয়ে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য জেদ ধরেছিলো। এক পর্যায়ে যুবায়দা আবদুর রহমানকে এ আভাসও দিলো যে, সে কিছুদিন আফগানিস্তানে থেকে পাকিস্তানে তাহেরার কাছে চলে যাবে।

আব্দুর রহমান যুবায়দা ও তার মাকে সান্ত্বনা দেয়র জন্যে বললো, আম্মা! আপনি জানেন, যুবায়দাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি এবং যুবায়দারও উচিৎ হবে না আমার

ভালোবাসায় কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করা। তাহেরা আফগানী মেয়ে সে অন্যান্য শরণার্থীদের মতো পাকিস্তানে রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তার জন্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কিন্তু যুবায়দা রাশিয়ান, কেজিবি যখন এ কথা জানতে পারবে, যুবায়দা মুজাহিদদের পক্ষাবলম্বনকারীনী তখন পাকিস্তান সরকারের উপর ওকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করবে।

এরপর আপনার উপরে যে কি নির্যাতন নেমে আসবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আর পাকিস্তানে গিয়ে কেজিবির দৃষ্টি এড়িয়ে থাকা যুবায়দার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্যই বলছি, যুবায়দার আমার সাথে যাওয়া ঠিক হবে না। আশা করি, দু' এক বছরের মধ্যে আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে, স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে আমি এসে যুবায়দাকে নিয়ে যাবো, আর যদি আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আরো বিলম্বিত হয় তবুও আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, দু' বছর পর আমি নিজে এসে যুবায়দাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। তখন আপনি ও যুবায়দার আব্বা-আম্মার উপর কোন বিপদাপদ আসার আশংকা থাকবে না।

আব্দুর রহমানের আব্বা পুত্রের কথায় সমর্থন জানালেন। যুবায়দার হৃদয়-মন যদিও আব্দুর রহমানের সাথে গিয়ে আফগান যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য উন্মুখ ছিলো, কিন্তু সবাই আব্দুর রহমানের যুক্তি ও আপত্তিকে সমর্থন করায় সেও নীরব হয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় আলী ও আব্দুর রহমানের দু'সপ্তাহ কেটে গেলো। আব্দুর রহমান আফগানিস্তান ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। একমাত্র ছেলের বিয়োগ বিরহে আব্দুর রহমানের আব্বা-আম্মা কাতর হয়ে পড়লেন, যুবায়দা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। সন্তানের বিচ্ছেদ বিরহ চেপে রেখে যুবায়দাকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আব্দুর রহমানের পিতা বললো, বেটী! দুঃখ আমাদেরও কম নয়, কিন্তু তারপরও আমরা কান্না ভুলে একমাত্র সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাওয়ার জন্য খুশী মনে বিদায় দিচ্ছি। দুঃখ না করে তুমিও আব্দুর রহমানকে খুশি মনে বিদায় করো এবং এ দু'আ করো যে, দ্রুত যেন আল্লাহ তা'আলা আফগানিস্তান স্বাধীন করে দেন।

মামা! আমি আব্দুর রহমান ভাইয়ের বিদায়ে কাঁদছি না বরং এজন্য কাঁদছি যে, আব্দুর রহমান ভাইয়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমার হচ্ছে না। এ দুর্ভাগ্যের জন্যই আমার কান্না আসছে। যুবায়দা এভাবেই তার বিরহ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো।

আলী যুবায়দাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বললো, বোন যুবায়দা! পুরুষরা বেঁচে থাকতে মেয়েদের ওপর জিহাদী কর্তব্য বর্তায় না। মুজাহিদদের সাফল্যের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করাই তোমাদের বড় জিহাদ। জিহাদী প্রেরণায় তোমার চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুও মুজাহিদের রক্তের মতো পবিত্র ও মূল্যবান।

আব্দুর রহমানের আম্মা তাহেরার জন্য অনেকগুলো মূল্যবান উপহার সামগ্রী আলীর হাতে দিয়ে বললেন, বেটা! আমার মেয়েকে আদর দিও এবং বলবে, তোমার আরেক মা রাশিয়া থেকে তোমার সার্বিক মঙ্গলের জন্য সর্বক্ষণ দু'আ করছে।

যুবায়দাও তার মনের মতো বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর উপহার তাহেরার জন্য আলীর হাতে তুলে দিলো এবং শুভেচ্ছাসহ তা পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করলো।

সবাইকে সালাম জানিয়ে আলী ও আব্দুর রহমান আফগানিস্তানের পথে রওয়ানা হলো। আব্দুর রহমানের আব্বা তাদের এগিয়ে দেয়ার জন্য সাথে চললেন।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রায় দেড়শ মাইল আসার পর একটি মোড়ে এসে আলীদের বহনকারী প্রাইভেট মোটরগাড়ী থেমে গেলো। আব্দুর রহমানের আব্বা বললেন, 'মাহমুদ বোখারীর নির্দেশিত নকশা অনুযায়ী আইয়ুব বোখারীর ক্যাম্পে যেতে হলে বামের পথ ধরে যেতে হবে।

আলী ও আব্দুর রহমান গাড়ী থেকে নেমে স্থানীয় বাজারে কিছু কেনাকাটা করলো। আব্দুর রহমান তার আব্বাকে বললো, আব্বু! আমরা এখন অতি প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব-পত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছি আর বাকী জিনিসপত্রগুলো আপনি ইসমাইল সমরকান্দির কাছে রেখে বাড়ীতে চলে যাবেন। আমরা ফেরার পথে ইসমাইল সমরকান্দির কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে যাবো। আব্দুর রহমানের পিতা আলী ও আব্দুর রহমানকে বিদায় জানিয়ে তাদের আসবাব পত্র নিয়ে ইসমাঈল সমরকন্দীর বাড়ীর পথে রওয়ানা হলেন।

তিন ঘন্টা পর আলীদের গাড়ী একটি জঙ্গলের পথ ধরে চলতে লাগলো। ঘন জঙ্গলের ভিতর একটি রাস্তা দিয়ে তারা এগুতে লাগলো। আলী ও আব্দুর রহমান যতই অগ্রসর হচ্ছিলো ততই যেন জঙ্গল আরো ঘন হয়ে আসছিলো। জঙ্গলের ভয়াবহ ঘনত্ব বাড়ার সাথে পথ আরো সংকীর্ণ হয়ে আসছিলো। এক পর্যায়ে তারা একটি ঝর্ণার তীরে এসে পৌঁছলেন, রাস্তা এখানে এসে ঝর্ণার তীর ঘেঁষে আরো সরু হয়ে গেলো। গাড়ী নিয়ে আর সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিলো না। অগত্যা তারা গাড়ী সেখানে রেখে হেঁটে চললেন। ঝর্ণাটি যেমন ছিলো খুবই অপ্রশস্ত তেমনই স্রোতস্বীনী, পানি প্রবাহের শব্দ জঙ্গলের গাছপালার দেয়াল পেরিয়েও বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। আলী ও আব্দুর রহমান লক্ষ্য করলেন, ঝর্ণার তীরে ঘেঁষে পথটি কিছুদূর এগিয়ে আবার ঘন জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। তারা এ পথ ধরেই সামনে যেতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সামনে পথ দেখা যায় না। আলী ও আব্দুর রহমান একটি বড় গাছের নীচে রাত যাপন করলো। সতর্কতামূলক পালাক্রমে একজন পাহারা ও অন্যজন ঘুমালো। ফজরের নামাযান্তে আবার চলতে শুরু করলো। এভাবে দু'দিন চলে গেলো। আলী আব্দুর রহমানকে বললো, মাহমুদ বোখারী যে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে তো কোন ভুল হওয়ার কথা নয়, আমরা তো তার দেয়া নক্সা অনুযায়ী এসেছি। এভাবে চলতে চলতে তৃতীয় দিনের দুপুর গড়িয়ে গেলো। ঝরণাটি আবার তাদের পথের সাথে মিলিত হয়ে ডানে চলে গেল আর তাদের পথ বাঁক নিলো বাঁম দিকে। মোড় নিয়ে আব্দুর রহমান বললোঃ আমরা ক্যাম্পের সীমানায় এসে গেছি। এ দিকটায় গাছ খুব পাতলা ও খোলা আকাশ। কিছুক্ষণ অগ্রসর হওয়ার পর তারা একটি লোককে একটি বড় গাছের ছায়ায়

বিশ্রাম নিতে দেখলো। লোকটির হাতে একটি কুড়াল। কাছে আসলে লোকটি কুড়াল হাতে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কারা? কোথায় যেতে চান?

আব্দুর রহমানঃ তুমি কেন জিজ্ঞেস করছো, কি জানতে চাও?

লোকটি বললোঃ আমি তোমাদের অবহিত করতে চাই যে সামনে হায়েনাদের এলাকা।

আব্দুর রহমানঃ এ এলাকায় হায়েনা কোত্থেকে আসলো? এসব ছিল সাংকেতিক পরিচয়। তুর্কি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও মুজাহিদ প্রতিনিধিদেরকেই শুধু এ সংকেত জানিয়ে দেয়া হতো। ঐ লোকটি যখন বুঝতে পারলো, এরা মুজাহিদ তখন বললোঃ আপনারা ডানের রাস্তা ছেড়ে বামের পথ ধরে এগুবেন।

তিনমাইল পর আলী দেখতে পেলো, একটি গাছের নীচে চারজন লোক বসে আছে। তারা কাছে পৌঁছতেই একজন উঠে এসে আলী ও আব্দুর রহমানের সাথে কুশল বিনিময় করে জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?

আব্দুর রহমান বললো, বোখারা থেকে।

লোকটি বললোঃ আসুন চা পান করুন।

আব্দুর রহমান জবাব দিলো যারা আমু দরিয়ার পানি পান করে এসেছে তারা এ সব চা পানে স্বাদ পায় না। এসব ছিলো মুজাহিদদের পারস্পরিক পরিচিতিমূলক সংকেতিক কথা। তারা চারজন যখন নিশ্চিত হলো যে, এরা উভয়েই মুজাহিদ, তখন অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে তকবীর দিতে লাগলো। 'মুজাহিদীনে ইসলাম জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে তারা আলী ও আব্দুর রহমানকে নিয়ে চললো। চারজনের মধ্যে একজন তাদের নিয়ে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলো। প্রায় দেড় ঘন্টা হাঁটার পর তারা একটি ছোঠখাট ময়দান দেখতে পেলো। ময়দানটির বুক চিরে বয়ে গেছে একটি সরু নালা। নালার দু'ধারে অনেক উঁচু উঁচু সবুজ বৃক্ষরাজী। মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে মনোরম সুন্দর ফুল গাছের সমারোহ। শাক, সজী ও ফসলে মাঠ ভরা। মাঠ পেরিয়ে পথটি ক্যাম্পের দিকে চলে গেছে। ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হলেই তাদের নজরে পড়লো কয়েকটি তাজী ঘোড়া ও সতর্ক কয়েকজন মুজাহিদ গেটে দাঁড়ানো। গেট পেরিয়েই তারা দেখলো, পাহাড়ের টিলা খুড়ে মজবুত ব্যাংকার তৈরী করা হয়েছে। আলী তুর্কি মুজাহিদদের ক্যাম্প দেখে আব্দুর রহমানকে বললে, এরা তো দেখি আমাদের চেয়েও শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছে। সাথের লোকটি ব্যাংকারের ভিতরে চলে গেলো।

একটু পর সে প্রায় ষাটোর্ধ বয়সের এক শ্বেতশুভ্র শশ্রু মণ্ডিত ব্যক্তিকে সাথে করে বাংকার থেকে বেরিয়ে এলো। বয়সের ভার এখনো মানুষটিকে কাবু করতে পারেনি।

শরীরের শক্ত বাঁধন, চেহারার ঔজ্জল্য আর দৃঢ়তা থেকে সহজেই বোঝা গেলো, সে এক অসাধারণ ব্যক্তি। লোকটি এসে নিজেই পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী। অত্যন্ত আনন্দচিত্তে আলী ও আব্দুর রহমানকে অভ্যর্থনা জানালেন। বোখারী আলীকে বললেন, আপনাদের আগমন বার্তা আমি ক'দিন আগেই পেয়েছি। আপনাদের সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। বড় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম আপনাদের জন্য। অধ্যাপক বোখারী আলীর দিকে চেয়ে বললেন, সম্ভবতঃ আপনিই কমান্ডার আলী?

আলী জবাবে বললেন, জী হ্যাঁ।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী বললেন, আমার খুব আশা ছিলো একন আফগান মুজাহিদের সাথে কথা বলবো, তাঁর নিকট হৃদয়ের অনেক জমান কথা ব্যক্ত করবো, আফগান জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো, আজ আপনি আমার সে আশা পূরণ করতে এলেন। আপনাদের অনেক অনেক মোবারকবাদ।

অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী আলীর হাত ধরে ব্যাংকারের ভীরে নিয়ে গেলেন। বাংকারটি ছিলো অনেক বড় ও প্রশস্ত। ব্যাংকারটিতে বিছানা ও গালিচা বিছানো ছিলো। বোখারী তাদেরকে গালিচা পাতা ঠাইটুকুতে বসতে বললেন। আলী আইয়ুব বোখারীকে লেখা মাহমুদ বোখারীর চিঠিটি দিলেন। বোখারী চিঠি পড়া শেষ করে বললেনঃ আপনারা অনেক দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন। আগে অযু-গোসল সেরে কাপড় পাল্টিয়ে আহারাদী সেরে বিশ্রাম করুন। রাত্রে আপনাদের সাথে কথা বলবো।

ঈশার নামাযের পর আলী অধ্যাপক আইয়ুব বোখারীকে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের পটভূমি এবং আগ্রাসন পরবর্তী জিহাদী কার্যক্রমের বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ শোনালো। আলাপকালে আলী অধ্যাপক বোখারীর নানা প্রশ্নের জবাবও দিলো।

আফগান জিহাদের বিস্তারিত কাহিনী শুনে অধ্যাপক আইয়ুব বোখারী আলীকে বললেন যে, আপনাদের সৌভাগ্য, আফগান আলিমদের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সকল মতের উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ আমাদের বাপদাদা ও পূর্বসূরীরা যখন রুশ কম্যুনিস্ট ফেডারেশন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলো, তখন এখানকার অধিকাংশ আলেম জিহাদের বিরোধীতা করেছিলেন। অনেক প্রভাবশালী ও বড় বড় আলেম কম্যুনিজমকে ইসলামের উত্থান বলে কম্যুনিস্ট আগ্রাসনে শক্তি যুগিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের জিহাদ শুরু করার পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। কয়েকজন আলেম লেনিনকে একজন নিষ্ঠাবান নেতা এবং খলিফা উমর (রাঃ)-এর পর্যায়ের জনসেবক আখ্যা দিয়েছিলেন। কোন কোন মুফতী এমন ফতওয়াও ঘোষণা করেছিলেন যে, আরবে যেভাবে মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের মুক্তিদূত হিসেবে আভির্ভূত হয়েছিলেন, রাশিয়ায় লেনিন

সেভাবে মানুষের কল্যাণ ও বর্তমান সমাজের শান্তি স্থাপনে আভির্ভূত হয়েছেন। লেনিন যা বলেন এবং করেন এসবই নাকি ইসলামেরই বাস্তবায়ন।

ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত একদল মুসলমান যখন রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিলো, তখন রাশিয়ার অধিকাংশ আলেম ছোট ছোট মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে নিজেদের মধ্যে শতধা বিভক্ত ছিলেন। সামান্য শরয়ী মতবিরোধে প্রতিপক্ষকে কাফের ঘোষণা করতেন। আলেমদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের এমন পর্যায়ও ছিলো যে, পায়জামা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা হবে, না উপরে থাকবে, পাগড়ীর নীচে টুপি থাকবে কি থাকবে না, খাবার আগে হাত একবার ধোবে না তিনবার, এসব বিষয়ও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলো প্রচন্ড মতবিরোধ।

সচেতন আলেমদের একটি ক্ষুদ্র অংশ তাদেরকে একথা বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য পরিহার করে জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে সকল আলেমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল আলেমকেই মুজাহিদদের সহযোগিতা করা দরকার। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বহুধা বিভক্ত আলেমগণ তখন জিহাদী প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবনকারী সচেতন আলেমদেরকে চক্রান্তকারী বিদেশী এজেন্ট বলে অপপ্রচার করতেন। তারা যুক্তি দেখাতেন, ঈমান ঠিক না হলে জিহাদ করে কোন উপকার হবে না। এভাবে আলেমদের বড় অংশ সাধারণ মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রেখে অভ্যন্তরীণ কলহে লিপ্ত করেছিলেন। তাদের কাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াদি নিয়ে মেতে থাকাই ছিলো জিহাদের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

আলেমদের ক্ষুদ্র অংশটি জিহাদে লিপ্ত হয়ে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ-যাতনা, অত্যাচার-নির্যাতন বরণ করে নিলেন। বহু আলেমকে কম্যুনিষ্টরা জ্যান্ত কবর দিলো, অনেককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলো, অনেককে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে শহীদ করলো। তবুও সত্যাশ্রয়ী আলেমরা জিহাদ থেকে বিচ্যুত হননি। সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হকপন্থী আলেমগণ জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। অথচ আলেমগণ যদি আত্মকলহ পরিহার করে জিহাদে শরীক হতেন, কম্যুনিষ্টরা কোন ভাবেই মুসলমানদের সাথে মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারতো না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, রাশিয়ার সত্যাশ্রয়ী আলেমদের তপ্ত খুনে বুখারা-সমরকন্দ থেকে আমু দরিয়া পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চি যমীন রঞ্জিত হয়েছিলো, রাজপথের ধারে এমন কোন গাছ শূন্য ছিল না, কোন আলেমের লাশ ওখানে না ঝুলছে। কিন্তু এতো ত্যাগ, রক্তবন্যা, অসহ্য নির্যাতন আর জুলুম সবই ধুলিস্যাত হয়ে গেলো যখন মুসলমানদের সিংহ ভাগ আলেমের জিহাদ বিরোধী প্রচারণা কম্যুনিজমের সমর্থন যোগাচ্ছিলো।

অধ্যাপক বুখারী বলেনঃ মুজাহিদদের সাথে তাদের মা, বোন, যুবতী কন্যা, ছোট ছোট সন্তানরা পর্যন্ত হাসিমুখে বীরবিক্রমে জিহাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছিলো। যার

দৃষ্টান্ত বর্তমান আফগানিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোন ইতিহাসে নেই। অধ্যাপক বুখারী বলেন, আফগানিস্তানে রাশিয়ার লাল ফৌজ যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, আমাদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ছিলো এর চেয়েও ভয়াবহ। হাজার হাজার মুসলমান যুবতীকে কম্যুনিষ্ট পশুরা গণধর্ষনে হত্যা করেছিলো। রাশিয়ায় এমন কোন মুসলমান ঘর ছিলো না, যার আঙিনা মুসলমানের রক্তে প্লাবিত হয়নি। এমন কোন গলি পথ ছিলো না যেখানে নিহত মুসলমানের তপ্ত খুনের স্রোত বয়ে যায়নি। লাখ লাখ মুসলমানকে বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করে উদ্বাস্তু করেছিলো। ঘরছাড়া মুসলমানদের আশ্রয় শিবিরগুলো তারা অগ্নি সংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। লাখ লাখ মুসলমানকে দিনের পর দিন মরুভূমিতে অভুক্ত অবস্থায় ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো। হাজার হাজার মুসলমানকে একত্রিত করে জীবন্ত পেট্রোলের আগুনে পুরিয়ে কম্যুনিষ্ট পিশাচেরা নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠতো।

অধ্যাপক আইয়ুব বুখারী বললেন, আজ আমরা যে পাহাড়ে ব্যাংকার করেছি, মুজাহিদরা এই পাহাড়েই আশ্রয় নিয়েছিলো। অসম যুদ্ধে একের পর এক মুজাহিদ প্রাণ ত্যাগ করার ফলে যখন পুরুষ শূন্য হয়ে পড়ছিলো, তখন মুসলমান মহিলারাও অস্ত্র হাতে জিহাদে বেরিয়ে পড়েছিলো। তাদের দেখাদেখী শিশু সন্তানেরাও জিহাদে সশস্ত্র মোকাবেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। অবস্থা এমন ছিলো যে, পুরো মুজাহিদ ক্যাম্পগুলো পুরুষশূন্য হয়ে যাওয়ার পরও এখানকার একটি দুধের শিশুকে পর্যন্ত জীবিত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি রেড আর্মিরা।

এক দুধের শিশুকে পিঠে বেঁধে এক মহিলা যুদ্ধে আহত হন। এমতাবস্থায় কম্যুনিষ্টরা তাকে গ্রেফতার করে বললো, শিশুটি আমাদের কাছে দিয়ে দাও, এর কোন অনিষ্ট করা হবে না। মহিলা ওদের তিরস্কার করে বললেনঃ 'আমি কখনও চাই না, আমার পেটে ধারণকারী এ শিশুটি তোমাদের কাছে গিয়ে কাফের হয়ে বেঁচে থাকুক। আমি কাফেরের মা হতে রাজী নই। এই বলে খরস্রোতা নদীতে শিশুটিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মহিলা। তবুও কাফেরের হাতে নিজের ইজ্জত ও সন্তানের ভবিষ্যত বিসর্জন দেননি।

অধ্যাপক বুখারী থেমে গেলেন। অশ্রুভেজা চোখ হাতের রুমাল দিয়ে মুছলেন তিনি। রুশ মুসলমানদের করুণ কাহিনী শুনে আলী ও আব্দুর রহমানেরও দু'চোখ অশ্রুসজল হলো। তারাও চোখ মুছলেন।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেনঃ জানেন, কে ছিলো ঐ মহিলার কোলের শিশুটি? ওই দিনের সেই শিশুই আজ আপনাদের মুখোমুখি বসা প্রফেসর বুখারী। আল্লাহর বিশেষ রহমতে আম্মা অতি কষ্টে তীব্র স্রোতের মধ্যেও আমাকে উপরে তুলে ধরে কোন মতে পানির উপর ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নদীর তীব্র স্রোত এক পর্যায়ে আম্মাকে অপর তীরে ঠেলে দিলো। আম্মা আমাকে নিয়ে কুলে ওঠলেন। সেদিন অলৌকিকভাবেই আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম জালেম কম্যুনিষ্টদের অত্যাচার থেকে।

এখনও বেঁচে আছেন আমার আম্মা। প্রতিবছর একবার এখানে এসে আমার আব্বার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। আব্বা বলতেনঃ "আমার রক্তধারার একটি বিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলবে। আমার বংশের কোন পুরুষ কাফেরদের মোকাবিলায় অস্ত্র ত্যাগ করে ময়দান ছেড়ে যাবে না। পরাধীনতার শৃংখল থেকে জিহাদের ময়দানে মৃত্যু বরণ করা অনেক উত্তম।' আব্বা বলতেন, আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, রাশিয়ায় মুসলমানদের ঈমান, ইসলাম ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে আমার বংশের সকল লোক শেষ হয়ে যাবে, তবুও তারা জিহাদ বিমুখ হবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার বংশের কোন রক্তধারা জিহাদবিমুখ হয়ে যাবে একথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। এমন হলে আমার আত্মা পরপারেও শান্তি পাবে না।" আমার আম্মা বলেন, তিনি সর্বদাই তাকে বলতেন, "তুমি আমার সন্তানদেরকে জিহাদের দীক্ষা দিও, ওরা কখনও যেন কাফেরের সাথে আপস না করে।"

আমার দশ বছর বয়সে আব্বা ইন্তেকাল করেন। কিন্তু আম্মা এখনও প্রতি বছর এখানে এসে আমাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে যান। আমি আমার সন্তান ও নাতি নাতনীদেরকে আব্বার ওসিয়ত পালনে উজ্জীবিত করছি।

প্রফেসর বুখারী আরেকবার দু'চোখ মুছে বললেনঃ বেটা! একজন ত্যাগী মুজাহিদ মায়ের অতীত স্মৃতি ও অকুতভয় পিতার কথা স্মরণ হলে, অতীতের মুসলমানদের উপর বয়ে যাওয়া রুশদের অত্যাচারের কথা উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

প্রফেসর আইয়ূব বুখারী, আলী ও আব্দুর রহমান সবার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ছিলো। প্রফেসর বুখারী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেনঃ ভাই আলী! আফগান মুজাহিদদের চরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শুরু থেকেই তারা পাকিস্তানের মতো একটি অকুণ্ঠ সহযোগী প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সর্বময় সহযোগিতা পেয়ে আসছে। সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান জনগণ মুজাহিদদের অব্যাহত সমর্থন ও সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। তা' ছাড়া মুসলিম বিশ্বের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতাও আফগান মুজাহিদদের শক্তি যোগাচ্ছে। 'শত্রুর শত্রু শত্রুর বন্ধু' নীতিতে সোভিয়েত বিরোধী শক্তিও মুজাহিদ বাহিনীকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট বিপ্লব বিরোধী রুশ-তুর্কী মুজাহিদদের বেলায় বিশ্ব পরিস্থিতি এমন ছিলো না, প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্র একবারও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেনি। মুসলিম বিশ্বের অবস্থাও তখন তথৈবচ। টালমাটাল উসমানিয়া সালতানাত। আরব বিশ্ব তখন ছিলো দৈন্যদশায় জর্জরিত। তদুপরি কম্যুনিষ্ট অপশাসন মুসলমানদের ঘাড়ে চেঁপে বসার সুযোগ পেতো না, যদিনা রাশিয়ার অপরিণামদর্শী আলেমদের কর্মকাণ্ড লাল বিপ্লবের রসদ না যোগাত। আফগান শাসক আমানুল্লাহ নাদির শাহ আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও ঈমানের বিনিময়ে রুশ কম্যুনিষ্টদের গোলামী খরীদ করার সঙ্গিণ সময়ে তোমরা জিয়াউল হকের মতো তেজোদীপ্ত ঈমানদার সহযোগী পেয়েছো। যিনি নিজের সৎসাহসিকতা ও দৃঢ়তা দ্বারা শুধু নিজ দেশের মানুষকেই সহযোগী করেননি, পুরো মুসলিম বিশ্বকে

আফগানদের সাহায্যে টেনে এনেছেন। কিন্তু তৎকালীন রাশিয়ার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেন আমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি। মুসলিম বিশ্বের কোন নেতাও আমাদের পক্ষে টু শব্দটি উচ্চারণ করেননি।

১৯৮০-এর প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক-এর রেডিও ভাষণে শুনতে পেলাম, তিনি বললেনঃ 'রাশিয়া বুখারা ও সমরকন্দ শক্তির দাপটে অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। সমরকন্দ, বুখারা মুসলমানদের পবিত্র ভূমি। এসব স্থান দখল করার কোন বৈধতা কম্যুনিষ্টদের নেই। জিয়াউল হকের ভাষণ শুনে এই প্রথম বুঝতে পারলাম, বিশ্বে আমাদের পক্ষে কথা বলার মতো শক্তিশালী ব্যক্তি অন্ততঃ একজন হলেও আছেন। জিয়াউল হক-এর ভাষণ শুনে দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো। পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম যে, সত্তর বছর পর আমাদের কথা একজন রাষ্ট্রপ্রধান স্মরণ করলেন।

জিয়াউল হকের পক্ষে আমাদের জন্য সরাসরি কোন সাহায্য করার সুযোগ ছিলোনা। দু'দিক থেকে দুশমন তাকে অক্টোপাশের মত আটকে রেখেছে, একদিকে হিন্দু পৌত্তলিক ভারত তার মাথার উপর সঙ্গীন উঁচিয়ে রেখেছে, অপরদিকে দৈত্যের মতো রুশ লাল ফৌজ ঘিরে আছে আফগান সীমান্ত। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই আমরা চিন্তিত। আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করি, আল্লাহ যেন পাকিস্তানকে উভয় দৈত্যের কবল থেকে রক্ষা করে আরো শক্তিশালীরূপে গড়ে তুলেন।

রুশ মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা উচ্চারণ করা জিয়াউল হকের জন্য ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এটা ছিলো বিশ্ব নেতৃত্বের গালে এক যথার্থ চপেটাঘাত। কোন মুসলমান নেতার মুখে রুশ মুসলমানদের কথা সত্তর বছর পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। এমন একটি আহ্বান শোনার জন্য রুশ মুসলমানরা সত্তর বছর পর্যন্ত চরম অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। জিয়াউল হক-এর ভাষণ শুধু রুশ মুসলমানদেরকেই উজ্জীবিত করেনি, সারা বিশ্বকে সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমানদের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছে। চেতনাবিস্মৃত রুশ মুসলমানরাও হারানো অনুভূতি ফিরে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে যে, সত্যিই রাশিয়ায় মুসলমানরা আযাদী হারিয়ে কত জঘন্য দাসত্ব বরণ করেছে।

সোভিয়েত সরকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের এ ঘোষণায় আঁতকে উঠেছিলো। সোভিয়েত শাসকবৃন্দ পাক প্রেসিডেন্টের ভাষণকে বিশ্বের সুপার পাওয়ার রাশিয়ার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করেছিলো। সোভিয়েত পত্রিকাগুলো পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিলো। বর্তমানে তা' আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। জিয়াউল হক রুশ শাসকদের আরাম হারাম করে দিয়েছেন।

প্রফেসর আইয়ূব বুখারী বলেনঃ আমরা প্রত্যাশা করি, আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সম্মিলিতভাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। উভয়ের সহযোগিতা পেলে আমরাও রাশিয়াকে আমাদের আবাসভূমি থেকে দখলদারিত্ব ছেড়ে পালাতে বাধ্য করতে পারবো।

আলী প্রফেসর বুখারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললোঃ আপনার সাথে আলোচনা করে রুশ মুসলমানদের পূর্বাপর ইতিহাস সম্পর্কে আমার ধারণা আরো স্বচ্ছ হয়েছে। আমি রুশ-আফগান মুজাহিদদের অভিন্ন মনে করি। ভৌগলিক অবস্থানে ভিন্নতা থাকলেও চেতনার দিক থেকে আমরা অভিন্ন, আমাদের শত্রুও অভিন্ন। আজ আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর রাশিয়ার যে অত্যাচার চলছে, এ জুলুম অত্যাচার রুশ মুসলমানদের লাশ মাড়িয়েই আফগানিস্তানে পৌঁছেছে। আপনাদের উপর কম্যুনিষ্ট রাশিয়া যে প্রক্রিয়ায় নির্যাতনের সূচনা করেছিলো, বর্তমানে আফগানিস্তানের মুসলমানদের ওপর তারই অনুশীলন চলছে। অতীতের আফগান সরকার সোভিয়েত আগ্রাসনের মোকাবেলায় আপনাদের সহযোগিতা না করার জন্য আফগান জনসাধারণ মোটেও দায়ী নয়। তখনকার শাসক গোষ্ঠীর কাপুরুষতাই এর জন্য দায়ী। শাসক গোষ্ঠীর কাপুরুষতার মূল্যই আজকের আফগান জাতির বিপুল রক্তের বিনিময়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে।

আইয়ুব বুখারী আলীর কথা শুনে বললেনঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো বেটা! রুশ মুসলমানদের অনেকেই তৎকালীন আফগান সরকারের অসহযোগিতাকে তাদের পরাধীনতার জন্য দায়ী করে থাকে। আবেগের বশীভূত হয়ে আমি একথা বলে ফেলেছি। তবে সত্য ও আমার সঠিক অবস্থান হলো, আফগান মুজাহিদদেরকে আমরা জীবনের চেয়েও বেশী ভালোবাসি। মুজাহিদদের বিজয় ও পরাজয়কে নিজেদের বিজয়-পরাজয় মনে করি। আমরা রুশ মুসলমানরা তো আফগানদের বিজয়ের সাথে আমাদের ভবিষ্যত মুক্তির স্বপ্ন দেখছি।

একটু থেমে প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেনঃ আলী! আমি অকপটে তোমাকে জানাচ্ছি যে, আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই আমরা রাশিয়ার মুসলমানদেরকে জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করেছি এবং সশস্ত্র জিহাদের সূচনা করেছি। জীবনের শুরু থেকেই কম্যুনিজম বিরোধী জনমত গঠনে আমি কাজ করেছি। কিন্তু ক্যাম্প স্থাপন করে দস্তুরমতো যথার্থ জিহাদের সূচনা আফগানদের দেখেই শুরু করেছি। বর্তমানে এই ক্যাম্পে শতাধিক মুজাহিদ সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার মুজাহিদ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব স্ব পেশায় ফিরে গেছে।

রাশিয়ায় কম্যুনিজম বিরোধী মুজাহিদ রিক্রুট করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এক তো সিংহভাগ মুসলমান স্বাধীন চেতনা হারিয়ে বসেছে, দ্বিতীয়ত কেজিবির কঠিন জাল ভেদ করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণে যোগদান খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। এখানে পৌঁছতে একজন মুজাহিদকে বহু ঘাঁটি ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়। বহু বাধা তাকে ডিঙাতে হয়।

এখানে আমরা প্রত্যেক মুজাহিদকে ছয় মাসের সামরিক ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্ব স্ব কর্মে ফিরে যেতে নির্দেশ দেই। অবশ্য তাদের প্রতি অনুরোধ থাকে, বছরের একটি মাস অন্তত প্রত্যেক মুজাহিদকে ক্যাম্পে কাটাতে হবে এবং বাকী এগারো মাস

সে নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে সার্থকতার সাথে সাংগঠনিক কাজ করবে আর জিহাদের ফান্ড সংগ্রহ করবে। সদস্য সংখ্যা বাড়ানোও তাদের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারী বললেন, আমাদের কাছে জিহাদ পরিচালনার মত প্রয়োজনীয় অস্ত্র সামগ্রী বলতে গেলে কিছুই নেই। আমরা একান্তভাবে কামনা করি যে, আফগান মুজাহিদরা আমাদের সাহায্য করবে। অর্থাৎ যে সব অস্ত্র তারা রুশবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, এ সব থেকে আমাদের কিছু দেবে। আমরা তাদের উচিৎ মূল্য অবশ্যই পরিশোধ করবো। এর সাথে সাথে আমরা অন্য একটি তাকিদ খুব বেশী অনুভব করছি, আশাকরি আফগান মুজাহিদরা এ অভাবটুকু পূরণেও আমাদের সাহায্য করবে, তাহলো, রুশ ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও ধর্মীয় পুস্তকাদি ছেপে সরবরাহ করা এবং সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য সমরবিদ প্রশিক্ষক দিয়ে সাহায্য প্রদান।

আলী প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর প্রত্যাশার জবাবে বললো, রাশিয়ায় রুশ ভাষায় বই-পুস্তক সরবরাহের কাজ আহমদ খান নামের এক লোক করছেন, পাকিস্তানে রুশী ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রিন্টিং এর কাজ চলছে। অচিরেই আশা করা যায়, পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামী সাহিত্য রুশ মুসলমানদের জন্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। আমার মনে হয়, রুশ মুসলমানদের ইসলামী পুস্তকাদির প্রয়োজন অস্ত্রের চেয়েও বেশী। আপনি যে তিনটি চাহিদার প্রস্তাব করেছেন, আমি আফগানিস্তান গিয়ে আমার চীফ কমান্ডারের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবো। আপনার প্রস্তাবিত প্রয়োজন ছাড়াও সম্ভব সব ধরনের সহায়তা করতে আমরা সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকব। ইনশা আল্লাহ।

অনেক রাত হয়ে গেছে তখন। আলোচনার বিরতি টেনে প্রফেসর বুখারী বললেন, আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, আগামীকাল বাকী কথা হবে।

পর দিন প্রফেসর আইয়ুব বুখারী আলী ও আব্দুর রহমানকে পুরো ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেখালেন, ক্যাম্পের অবস্থান ও কৌশলগত সুবিধার কথাও বুঝিয়ে বললেন। ক্যাম্পের অবস্থান ও কৌশলগত বিষয়ে আলী বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন। প্রফেসর বুখারী সাথে সাথে আলীর কথাগুলো নোট করে নিলেন।

ক্যাম্পের স্থাপনা-বাংকার আলী ও আব্দুর রহমানকে দেখানোর পর নিজ আস্তানায় ফিরে এসে প্রফেসর বুখারী সকল মুজাহিদের উদ্দেশে নির্দেশ পাঠালেন, আজ সন্ধ্যায় সকলে আমার বাংকারে সমবেত হবে।

সকল মুজাহিদ প্রফেসর বুখারীর বাংকারে মাগরিবের নামায আদায় শেষে বসলো। আইয়ুব বুখারী সমবেত মুজাহিদদের কাছে আলী ও আব্দুর রহমানের পরিচয় দিয়ে আলীকে আফগান জিহাদ সম্পর্কে উপস্থিত মুহাহিদদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার অনুরোধ করলেন।

আলী রুশ মুসলমান মুজাহিদদের কাছে আফগান জিহাদের বিস্তারিত বর্ণনা শেষে বললো, আমি মুজাহিদদেরকে ভৌগলিক সীমানায় বিভক্ত ও আবদ্ধ করার পক্ষে নই।

মুজাহিদের বড় পরিচয় সে মুজাহিদ। সে আফাগানী হোক, রুশী হোক কিংবা ফিলিস্তিনী কিংবা কাশ্মীরী, আরাকানী সবাই মুজাহিদ, সবাই ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, আযাদীর সৈনিক। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিভক্তি টানা উচিত নয়। এসব চিন্তা মুজাহিদদের মধ্যে ভৌগলিক ও অঞ্চলিক বিরক্তি সৃষ্টি, নেতৃত্বের মোহ এবং জাগতিক উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটায়। এমনটি আল্লাহ্‌র পথে খাঁটি জিহাদের পরিচায়ক নয়। প্রকারান্তরে, যারা এ ধরনের চিন্তা করে তারা মুসলমানদের দুশমন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের লক্ষ সকল পরাধীন মুসলমানের আযাদী পুনরুদ্ধার করা। ভৌগলিক বিভক্তি সৃষ্টি দ্বারা কখনও বিশ্বের সকল পরাধীন মুসলমানের মুক্ত করা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল মুজাহিদকে এক ও অভিন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে জিহাদ করতে হবে।'

আলীর বক্তৃতা শেষ হলে সমবেত সকল রুশ মুজাহিদ উচ্চ আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে শ্লোগান দিলো, 'না রাশিয়া না আফগানিয়া ইসলামিয়া! ইসলামিয়া! -------------------

বক্তৃতাপর্ব শেষ করে সকল মুজাহিদ এক সাথে আহার সারলেন। আহারান্তে আলীকে মুজাহিদরা জিহাদ, বিশ্ব মুসলিমের অবস্থা এবং আফগান জিহাদ সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্ন করে। আলী সুন্দরভাবে সকল প্রশ্নের জবাব দেয়। সবাই আলীর জবাবে সন্তুষ্ট হয় এবং আলীর আগমনে নিজেদের সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে ধন্যবাদ জানায়। গভীর রাত পর্যন্ত মুজাহিদদের সাথে আলীর মতবিনিময় পর্ব চললো।

প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর অনুরোধে আলী ও আব্দুর রহমান এক সপ্তাহ অবস্থান করে এখানের মুজাহিদদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। আইয়ুব বুখারীকে বহু দরকারী পরামর্শ দেয়।

এক সপ্তাহ কাটানোর পর আলী আইয়ুব বুখারীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। আইয়ুর বুখারী ভারাক্রান্ত দরদী কণ্ঠে বললেন, ভাই আলী! আশাকরি আফগানিস্তান যেয়ে আমাদের ভুলে যাবে না।

আলী তাকে আশ্বাস দিলো, কখনও ভুলবো না। ইনশাআল্লাহ দেখবেন, কয়েকমাসের মধ্যেই অস্ত্র, ইসলামী বই-পুস্তক আসতে শুরু করেছে। বিদায় বেলা সকল মুজাহিদ সমবেত হয়ে বিশ্বের সকল নির্যাতিত মুসলমানের মুক্তির জন্য মোনাজাত করলো এবং তকবীরে তকবীরে মুখরিত করে আফগান কমান্ডার আলী ও আব্দুর রহমানকে বিদায়ী অভিবাদন জানালো।

আলী ও আব্দুর রহমানের সফর সহজ হওয়ার জন্য প্রফেসর বুখারী কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করলেন। দু'টিতে তারা আরোহন করে অন্যগুলোতে ক'জন সাথী মুজাহিদ পাঠালেন ঘোড়াগুলো ফেরৎ এবং যাত্রা পথ নিস্কন্টক করে তাদের নিরাপদ স্থানে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য। গোড়ার চড়ে রওয়ানা দিয়ে এক দুপুরেই আলী ও

আব্দুর রহমান মেইন সড়কের কাছে রাখা তাদের গাড়ীর কাছে পৌঁছে গেলো। সাথী মুজাহিদদের বিদায় দিয়ে গাড়ী নিয়ে আলী ইসমাঈল সমরকন্দীর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়। অনেক রাতে তারা ইসমাঈল সমরকন্দীর বাড়ীতে হাজির হয় এবং রাতে সেখানেই থাকতে মনস্থ করে।

ইসমাঈল সসমরকন্দী আলীকে জানান, আপনাদের যাত্রা অনেক সুগম হয়েছে, স্টিমার এসে গেছে। স্টীমারেই আপনারা ফিরতে পারবেন।

পর দিন ইসমাঈল সমরকন্দী তার নিজস্ব গাড়ীতে করে আলী ও আব্দুর রহমানকে আমু দরিয়ার তীর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন এবং স্টিমারে আরোহনের সকল ব্যবস্থা নিজে থেকেই তদারকী করলেন।

দরিয়া পার হয়ে আলী আব্দুর রহমানকে নিয়ে আহমদ খানের বাগানে তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে আহমদ খানের অনুরোধে তাদের রাত এখানেই কাটাতে হলো।

আহমদ খান রাশিয়ার পরিস্থিতি কি জানতে চাইলেন।

আলী সফরের মোটামুটি একটি চিত্র তার সামনে তুলে ধরে অনুরোধ করলো, আপনি খুব শীঘ্রই রুশভাষায় ছাপানো ইসলামী বই-পত্র ওপারে পাঠানোর চেষ্টা করুন। ওখানে ইসলামী বই এর তীব্র প্রয়োজন আর এর পাশা-পাশি রুশ মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে।

অনেক যুক্তি-তর্কের পর আহমদ খান বই-পুস্তক এবং অস্ত্র উভয় রাশিয়ায় সরবরাহ করার জন্য রাজী হলেন।

দ্বিতীয় দিন তারা কমান্ডার যবানগুল খান-এর ক্যাম্পে পৌঁছে এবং রাশিয়ায় সফরের রোমাঞ্চকর কাহিনী মুজাহিদদের শুনায়। মুজাহিদরা আলীর রাশিয়া সফরের বর্ণনা শোনে আরো উজ্জীবিত হয়।

যবানগুল খানের ক্যাম্প হয়ে দ্রুত আলী নিজ ক্যাম্পে পৌঁছলো এবং সর্বাগ্রে দরবেশ খানের সাথে বৈঠকে মিলিত হলো। এ দেড় মাসের মধ্যে দরবেশ খান বেশ কয়েকটি সফল অপারেশন পরিচালনা করেছেন। আলীর অনুপস্থিতিতে দরবেশ খান তার যাবতীয় কার্যক্রমের বর্ণনা দিলে আলী তার সুষ্ঠু কমান্ডিং-এ অভিভূত হয় এবং দরবেশ খানকে ধন্যবাদ জানায়।

এক সপ্তাহ আলী ক্যাম্পে অবস্থান করে সকল অধীনস্ত মুজাহিদ কমান্ডারের সাথে পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যত কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শে বসে। তারপর আব্দুর রহমানকে নিয়ে হেডকোয়ার্টারের দিকে রওয়ানা হয়।

হেডকোয়ার্টারে এসে আলী তার রাশিয়া সফরের বিস্তারিত ঘটনাবলী সম্পর্কে চীফ কমান্ডারকে অবহিত করে। চীফ কমান্ডার আলীর দুঃসাহসিক রাশিয়া সফরের কাহিনী

শুনে দারুণ অভিভূত হন। তিনি আলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাশিয়ায় প্রফেসর আইয়ুব বুখারীর মতো বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন আমরা অনেকদিন থেকেই অনুভব করছি-তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এসেছো। আমরা শীঘ্রই আইয়ুব বুখারীকে সব ধরনের সহযোগিতা দানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

চীফ কমান্ডার আলীকে বললেন, তুমি অনেক দিন বাইরে কাটিয়ে এসেছো। তাহেরাকে পাকিস্তান পাঠিয়ে আর খোঁজ নেয়ার সময়ও পাওনি। এখন ওর সাথে দেখা করে এসো।

পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে আইয়ুব বুখারী সম্পর্কে কি করা যায়, সে ব্যবস্থা তোমাকেই নিতে হবে। আগ্রহী হলে আব্দুর রহমানকেও তোমাদের সাথে পাকিস্তান নিয়ে যাও। পাকিস্তানে রুশ ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক মুদ্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে আব্দুর রহমানের তত্ত্বাবধানে আফগানিস্তানেই আমরা রুশ মুজাহিদদের দিয়ে জরুরী পুস্তকাদি ছাপানোর ব্যবস্থা নেবো।

চীফ কমান্ডারের নির্দেশে আলী আব্দুর রহমানকে নিয়ে পাকিস্তান এলো। তাহেরা, খলিল ও তাহেরার আম্মা আলী ও আব্দুর রহমানের আগমনের যারপরনাই খুশী হলো। যুবায়দা ও আব্দুর রহমানের আম্মার পাঠানো উপহার তারা সানন্দে গ্রহণ করলো।

তাহেরা আব্দুর রহমানকে বললোঃ ভাইজান! আমার পক্ষ থেকে কি যুবায়দাকে কিছু দেয়া হয়েছিল?

আব্দুর রহমানের পক্ষে আলী তাহেরার জবাবে বললোঃ কেবল একটি নয় অনেকগুলো দামী ও পছন্দনীয় উপহার তোমার পক্ষ থেকে যুবায়দাকে এবং আব্দুর রহমানের আম্মাকে দেয়া হয়েছে।

কুশল বিনিময়ের পর তাহেরা আলী ও আব্দুর রহমানের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করতে রান্না ঘরের দিকে চলে যায়। আব্দুর রহমান তাহেরার মায়ের সাথে বিগত দিনের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছো, এর ফাঁকে আলী খলিলের লেখা-পড়া এবং তার মাদ্রাসার হাল-হকিকত জেনে নিলো।

এক সকালে। আলী ও আব্দুর রহমান নাস্তা করছে।

আব্দুর রহমান বললোঃ আলী! রণাঙ্গন ছেড়ে এলাম এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলো। শুধু বসে বসে দিন কাটছে, আম্মা ও তাহেরার সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা ছিলো তা তো হয়েছে। তা ছাড়া আমার এখানে থাকার তো কোন দরকারও নেই। তাড়াতাড়ি রণাঙ্গনে ফিরে যাওয়া উচিত।

একটু দূরে বসে তাহেরা রুটি সেকছিলো।

আব্দুর রহমানের কথা শুনে তাহেরা বললোঃ ভাইজান! আমার আদর-যত্নে কোন ত্রুটি হয়েছে নাকি! আসলেন এক সপ্তাহ হলো না, আপনি চলে যাওয়ার জন্য হাসফাস করছেন! পুরো মাস থেকে না গেলে আমি মনে করবো, হয়তো আদর-যত্নে কোন ত্রুটি হয়েছে অথবা আমার এখানে থাকতে আপনার কষ্ট হচ্ছে এবং আমাদের প্রতি আপনার মনে আদৌ দরদ নেই।

আব্দুর রহমান বললোঃ

না তাহেরা! এমন মনে করার কোন অবকাশ নেই। তোমার মতো বোনের কাছে হাজার বছর থাকলেও আদর-যত্নে ঘাটতি হবে না। তা ছাড়া মন তো চায় তোমার কাছে অনেক দিন থাকি, কিন্তু ভাই! কোন মুজাহিদের পক্ষে জিহাদের ময়দান ছাড়া অন্য কোথাও মন টেকার কথা নয়, তা তো তুমি অবশ্যই বুঝো!

আলী বললোঃ আব্দুর রহমান! আমারও কেমন জানি একঘেয়েমি লাগছে। আমার হাতে খুজলী দেখা দিয়েছে। বহু দিন হয়ে গেল বন্দুক ব্যবহার করতে পারছি না। হাত পা ছমছম করছে। আমার ইচ্ছে করে, আমি এখনই রণাঙ্গনে ফিরে গিয়ে জিহাদে শরীক হই।

অনতি দূরে একটি মোড়ায় বসে খলিল তাদের কথা শুনছিলো।

সে আব্দুর রহমানের উদ্দেশে বললোঃ আব্দুর রহমান ভাই! আমার কাছে একটি প্রস্তাব আছে, এটা গ্রহণ করলে আপনার সময়ও কেটে যাবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও হয়ে যেতে পারে।

কি প্রস্তাব তোমার, খলিল!

জানার আগ্রহ দেখে খলিল বললোঃ পাকিস্তানে ব্যাপক চোরাগুপ্তা হামলা এবং বোমাবাজি হচ্ছে। এসব অপকর্মের সাথে কিছু বিভ্রান্ত লোক জড়িত, যদিও কাজটি রুশ গেয়েন্দারাই পরিচালনা করছে। এসব চোরাগুপ্তা। হামলায় শরণার্থী ও পাকিস্তনীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এদের চিহ্নিত করে নির্মূল করতে পারলে পাকিস্তানী সুহৃদ এবং আফগান উদ্বাস্তু মুজাহিদ উভয়েরই উপকার হবে। আমার মনে হয়, আপনি এদের নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই সফল হবেন এবং রুশ গোয়েন্দাদেরও পাকড়াও করতে পারবেন।

ওহ! খুব ভালো একটা কাজের প্রস্তাব তুমি করেছো খলিল! তবে কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয়। একটু ভেবে বললো আব্দুর রহমান।

আলী এতোক্ষণ খলিল ও আব্দুর রহমানের কথা শুনছিলো।

এ পর্যায়ে আলী বললোঃ খলিল যা বলেছে, তা নিঃসন্দেহে একটা রূঢ় বাস্তব।

মুজাহিদ নামধারী কতিপয় গাদ্দার পার্থিব স্বার্থে কেজিবির চরবৃত্তি শুরু করেছে। যার ফলে পাকিস্তানে আফগান শরণার্থীদের মধ্যে জিহাদ সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক বিভ্রান্তি। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে এরাই ব্যবহৃত হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বোমাবাজী ও চোরাগুপ্তা হামলার ক্রীড়নক হিসেবে–এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কী আব্দুর রহমান!

ওরা যে শুধু শরণার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে, তা নয়। পাকিস্তানে অবস্থানরত মুজাহিদ নেতাদের গুপ্ত হত্যায়ও ওদের হাত রয়েছে। হ্যাঁ, আজ থেকেই আমরা এদের দমন কাজ শুরু করবো। আব্দুর রহমান দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লো।

আব্দুর রহমানের সুদৃঢ় সংকল্প শুনে আলী বললোঃ আব্দুর রহমান! তুমি খলিলকে নিয়ে এ কাজ শুরু করতে পারো। আমি এখানে মুজাহিদ ইনচার্জের সাথে আজই কথা বলবো।

মুজাহিদ ইনচার্জকে বলতে হবে, আমাদের এ পরিকল্পনা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে। আব্দুর রহমান আলীকে সতর্ক করে দিলো।

রাতে আলী ও আব্দুর রহমান গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে দু'জনের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলো। আলী বস্তি, দোকান-পাট ও বানিজ্যিক এলাকায় অনুসন্ধান চালাবে, দুস্কৃতিকারীদের কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা। আর আব্দুর রহমান সরকারী অফিস, হাসপাতাল এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান করবে।

খলিল পড়ার ফাঁকে উভয়ের কাজে সাধ্যমতো সহযোগিতা করতে শুরু করলো।

দু' সপ্তাহ অনেক অনুসন্ধান চালানোর পরও তারা কোন ক্লু বের করতে পারলো না। এদিকে রণাঙ্গন ছেড়ে তাদের পাকিস্তানে চব্বিশ দিন গত হয়েছে। তাদের কাজের কোনই কিনারা হলো না। সারা দিন গভীর মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করে রাতে তিনজন কাজের পর্যালোচনা করে, পর দিন আবার বেরিয়ে পড়ে। মোটামোটি সন্ধ্যান পর পরই যেখানেই থাকুক সবাই বাসায় ফিরে আসে।

আজ আলী ও খলিল সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরে এসেছে। কিন্তু আব্দুর রহমান এখনও ফিরে আসেনি। আলী আব্দুর রহমানের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। আব্দুর রহমান ফিরছে না। অথচ পাকিস্তানের এ সীমান্ত অঞ্চলটি মোটেই নিরাপদ নয়। গোত্রশাসিত এ অঞ্চলে রাতে আনাগোনা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অস্ত্রধারী পেশাদার ডাকাতরা হর-হামেশা পথচারিদের উপর আক্রমণ করে। রাত্রে কেউ একাকী তো দূরের কথা, দলবল নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায়ও বাইরে যাওয়া নিরাপদ মনে করে না। যে কোন সময় ওঁৎ পেতে থাকা ডাকাত দল অতর্কিতে হামলা করে অস্ত্রসম্পদ সবই ছিনিয়ে নিতে পারে।

এ অঞ্চলের এই ট্রাজেডি শত বছরের পুরনো। এ কথা ভেবে বাসার সবাই বড় চিন্তিত হয়ে পড়লো, অস্থিরভাবে ঘরের মেঝে পায়চারি করছিলো আলী।

এক পর্যায়ে আলী তার মুজাহিদ এজেন্সিতে ফোন করলো। কিন্তু সেখানে আব্দুর রহমানের কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না।

বিষন্ন মনে আলী তাহেরার কাছে আশংকা ব্যক্ত করে বললো, তাহেরা! আমার ভয় হচ্ছে যে, আব্দুর রহমান রাশিয়ান এ কথা যদি কেজিবির পাকিস্তানী এজেন্টরা জেনে ফেলে, তাহলে ওরা আব্দুর রহমানকে অপহরণ করতে পারে।

তাহেরা ও তাহেরার আম্মা আব্দুর রহমানের অমঙ্গল চিন্তায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়েছিলো। আলীর মুখে আশংকাজনক কথা শুনে তাহেরা অনুযোগের স্বরে বললোঃ আপনি ঘরে টহল দিবেন, না কিছু করবেন? অনুগ্রহপূর্বক আমার ভাইয়ের জন্য কিছু একটা করুন। আল্লাহ না করুন তার কিছু ....

আলী মুজাহিদ অফিসে টেলিফোন করে একটি গাড়ী আনালো। দু'জন সশস্ত্র মুজাহিদকে বললো গাড়িতে থাকতে। খলিলকে সঙ্গে করে নিজে গাড়ী চালিয়ে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করলো। কিন্তু আব্দুর রহমানকে পাওয়া গেলো না। মুজাহিদ অফিসের গেটকিপার বললো, আব্দুর রহমান সাহেব অন্যান্য দিনের মতো অফিস বন্ধ হওয়ার সময়ই চলে গেছেন। কিন্তু কোথায় গেছেন এমন কোন সন্ধান কারো কাছে পাওয়া গেল না।

রাত সাড়ে দশটায় ভগ্নমনে আলী বাসায় ফিরে আসে।

তাহেরা আব্দুর রহমানের নিখোঁজ সংবাদে ভেঙ্গে পড়ে। তার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অজস্র অশ্রু।

আলী তাহেরাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তাহেরার কান্না আরো বেড়ে যায়। সে এবার ডুকরে কেঁদে উঠে।

তাহেরার কান্না দেখে আলীও ভড়কে গেলো, ভেবে পাচ্ছিলো না, যে মেয়ে আপন ভাইকে নিজ হাতে হত্যা করে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেললো না, এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করলো না, আর সেই মেয়ে পাতানো ভাইয়ের জন্যে এভাবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে!

আলী একটু কঠিন হলো। বললো, তাহেরা! আব্দুর রহমান কোন অবুঝ শিশু নয়। যদি ওকে কেজিবি অপহরণ করে থাকে, তবে যেভাবেই হোক আগামী কালের মধ্যেই আমি ওকে মুক্ত করবো-ইনশাআল্লাহ। যেখানেই থাক না কেনো, ওকে আমি খুঁজে বের করবই করব।

আব্দুর রহমান যদি আমার আপন ভাই হতো, তাহলে সে শহীদ হলেও আমি এতটুকু বিচলিত হতাম না। কিন্তু সে আমার আপন ভাইয়ের চেয়েও পরম আত্মীয়, যে পবিত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আমাকে বোন হিসেবে গ্রহণ করেছে, পরদেশী হয়েও

আমাদের স্বাধীনতা ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার্থে জিহাদ করছে, নিজে মা-বাবা প্রেমিকার স্নেহমায়া, ভালোবাসা উপেক্ষা করে দ্বীনের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, মৌখিক ডাকের বোন হলেও ভাই হিসেবে আমাকে যে স্নেহ আদর দিয়েছে, পৃথিবীতে এর নজীর খুবই কম পাবেন।

আমি তার কোন অনিষ্ট কল্পনাও করতে পারছি না। তা ছাড়া সে আমাদের মেহমান। তার সকল শুভ দিক হেফাজত করা আমাদের দায়িত্ব। আমি আর ভাবতে পারছি না। খোদার কসম! আপনি ওর জন্য কিছু একটা করুন।

তাহেরার মা আলী ও তাহেরা উভয়কে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন আর বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের পেরেশানী নিয়ে কথা বলছিলেন।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

আলী রিসিভার উঠালেই ওপাশ থেকে আব্দুর রহমানের কণ্ঠ ভেসে এলো। মুহূর্তের মধ্যে চেহারার সকল দুঃশ্চিন্তা খুশীর আভায় তলিয়ে গেলো।

আলী উচ্চস্বরে বলে উঠলোঃ আব্দুর রহমান ! তুমি কোথায়? কোত্থেকে বলছো, এতো রাত হলো এখনও তুমি বাসায় ফিরলে না! তোমাকে সারা শহর খুঁজে আমরা হয়রান, বাসায় কারো পানাহার নেই। কাঁদতে কাঁদতে তাহেরার অবস্থা একেবারে বেহাল!

আলী এক নিঃশ্বাসে অবস্থাটা তুলে ধরলো।

ভাই আলী! আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছি। তাহেরাকে আমার কুশল জানাও আম্মাকেও বলো।

আর হ্যাঁ, তুমি এক্ষুণি মুজাহিদ দফতরে এসো। আমি মুজাহিদদের দু'টি গাড়ী পাঠিয়েছি। আসার সময় পথে যে সব মুজাহিদ অবস্থানরত আছে সবাইকে নিয়ে এসো। তবে বাসায় দু'জন সশস্ত্র পাহরাদার রেখে আসতে ভুল করো না।

আলীঃ কোন গোয়েন্দা আড্ডার সন্ধান পেয়েছো মনে হয়?

আব্দুর রহমানঃ হ্যাঁ।

তাহেরাকে দু'কথা বলে শান্ত করো যে, তুমি ভালো আছো, নিরাপদে আছো, সুস্থ আছো।

তাহেরা দ্রুত আলীর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে ভূমিকা ছাড়াই বললোঃ ভাইজান! আপনি আমাদের অনেক পেরেশান করেছেন। সেই সন্ধ্যা থেকে আমরা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছি। আপনি এর আগে একটি টেলিফোন করলেই পারতেন।

আব্দুর রহমান বললোঃ বোন আমার! আমি দুঃখিত। তোমাদের বড় কষ্ট দিয়েছি। অতটা ভাবনার কি আছে। আমি ছোট্ট শিশু নাকি? আমাকে কারো পক্ষে ধরে নেয়া কি অতো সহজ?

এতোটা দেরী হয়ে যাবে, তা আগে বুঝাতে পারিনি, এ জন্য টেলিফোন করার প্রয়োজন বোধ করিনি আর যখন দেরী হয়ে গেছে, তখন আর টেলিফোন করার সুযোগ ছিলো না। তোমাদের পেরেশানির কথা শুনে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আগামীকাল ভোরে যখন বিলম্বের কারণ জানতে পারবে, তখন যেরূপ পেরেশান হয়েছো, ঠিক তদ্রূপ খুশী হবে।

আলীকে খাইয়ে আমার খানাও ওর কাছে দিয়ে দিও। রাতে আর বাসায় ফেরা সম্ভব হবে না হয়ত।

তাহেরাঃ ভাইজান! কোন আশংকাজনক পরিস্থিতি নয় তো?

আব্দুর রহমানঃ মুজাহিদ কোন আশংকাকে ভয় করে না। তোমার মুখে এসব আশংকার কথা মানায় না তাহেরা! আর কখনও এমন কথা বললে কিন্তু আমি ভীষণ কষ্ট নেবো।

ঠিক আছে আর এমন হবে না। বললো তাহেরা।

খলিল ও অন্য এক মুজাহিদকে আলী পাহারা দেয়ার জন্য রেখে পাকিস্তান থেকে আগত মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন শিবির থেকে জাগিয়ে গাড়ীতে তুলে নিলো। পনের বিশজন মুজাহিদকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আলী মুজাহিদ দফতরে পৌঁছলো।

মুজাহিদ দফতরটি ছিল সীমান্ত শহরের এক পাশে আবাসিক এলাকার বাইরে বিচ্ছিন্ন একটি পুরাতন বাড়ীতে। দফতরের পাশ ঘেঁষেই প্রবাহমান একটি ছোট্ট নালা। দফতরটি যে এলাকায় অবস্থিত, সেটির সন্নিকটেই শহরের বড় কবরস্তান। এ কবরস্তানে শহীদের অসংখ্য কবর। নতুন কবরগুলোতে লাল নিশান রাতের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে। দফতরের পাশের একটি খোলা জায়গায় মুজাহিদদের গাড়ী গ্রেজ এবং ঘোড়া-খচ্চরের আস্তাবল।

আলী দফতরে ঢুকেই দেখলো, দফতরের এক কোণে এক যুবতী মহিলা মুখ নীচু করে বসে আছে। তার হাত পিছন থেকে বাধা। মহিলাটির পাশেই এ দফতরের বাইতুল মাল-এর ইনচার্জ আসফ খান। তারও হাত-পা শক্তভাবে বাঁধা। বিমর্ষ আসফ খান। আসফ খান ও মহিলার অবস্থা দেখে আলী বুঝতে পারলো, এদের খুব পিটানো হয়েছে।

আলী লক্ষ্য করলো, দফতরটি বেশ জমকালো। পুরো বাড়িটি দামী কার্পেটে সজ্জিত। দফতরের দেয়ালের একদিকে বড় একটি আফগান মানচিত্র। অপর দিকে মুজাহিদদের দলীয় পতাকা সুদৃশ্য একখানা ফ্রেমে বাধানো। তা ছাড়া কয়েকটি তেল রং এর পেট্রেটও রয়েছে।

আব্দুর রহমান আলীকে বললোঃ আসফকে তো তুমি জান। এ মহিলা ওর স্ত্রী। ওদের কাছ থেকে দেড় দু' ঘন্টায় আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। খুব দ্রুত

অপারেশন চালাতে হবে। আপাততঃ এদের দলনেতাকে গ্রেফতার করতে হবে। বিস্তারিত পরে বলবো, এখন চলো।

দু'জন শক্তিশালী ও চৌকস মুজাহিদকে এদের পাহারায় বসিয়ে দফতরের মেইন গেটে তালা লাগিয়ে গেটের বাইরে দু'জন সশস্ত্র মুজাহিদ, বাড়িটির ছাদের উপরেও একজন অস্ত্রধারী মুজাহিদকে নিয়োজিত করলো যে কোন ধরনের বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা উদ্দেশ্যে।

এরপর আলী ও আব্দুর রহমান বারোজন মুজাহিদ সাথে নিয়ে ইপ্সিত লক্ষ্যে বের হলো।

শহরটি ছিলো সীমান্ত প্রদেশের একেবারে আফগান মুক্তাঞ্চলের গা লাগানো। এখানকার অধিবাসী বিশ হাজারের বেশী নয়। কিন্তু উদ্বাস্তু শরণার্থীদের আগমনে শহরের বাসিন্দা বেড়ে গেছে। এ ছাড়া শহরটি সীমান্ত প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবসা কেন্দ্রও বটে।

রাতের সুনসান পথঘাট। কোথাও জনরব নেই। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো গাড়ির লাইটে পড়ে ভয়ার্ত ঘেউ ঘেউ শব্দে নিশির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিলো। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে বন্য জানোয়ারের আনাগোনাও চোখে পড়লো। কয়েকটি গলি চক্কর দিয়ে শহরের অপর প্রান্তে একটি সরু গলিতে এসে আব্দুর রহমান গাড়ী থামালো। গাড়ী থেকে নেমে আব্দুর রহমানের ইঙ্গিতে মুজাহিদরা অগ্রসর হলো। এক জায়গায় এসে আব্দুর রহমান দু' মুজাহিদকে বললোঃ তোমরা ডান দিকের গলিতে প্রবেশ করে অগ্রসর হয়ে প্রথম বায়ের গলিতে ঢুকে সামনের মসজিদের পাশে দাঁড়াবে। সেখানে পৌঁছে ডানে-বায়ে কোন মানুষকেই যেতে দেবে না। যদি কেউ ছাদের উপর থেকে উঁকি দিয়ে গলির অবস্থা দেখতে চায়, তাকে তৎক্ষণাৎ ঠান্ডা করে দিবে।

অন্যান্য মুজাহিদদের নিয়ে আব্দুর রহমান বায়ের গলিতে অগ্রসর হলো। একটু অগ্রসর হলেই সামনে পড়লো এক বিশাল বাড়ী। আব্দুর রহমান আলীকে বললো, এটাই সে বাড়ী যেটা অত্র এলাকার 'খাদ' এর দফতর।

বাড়িটি ছিলো যথেষ্ট সুরক্ষিত। ভিতরে প্রবেশ করা ছিলো দুরূহ ব্যাপার। কিভাবে ভিতরে ঢোকা যায়া, এ ব্যাপারে দু'জন পরামর্শ করে ঠিক করলো, পাশের বাড়ীর ছাদ দিয়ে ওই বাড়ীর পাচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করবে। লাগোয়া বাড়িটির দরজায় কড়া নাড়লো আলী। বাড়ীওয়ালা মেইন দরজা না খুলে একটি খিড়কি খুলে হাঁক দিলো, কে?

লোকটির হাঁক শুনেই আলী বুঝতে পারলো, আরে এতো পাকিস্তান সীমান্ত প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসার তার বিশ্বস্ত বন্ধু উমর সাইয়্যাদ। আলী নিজের নাম বললো, আমি কমান্ডার আলী, দরজা খুলুন। আপনাকে ভীষণ প্রয়োজন। আলী পরিচয় দিলে উমর সাইয়্যাদ দরজা খুলে তাদের ঘরে আসতে আহবান করলো। আব্দুর রহমান চার মুজাহিদকে দিক নির্দেশনা দিয়ে বাইরে সর্বোত সতর্ক অবস্থায় রেখে বাকীদের নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

উমর সাইয়্যাদ এতো রাতে দলবল সহ আলীকে আসার কারণ জিঞ্জেস করলো। জানতে চাইলো, কমান্ডার আলী! এতো রাতে কি দরকার হয়ে পড়লো?

আলী তাদের অপারেশন ও পটভূমি বিস্তারিত বললো।

উমর আলীকে সমর্থন করে বললোঃ আলী, বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সন্দেহ করছিলাম যে, এই এলাকায় কোন গুপ্ত দল ক্রিয়াশীল। আমি উর্ধ্বতন মহলে লিখিতভাবেও আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছিলাম, কিন্তু অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা বললো, উদ্ভট চিন্তা না করে নিজের দায়িত্বে মনোযোগ দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমার কোন কোন বন্ধু অফিসার এও বললো যে, এ এলাকায় অধিকাংশ নিরপরাধ মুজাহিদরা থাকে। তাছাড়া এ বাড়িটিও ব্যবহার করে মজলুম মুজাহিদরা। শুধু শুধু নিরপরাধ মানুষদের ধরে এনে হয়রানী করার কোন অর্থ হয় না। এদের এসব কথা-বার্তায় সমর্থন না পেয়ে আমি আর সন্দেহটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারলাম না।

বুঝা গেলো, কতিপয় পাকিস্তানী অফিসারও এই শত্রু পক্ষের সাথে আতাত করেছে আলী বললো।

উমর সাইয়্যাদ বললোঃ স্বাধীনতা বিরোধী গাদ্দার ছাড়া নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড বাইরের লোকেরা এসে করতে পারে না। এরাই টাকার লোভে দুশমনদের সব ধরনের তথ্য সরবরাহ করে। যার ফলে শান্তিকামী মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও চোরাগুপ্তা হামলা কোনভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না।

উমর সাইয়্যাদ মুজাহিদদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে নিজের বন্দুক এনে দিলো এবং ছাদের উপরে উঠে 'খাদ' দফতরে হানা দেয়ার সম্ভাব্য পরিকল্পনা বাস্তাবায়নে দিক নির্দেশনা দিলো।

উমর সাইয়্যাদের সহযোগিতার ফলে অনায়াসে মুজাহিদরা ছাদ টপকে 'খাদ' দফতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। এখানে কেউ হানা দিতে পারে এ ব্যাপারে দুস্কৃতিকারীরা ছিল সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। যার ফলে এরা সার্বক্ষণিক কোন পাহারাদার নিযুক্তির প্রয়োজন বোধ করেনি। নিশ্চিন্তে সবাই ঘুমাচ্ছে। আর ঘুমের মধ্যেই ওরা আব্দুর রহমান ও আলীর হাতে ধরা পড়লো। দুস্কৃতিকারীদের দল নেতা আফগান

কম্যুনিষ্ট সরকারের সেনা অফিসার মেজর গুলখানও ধরা পড়লো। এদের হাত পা বেঁধে সারা ঘর তল্লাসী করা হলো। একটি শক্তিশালী ওয়ারলেস সেটসহ অনেকগুলো আকিটাকি, হাত ও টাইম বোমা, বোমা তৈরীর সরঞ্জাম, গোলাবারুদ, অস্ত্র, আফগান মুজাহিদ স্থাপনা ও পাকিস্তানী সামরিক স্থাপনার নক্সা, খাদের নীল নক্সার লিটারেচার, রিভালভার এবং হিরোইনের বিরাট মওজুদ ওদের ঘরে পাওয়া গেলো। ওয়ারলেস সেটটি ছিলো এমনই শক্তিশালী যে, পাক সরকারী ইনফরমেশন ফাঁকি দিয়ে অতি সহজে কাবুল পর্যন্ত খবর অনায়াসে পৌঁছাতে ওদের কোন বেগ পেতে হতো না।

আলী ওদের প্রণীত পরিকল্পনায় চোখ বুলিয়ে দেখলো, এতে পাকিস্তানে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ সৃষ্টির পরিকল্পানাও রয়েছে। এ থেকেই বোঝা গেলো, ওরা পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা সৃষ্টির অন্তরালেও সক্রিয় রয়েছে।

আব্দুর রহমান চারজন মুজাহিদকে এখানে থাকতে বললো, যাতে সকালে বাড়ীটি আরো ব্যাপক তল্লাসী করে দেখা যায়, কোথাও লুকানো গোপন গোলা-বারুদ ও অস্ত্র অন্তরালে আছে কিনা।

উমর সাইয়্যাদ কয়েদীদের মুজাহিদ দফতরে পৌঁছানোর জন্য নিজের গাড়ী দিয়ে সহযোগিতা করলো। আলী উমর সাইয়াদের উদ্দেশে বললো, আপাততঃ পাক সরকারী কর্তৃপক্ষকে আমাদের অপারেশন সম্পর্কে অবহিত না করাই ভালো হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষ জেনে ফেললে, এদের ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য রাজনৈতিক চাপ আসতে পারে, তখন সকল আয়োজনই পন্ড হয়ে যাবে।

উমর সাইয়্যাদ আলীর কথার একমত হলো।

মুজাহিদ দফতরে নিয়ে সব বন্দীকে একটি কক্ষে আটকে রাখা হলো। ইত্যবসরে চা পান করতে করতে আব্দুর রহমান আলীকে বললো, গত ক'দিন যাবত আসফ খানের উপর আমার সন্দেহ হচ্ছিলো। সন্দেহকে নিরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি ওর গতিবিধি ও বাসস্থানের উপর গভীর দৃষ্টি রাখছিলাম। যে এলাকায় সে থাকে, সেখানকার এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ মুহাজিরও আসফের কর্মকান্ডে সন্দিহান ছিলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, আসফের স্ত্রী ছিলো কাবুল ইউনিভার্সিটির সাবেক ছাত্রনেত্রী। সে ছাত্রাবস্থায় কম্যুনিষ্ট সরকারের পক্ষে নেতৃত্ব দিতো। সে কাবুলে ফেরার হওয়ার খবর প্রচার করে এখানে এসে আসফকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। সে পড়া-শুনা করাকালীন সময়েই খাদের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলো। আসফকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য ছিলো মুজাহিদ হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত পৌঁছার পথ সুগম করা। আসফ একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ হওয়ার পরও ওর তৈরী ফাঁদে ফেসে যায় এবং এক সময় উচ্চ অর্থের টোপ গিলে সেও খাদের সদস্য হয়ে যায়। স্ত্রীর সুপারিশে খাদ কর্তৃপক্ষ আসফকে অফিসার পদে নিযুক্ত করে। বর্তমানে পাকিস্তানে তাদের যে কয়টি অফিস আছে, তম্মধ্যে এটি অন্যতম। আসফ,

তার স্ত্রী ও মেজর গুলখান খাদের অফিসার। তম্মধ্যে আসফের স্ত্রী খাদের প্রভাবশালী অফিসার।

কেবল সীমান্ত এলাকায়ই পঞ্চাশের বেশী এদের বেতনভুক্ত চর আছে। তা ছাড়া সারা পাকিস্তানে রয়েছে হাজার হাজার অনুচর।

লাগাতার কয়েকদিন অনুসন্ধান করার পর গ্রেফতার শেষে ওদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি ও তথ্য বের করতে আমাকে অবশ্য কঠিন পন্থাই গ্রহণ করতে হয়েছে। সাধাণতঃ 'খাদ' প্রতিপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে আমি এদের ব্যাপারে তাই প্রয়োগ করেছি। এরা যে ধরনের কঠিন শক্র এদের মুখ খোলাতেও এমন কঠিন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া গতি ছিল না আমার।

চা পান শেষে মেজর গুলখানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ কক্ষে নিয়ে আসা হলো। অনেক চেষ্টা করার পর তার মুখ খুললো এবং সে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলো। এ ভাবে প্রত্যেক বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এদের দেয়া তথ্য একটি রেজিষ্টারে রেকর্ড করা সহ সাথে সাথে টেপ করা হলো।

বন্দীরা শহর ও শহরতলীর যে সব এজেন্টের নাম প্রকাশ করছে, এদের গ্রেফতার করার জন্য কয়েকটি মুজাহিদ দল রাতেই পাঠানো হলো। অধিকাংশ অনুচরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেও কিছু সংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আর যে সব এজেন্ট শহরের বাইরে অবস্থান করে এবং সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত এদের লিষ্ট তৈরী করে পাকিস্তানী সরকারী কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

অপারেশন শেষ হওয়ার পর আলী আব্দুর রহমানকে বললো, তুমি অবশিষ্ট এজেন্টদের গ্রেফতার শেষ হলেই ওদের নিয়ে আফগানিস্তানে চলে যাবে। অন্যথায় পাক সরকারী কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটি জেনে গেলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই হেড কোয়ার্টারে পৌঁছবো।

আব্দুর রহমান প্রায় দুপুরে ঘুম থেকে উঠলো। ইতিমধ্যে আরো ডজনখানিক 'খাদ' এজেন্টকে গ্রেফতার করে মুজাহিরা নিয়ে এসেছে।

তাহেরা ও খলিল আব্দুর রহমানের বিস্ময়কর গোয়েন্দা অপারেশনে খুব খুশী হলো। খলিল আব্দুর রহমানকে বললোঃ ভাইজান! আমি বলেছিলাম না, দেখবেন আপনার সময়ও কেটে যাবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজও হবে। এখন তো আমার কথাই সত্যি হলো, সময় তো আপনার কাটলোই, বিরাট কাজও করে ফেললেন।

হ্যাঁ ভাই! এ কাজের সকল কৃতিত্ব তোমার। তুমি না বললে এ ভাবনা আমাদের মাথায় আসতো না। আব্দুর রহমান খলিলকে উৎসাহিত করার জন্য এ কথা বলে।

আসরের সময় আব্দুর রহমান তাহেরা ও তাহেরার মায়ের কাছে আফগানিস্তান ফিরে যাওয়ার কথা জানালো। হঠাৎ করে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাহেরা খুব বিচলিত ও মর্মাহত হলো। স্বভাবগত অনুরোধ জানিয়ে বললো, ভাইজান! আর কয়েকটা দিন থেকে যান।

আব্দুর রহমান তাহেরাকে এখন আফগানিস্তান যাওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনের কথা বিস্তারিত বললো। তাহেরা আর বাধা দিতে পারলো না। তবুও বললোঃ রণাঙ্গনে গিয়ে আমার কথা ভুলে যাবেন না; যখনই সুযোগ পাবেন,অমনি সোজা এখানে চলে আসবেন। আমরা আপনার সার্বিক মঙ্গল ও সফলতার জন্য সব সময় দোয়া করছি।

আসফের স্ত্রীসহ খাদ-এর গ্রেফতারকৃত সব বন্দীদের কয়েকটি সামরিক ট্রলিতে করে একদল মুজাহিদের প্রহরায় আব্দুর রহমান আফগান হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এলো।

আব্দুর রহমান, খলিল ও আলীর অপারেশনের বিবরণ শুনে চীফ কমান্ডার খুব খুশী হলেন আর তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন এবং বললেন, তোমাদের এ অপারেশন মুজাহিদদের সাফল্যের মাইলফলক হিসেবে ইতিহাস হয়ে থাকবে।

কয়েকদিন পর আলী হেডকোয়ার্টারে পৌঁছলো। চীফ কমান্ডার আলী ও আব্দুর রহমানের পরামর্শে মুজাহিদদের মধ্যে শত্রুপক্ষের অনুচর অনুপ্রবেশ রোধ ও ওদের দুস্কৃতি প্রতিরোধে তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আলী ও আব্দুর রহমান এক সপ্তাহ হেডকোয়ার্টারে কাটিয়ে নিজ ক্যাম্পে রওয়ান হলো।

নিজ ক্যাম্পে পৌঁছলে আলীকে দেখামাত্র মুজাহিদরা ফাঁকা গুলী ছুড়ে আলীর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানালো এবং নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে পুরো ক্যাম্প মুখরতি করে তুললো।

আলী সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে অফিসে গিয়ে বসলে ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার দরবেশ খান আলীকে বিগত এক মাসের কার্যক্রমের বিবরণ দিলো। আলী দরবেশ খানের কার্যক্রম শুনে অত্যন্ত খুশী হলো। আলীর সাথে প্রয়োজনীয় কথা শেষে দরবেশ খান আব্দুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, ভাই আব্দুর রহমান! আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাতে ভুলে গেছি। দু'সপ্তাহ আগে রাশিয়া থেকে যুবাইদা নামে এক তরুণী এখানে এসেছে। বললো, সে আত্মীয় সূত্রে আপনার পরিচিত এমনকি ফুফাতো বোন। আমরা তাকে মেহমানখানায় রেখেছি।

আলী ও আব্দুর রহমান যুবাইদার আগমনে চিন্তিত হলো। উভয়ে তাড়াতাড়ি মেহমানখানার দিকে পা বাড়ালো। যুবাইদা তাদের দেখে প্রথমে অত্যন্ত আনন্দিত এবং পরক্ষণেই বিমর্ষ হয়ে কাঁদতে লাগলো। আব্দুর রহমান যুবাইদার অবস্থা দেখে অমঙ্গল চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। ভাবল, অবশ্যই কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। না হয় যুবাইদা

এখানে একাকী আসার প্রশ্নই আসে না। শুধু আমার জন্য যদি যুবাইদা দেশ ত্যাগ করে চলে আসতো তবে আমাকে পেয়ে তো তার কান্নার কথা নয়।

আলী যুবাইদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, যুবাইদা! দৈর্য্য ধরো, বলো কি কারণে হঠাৎ তোমাকে একাকী এ পর্যন্ত আসতে হয়েছে?

যুবাইদা নিজেকে শান্ত করে কিছুক্ষণ পর বললো, আপনারা আসার দু'সপ্তাহ পরই মামা ও মামীকে কেজিবির গেয়েন্দারা ধরে নিয়ে গেছে। জানি না কেমন করে কেজিবি আপনাদের সম্পর্কে জানতে পারলো।

দু' সপ্তাহ পর্যন্ত মামা মামীর সাথে কাউকে দেখা করতে দেয়নি। দু' সপ্তাহ পর্যন্ত জানার উপায় ছিলোনা যে, তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে। অনেক সুপারিশ ও টাকা খরচ করার পর আব্বু দু'সপ্তাহ পর তাদের অবস্থান জানতে পারেন।

আমি যখন জেলখানায় তাদের দেখতে যাই তখন দেখেছি অত্যাচার ও নির্যাতনে তাদের শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। মামার ডান হাতের হাড় ওরা ভেঙ্গে ফেলেছে। তাদের ওপর এমন জুলুম-অত্যাচার করেছে যে, প্রথমে মামাকে আমি চিনতেই পারিনি। মামার সাথে বেশী কথা বলতে ওরা আমাকে সুযোগ দেয়নি। মামা কঠোর পাহারাদারীর মধ্যেও আমার কানে কানে কললেন, মা! তুমি আব্দুর রহমানের কাছে চলে যাও, এখানে তোমার ভবিষ্যত নিরাপদ নয়। মা! এই কেজিবি বন্য জানোয়ারের চেয়েও বেশী হিংস্র, অসভ্য। আমি মোটেও ভাবতে পারি না যে, ওদের নাপাক অত্যাচারের হাত তোমার অমলীন শরীর স্পর্শ করুক।

শেষে মামা বললেন, তুমি আগামী পরশু আবার আসবে, আমি তোমাকে আফগানিস্তানে পৌঁছার গাইড লাইন জানিয়ে দেবো।

একদিন পর তিন চারজন কম্যুনিষ্ট নেতার সুপারিশে আমি মামার সাথে আবার সাক্ষাত করতে গেলাম। কড়া প্রহরা ও নজরদারীর ফলে মামা আমার সাথে ফ্রি কথা বলার সুযোগ পেলেন না। মামা শুধু আমার কানে কানে বললেন, মা তুমি আফগানিস্তান গিয়ে আব্দুর রহমানকে আমাদের শুভাশীষ জানিও এবং বলো আমাদের গ্রেফতারী অথবা শাহাদাতে যেন ও অশ্রু না ফেলে। বরং সে তার অর্পিত দায়িত্ব এবং জিহাদী মিশন যেন অব্যাহত রাখে। বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

এরপর মামা আমার কানে কানে একটি ফোন নাম্বার জানালেন। বললেন, এই নম্বরে মাহমুদ বুখারীর সাথে যোগাযোগ করবে। মাহমুদ বুখারীকে বলবে, তোমাকে আইয়ুব বুখারী ও ইসরাইল সমরকন্দীর কাছে পৌঁছে দিতে। ইসমাইল সমরকন্দীকে বলবে, তিনি যেন আফগানিস্তানে আহমদ গুল খানের কাছে তোমাকে পৌঁছিয়ে দেন।

আমি মামার দেয়া ফোন নম্বর ও নামগুলো মুখস্ত করে নিলাম এবং কারাগার থেকে বেরিয়ে নিরাপদ জায়গায় এসে সাংকেতিকভাবে ফোন নম্বর ও নামগুলো নোট করে

নিলাম। অতঃপর এদিনই আমার এক বিশ্বস্ত বান্ধবীর ঘর থেকে মাহমুদ বুখারীকে ফোন করলাম এবং টাউন পার্কে বিকেলে মিলিত হওয়ার সময় নির্দ্ধারণ করলাম।

সাক্ষাতে আমি মাহমুদ বুখারীকে পরিস্তিতি জানালাম। তিনি বললেন, আমার জানামতে কেজিবি তোমাদের পরিবারের পিছনেও লেগেছে। ওরা তোমাদের প্রতি নজর রাখছে, যে কোন সময় তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। কাজেই আগামী কাল তুমি আমাকে ফোন করো না, অবস্থা স্বাভাবিক মনে হলে আমিই তোমার সাথে যোগাযোগ করবো।

এক সপ্তাহ পর একটি ছোট্ট বালক একটি প্যাকেট নিয়ে আমাদের বাড়ী এলো। প্যাকেটটি পোস্ট অফিস হয়ে আসেনি দেখে আমার সন্দেহ হলো। আমি আমার কক্ষে নিয়ে প্যাকেটটি খুললাম। দেখলাম, প্যাকেটে এক সেট নতুন কোর্ট-প্যান্ট। আর একটি চিরকুটে লেখা, 'আগামী কাল সকাল সাতটায় সিটি হোটেলের কাছে'।

গভীর রাত পর্যন্ত আব্বা-আম্মার সাথে আমি কথা বলছিলাম। কথায় কথায় আমি আব্বাকে বললাম, শুনলাম কেজিবি নাকি আমাদের গতিবিধি সেন্সর করছে আব্বু? যুবায়দার আব্বু বিচলিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এ কথা তোমাকে কে বললো?

বললাম, আমাকে যেই বলুক আপনি বলুন কথাটি ঠিক নয় কি?

বেটী! তথ্য নির্ভুল। কেজিবির সন্দেহ আব্দুর রহমান এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুমি জানো। আব্বার কথায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে ওরা আমাকে গ্রেফতার করছে না কেন?

'বেটী! তোমাকে গ্রেফতার করার পথ বন্ধ করার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করেছি, কিন্তু মা! কেজিবি এমন ধূর্ত যে, ওরা আমাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছে। বেটী! রাশিয়ায় বসবাস করা বিষাক্ত সাপের সাথে বসবাস করার মতো। সাপকে যতো সেবা যত্নই করো না কেন, সুযোগ পেলে সে ঠিকই ছোবল মারবে। আমার নিজের জীবন নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই, বেটী! তোমার নিরাপত্তা নিয়েই আমার যতো ভাবনা। কখন ওরা তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, জানা নেই। আমি তোমার কোন ভবিষ্যৎ অমংগলের কথা ভাবতে পারি না।

আব্দুর রহমান যখন এসেছিলো তোমাদের উচিত ছিলো আমাকে অবগত করানো, তাহলে আমি তোমাকে আব্দুর রহমানের সাথে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তোমরা কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে পারোনি। আমি কম্যুনিষ্ট বটে, তবে তোমার আর আব্দুর রহমানের শত্রু নই। তোমরা আমাকে অবিশ্বাস না করলে আজ তোমার মামা-মামীর এ দুরবস্থা হতো না। মুজাহিদদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে তাদের কারাগারের অন্ধ কুটিরে যেতে হতো না।

আমার ভাইয়ের না হয় ভুল হয়ে গেছে কিন্তু এখন আমার মেয়ের জীবন বাঁচাতে তো একটা কিছু করবে? উদ্বেগের স্বরে বললো জুবায়দার মা।

জুবায়দার আব্বু হতাশা ব্যক্ত করে বললেন, 'খুবই কঠিন কাজ। আমি সম্ভাব্য সকল চেষ্টাই করেছি। জানো, রাশিয়ায় নামমাত্র মুসলমান হওয়াও অমার্জনীয় অপরাধ। তাছাড়া রুশ সরকার কোন তুর্কিকে বিশ্বাস করে না। তুর্কীদের সামান্য ত্রুটিও ওরা রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা হিসেবে চিহ্নিত করে। রুশরা মনে করে, তুর্কীদের আচরণে মুসলমানদের মধ্যে সরকার বিরোধী ক্ষোভ বাড়ছে এবং যে কোন সময় মুসলমানরা রাশিয়ায় আফগানীদের মতো আযাজীর জিহাদ শুরু করতে পারে।

আমি বললাম, আব্বু, যদি রাশিয়ার অভ্যন্তরে জিহাদ শুরু হয়ে যায় তবে আপনি কাদের পক্ষাবলম্বন করবেন, রুশ কম্যুনিষ্টদের না মুজাহিদদের? তিনি বললেন, বেটী স্বাধীন দেশের কোন বিকল্প নেই। আজ আমরা স্বাধীন থাকলে তোমার মামা-মামীর এ করুণ অবস্থা হতো কি?

জীবনভর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পক্ষে খাটলাম, শেষ ভাগে শুধু সরকারের কাছে একটি মাত্র আর্জী করলাম আর তখনই আমাকে বলা হলো যে, মনে হয় তুমিও মুজাহিদদের পক্ষে! যদি স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, মনে হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ অনতি বিলম্বেই শুরু হবে, তবে অবশ্যই আমি মুজাহিদদের পক্ষে কাজ করবো। এটাই আমার বাকী জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার।

আম্মু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, তোমরা কি শুধু গল্প করেই সময় নষ্ট করবে। মেয়ের জীবন বাঁচাতে কি করছো, তা বলো।

আমার পক্ষে যা সম্ভব ছিলো তা আমি করেছি। এখন একটাই পথ আছে, যুবাইদা কোনভাবে দেশের বাইরে চলে যাবে। এ চেষ্টাও আমি করেছি, কিন্তু ওকে বাইরে কোনো দেশের ভিসা দেয়া হবে না। অত্যন্ত অনুতাপের স্বরে বললেন আব্বু।

আব্বুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আম্মু বললেন, তাহলে তুমি যুবাইদাকে আব্দুর রহমানের কাছে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দাওনা কেন?

মুজাহিদদের সাথে আমার কোন ধরনের যোগাযোগ থাকলে আমি নির্দ্বিধায় মেয়েকে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দিতাম। এ বলে আব্বু আমাকে গলায় জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কান্না-জড়িত কণ্ঠে বললেন, মা তুই জানিস না, আমি যে তোকে কতো স্নেহ করি। তুই নিজেও জানিস না যে কত বড় মুসিবতে ফেঁসে গেছিস।

আমি বললাম, আব্বু। আমি নিজ চেষ্টায় যদি আফগানিস্তান চলে যাই তবে আপনারা নাখোশ হবেন না তো?

বেটী! আব্দুর রহমান যদি তোমাকে আফগানিস্তান যাওয়ার জন্যে গাইড লাইন বলে গিয়ে থাকে, তাহলে যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও। বেটী! বলো, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে কি সহযোগিতা করতে পারি। তোমার নিরাপত্তার জন্যে আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।

'আপনাদের কিছুই করতে হবে না। আমি শুধু আপনাদের দোয়া চাই। আমি নিজেই যাবার সব ব্যবস্থা করতে পারবো।

আব্বু, আমি আগামীকাল সকালেই রওয়ানা হচ্ছি।

এ কথা শুনে আব্বু ও আম্মু উভয়ে স্বগতচিত্তে বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোমার অশেষ শুকরিয়া।

আমি বললাম, আব্বু! আপনি না কম্যুনিষ্ট, কিভাবে আল্লাহকে শুকরিয়া জনালেন'?

আব্বু বললেন, বেটী! জানো না গত তিন সপ্তাহ যাবত আমি যে কী নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি, তুমি আমার কাছে নিজ জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয়। এ পর্যন্ত প্রাণান্তকর চেষ্টা করে আমি তোমাকে কেজিবির গ্রেফতারী থেকে বাঁচিয়ে ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি কেজিবি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সরাসরি নির্দেশ নিয়ে এসেছে তোমাকে গ্রেফতারের জন্যে। তোমার গ্রেফতারীর কথা ভাবলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। তোমাকে বাঁচানোর সম্ভাব্য সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে সেদিন ঘুমুচ্ছিলাম। ঘুমে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলাম যে, তোমাকে একদল হিংস্র কুকুর আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করছে। এ দৃশ্য দেখে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে রাতে আমি প্রথম আল্লাহর কাছে করজোর প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! যদি তোমার অস্তিত্ব সত্য হয়ে থাকে, তবে যে করেই হোক তুমি আমার মেয়েকে রক্ষা করো। আজ থেকে আমি ওয়াদা করছি, মেয়ে যদি জীবনে রক্ষা পায় বাকী জীবন আমি তোমার অনুগত বান্দার মত ইসলামের সকল নির্দেশ মেনে চলবো।

মুনাজাত করে আবার আমি শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম, বিশাল এক বাঘ এসেছে, আর বাঘ দেখে তোমাকে আক্রমণকারী হিংস্র কুকুরগুলো দ্রুত পালিয়ে গেলো। তখন তুমি একটি সুন্দর বাগানে আড়াল হয়ে গেলে। এরপর আমি মনে একটু প্রশান্তি পেলাম। আমি নিশ্চিত, আব্দুর রহমানের কাছে তুমি চলে যেতে পারবে। মা! আল্লাহ যেন সব সময় তোমাকে সুখে রাখেন। তুমি সুখে থাকলেই আমরা সুখী হবো'।

আমার চলে আসার কথা শুনে আম্মু কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আব্বু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এখন কান্নার সময় নয়; বরং তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, যিনি তোমার আদুরে মেয়ের ইজ্জত বাঁচানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তুমি ভেঙ্গে পড়লে মেয়েটি সাহস হারিয়ে ফেলবে। ওকে সাহস দেয়া দরকার। যাত্রা খুবই কঠিন এবং বিপদসংকুল।

আব্বু আম্মুকে বললেনঃ আমার মনে হয়, আব্দুর রহমানের জিহাদ এবং ওর বাবা মার ত্যাগের কারণেই যুবায়দার প্রাণ বাঁচানোর একটা ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহর

রহমত পাওয়ার যোগ্য তো আমরা নেই। এখন কান্না থামাও। শান্ত মনে মেয়েকে বিদায় দাও। ওর মঙ্গলের জন্য দু'আ করো।

গভীর রাত পর্যন্ত কথা বলার পর আমরা সবাই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আম্মার সাথেই ঘুমাতে চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু বিন্দুমাত্র ঘুম হলো না। আফগানিস্তান যাওয়ার আনন্দ উত্তেজনা আর আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে আসার কষ্ট আমাকে অস্থির করে তুললো।

আব্বা-আম্মার অবস্থাও ছিলো তাই। শেষ রাতে দেখি, আব্বু বিছানা ছেড়ে মেঝেয় একটা চাটাই বিছিয়ে সেজদায় পড়ে অঝোরে কাঁদছেন। আম্মুও আব্বুর পাশে বসে দু'হাত তুলে মোনাজাত করছেন। তার গন্ডদ্বয় বেয়ে অশ্রুতে বুক ভিজে গেছে। সেদিনই আমি প্রথম অনুভব করলাম, আব্বা-আম্মা আমাকে কতো ভালোবাসেন। আরো বুঝতে পারলাম, প্রকৃত অর্থে তারা নাস্তিক ছিলেন না। রুশ সরকারের নির্যাতনের ভয়েই তারা নাস্তিকতার ভান করতেন মাত্র।

পাঁচটার আগেই আমি বিছানা ছেড়ে আমার কক্ষে গিয়ে সফরের প্রস্তুতি নিলাম। আব্বা আম্মা আমার ঘরে এলেন। আমাকে পুরুষের বেশে দেখে আব্বা-আম্মা চিনতেই পারছিলেন না। ছদ্মবেশ ধারণের কৌশলটি তাদের বললে উভয়ে খুব বিস্মিত হলেন। আসার আগে আমি আপনার উপহার দেয়া কুরআন শরীফটি আব্বুকে দিলাম।

আব্বু আমার হাত থেকে কুরআন শরীফটি হাতে নিয়ে চুমু দিলেন, কপালে চোখে মুখে লাগালেন। স্বগত স্বরে বললেন, হায় আফসোস! আমরা যদি কম্যুনিজমের পিছনে জীবন বিসর্জন না দিয়ে এ পবিত্র কিতাব অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজকের এ অবস্থা হতো না। আসার আগে আলী ভাই আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলেছিলেন সব আব্বা-আম্মাকে বললাম। তাঁরা এতে উৎসাহ বোধ করলেন এবং আমার সিদ্ধান্তের জন্য খুশী হলেন।

সকাল সাড়ে ছ'টার সময় ঘর থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা। সাড়ে ছ'টার সময় অবিকল আমার মতো চেহারা এবং একই পোশাক পরে একটা ছেলে আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরে ঢুকেই সে একটি চাবি দিয়ে বললো, আপনার সময় হয়ে গেছে। ছেলেটি আরো বললোঃ আপনার মতো একই পোষাক পরে এ জন্য এসেছি, যাতে কেউ মনে না করতে পারে যে, আপনি বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন।

আপনাদের বাড়ীর পিছনের রাস্তায় নীল রংয়ের গাড়িটিই আপনার। এটিই আমু দরিয়া পর্যন্ত আপনার বাহন।

আমু দরিয়ার কথা শুনে আব্বু বললেন, আমু দরিয়ার তীরেই আমার এক বন্ধুর বাড়ী, তার নাম ইসমাঈল সমরকন্দী। আবার আব্বু স্বগতোক্তি করলেনঃ অবশ্য বিপদে কোন

বন্ধু কাজে আসে না। ঠিক আছে তুমি নিজের মতো করেই যাও। এমনও তো হতে পারে যে, সে তোমার জন্য বিপদ ডেকে আনবে।

আমি আব্বুকে বললাম, ইসমাঈল সমরকান্দী সাহেবই আমাকে আমু দরিয়া পার হওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

আমার কথা শুনে আব্বু একটি সোনার হার আমার হাতে দিয়ে বললেন, ইসমাঈল খুব স্বার্থপর মানুষ। তুমি এটা তাকে দিয়ে বলো, আমার পক্ষ থেকে তাকে উপহার দিয়েছি। আর একটি চিরকুট লিখে দিলেন। চিরকুটে আব্বু লিখলেন-

"প্রিয় বন্ধু,

এই প্রথম আমি তোমার কাছে একটা আবেদন করছি। আশা করি নিরাশ করবে না। আমার কলিজার টুকরো মেয়েটিকে সযত্নে গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। তোমার এই অনুগ্রহ জীবনে কখনও বিস্মৃত হবো না।'

রওয়ানা হওয়ার জন্য আমি ঘড়ি দেখলাম। আব্বু আদর ও স্নেহমাখা অশ্রু ঝরিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। আম্মুকে বিদায়ের কথা বলতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেনঃ মা, আজকের এ বিদায়কেই মনে করো বিয়ের বিদায়। আব্বু বহু কষ্টে আম্মুকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। আমি শেষবারের মতো আব্বু-আম্মুকে চুমু খেয়ে বেরিয়ে এলাম। আমারো দু'চোখ ভিজে যাচ্ছিলো। কোন মতেই অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না।

গাড়ী সিটি হোটেলের সামনে দাঁড়াতেই দু'জন লোক এগিয়ে এসে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই গাড়ীতে উঠে বসলো এবং আমার সাথে হ্যান্ডশেক করে একটি নোট দিলো। নোটটিতে লিখা, "এ দু'জন তোমার সফরসঙ্গী। ওরা তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে আইয়ুব বোখারীর কাছে চলে যাবে। তুমি নিঃসন্দেহে এদের সাথে চলে যাও।"

-আইয়ুব বুখারী

আমি নিঃসংকোচে ড্রাইভিং করতে লাগলাম। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি কয়েক মাইল নিয়ে এসেছি। একজন বললেন, "বোন যুবাইদা! তুমি পিছনের সীটে একটু আরাম করো। এখন থেকে আমরা পালাক্রমে গাড়ি চালাবো। রাস্তায় কোন লোক কিছু জিজ্ঞেস করলে বোবার অভিনয় করবে। কথা বললে তারা প্রথমবারেই বুঝে যাবে যে তুমি মহিলা। তাতে সমস্যা হবে। কারণ, তোমার রোডপার্মিট সহ যাবতীয় পরিচয়পত্র পুরুষের নামে। পথে দু' তিনবার কাগজপত্র পুলিশ চেক করেছে। কিন্তু সবকিছু এতো নিখুঁত ও

উভয় সাথীই এত হুঁশিয়ার ছিলেন যে, কেউ আমার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ পেলো না।

বেলা ডোবার আগেই আমরা ইসমাঈল সরমকন্দীর বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। ইসমাঈল সমরকন্দীর কাছে পৌঁছে আমার পরিচয় দিলাম। আপনার কথা উল্লেখ করলাম এবং আহমদ গুলখানের ওখানে পৌঁছে দেয়ার কথা জানালাম।

আমি আব্বুর দেয়া চিরকুট ও হারটি তাকে দিলাম। চিরকুট পড়ে হারটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সমরকন্দী বললেনঃ 'তোমার আব্বা মনে করেছেন, এখনও আমি আগের মতই স্বার্থপর রয়ে গেছি। হ্যাঁ, এক সময় আমি স্বার্থপর ছিলাম বটে, তবে মুজাহিদদের তোমরা যেমন ভালোবাসো, আমিও প্রাণাধিক ভালোবাসি।'

তোমার বাবা এ হার উপহার দেননি, দিয়েছেন আমাকে ঘুষ হিসেবে, আমার অতীতের চরিত্রের উপর ভিত্তি করে। তোমার বাবা হয়তো জানেন না যে, স্মাগলারদেরও একটা নীতি আছে। আমরা আমাদের সুহৃদের উপকারে অনায়াসে নিজেদের জীবন দিয়ে দিতে পারি। যুবায়দা! তুমি তোমার বাবার কাছে যেমন আদরের কন্যা, আমার দৃষ্টিতেও তুমি কন্যার মতো। বেটী! তুমি জাহান্নাম থেকে পালিয়ে মুজাহিদদের আশ্রয়ে জান্নাতের পথে যাত্রা করেছো। জীবনে পুণ্যকাজ খুব কমই করার সৌভাগ্য হয়েছে। আল্লাহ এবার একটু নেক কাজ করার সুযোগ দিলেন, আর সেটিও তুমি ছিনিয়ে নিতে চাও? বেটী! এ হার তোমার গলায় খুব মানাবে। তুমি এটি রেখে দাও।

যুবায়দা ! যেদিন আফগানীরা রুশ আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে গর্জে উঠলো; পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক বললেন, রাশিয়া সমরকন্দ-বুখারাকেও অন্যায়ভাবে দখল করেছিলো; সেদিন থেকেই আমাদের মনের গহীনে আযাদীর আগুন জ্বলছে, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে একটা কিছু করার জন্য মনটা সব সময়ই সুযোগ খুঁজে ফিরছে। আফগান জিহাদের শুরু থেকে যথাসম্ভব সাহায্য করছি। আশা করি, এ পথ ধরে আমাদের স্বাধীনতাও আমরা ফিরে পাবো।

পর দিন আমার সফরসঙ্গী দু' মুজাহিদ বিদায় নিয়ে আইয়ুব বুখারীর ক্যাম্পে রওয়ানা হলো। তারা যাওয়ার সময় বললোঃ বোন যুবায়দা! তুমি সার্থক মুজাহিদদের দেশে যাচ্ছো। যারা একমাত্র ঈমানী শক্তিতে আগ্রাসী রাশিয়াকে পরাস্ত করছে। তুমি তাদেরকে আমাদের অভিনন্দন ও সালাম জানিও। আর বলো, আমরাও তুর্কিস্তানে তাদের মতো জিহাদের সূচনা করছি, ইনশাআল্লাহ-অনতিবিলম্বে তুর্কিস্তান তাদের স্বাগত জানাবে।

আমি দু'দিন ইসমাঈল সমরকান্দীর বাড়ী থাকলাম। তার এক মেয়ে আছে আমার মতো। মেয়েটি মুজাহিদদের সম্পর্কে জানে এবং জিহাদী তৎপরতাকে ভালোবাসে। আমি একদিন তাকে বললাম, তোমরা তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলে, তখন সে খুব আফসোস করলো। বললোঃ দুঃখিত, আমি জানতে পারিনি। যদি আব্বু মুজাহিদ আগমনের কথা জানাতেন, তবে আমি তাদের দেখে ভাগ্যবান হতাম, তাদের দু'আ নিতে পারতাম।

মেয়েটি আমাকে বললোঃ 'বোন! তুমি আফগানিস্তান পৌঁছে তাদের বলো, রাশিয়ায় তোমাদের সুহৃদ-বোনেরা তোমাদের জিহাদী তৎপরতা এবং অব্যাহত বিজয়ে অত্যন্ত আশাবাদী, তারা তোমাদের আত্মদানে গর্ববোধ করে। তোমাদের বিজয় সংবাদে তাদের মন খুশীতে নেচে উঠে, তোমাদের কোন দুর্ঘটনায় তাদের অশ্রু ঝরে, দুঃখ যন্ত্রণায় মন কেঁদে উঠে। আর তোমাদের সুসংবাদে তারা আল্লাহর কুদরাতি পায়ে সিজদা দিয়ে শুকরিয়া জানায়।'

মেয়েটি অনুরোধের স্বরে বললো, বোন! তুমি আব্দুর রহমান ভাইকে বলবে, তুর্কিস্তানের অসংখ্য বোন তোমাদের মতো বিজয়ী মুজাহিদদের অভ্যর্থনা জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আর মোনাজাত করছে সেই সোনালী দিনের, যে দিন তোমরা রাশিয়ার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে মুসলিম মা-বোনদের ঈমান-ইজ্জত সুরক্ষার জিহাদে বিজয়ী হবে।

বিদায়ের সময় ইসমাঈল সমরকন্দী ও তার মেয়ে আমাকে অনেকগুলো দামী উপঢৌকন দিলো। ইসমাঈল সমরকন্দী বিদায় বেলা বললেনঃ 'বেটী! তুমি আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কন্যা এবং এক মুজাহিদের পবিত্র আমানত। আমার ইচ্ছে হয় ঘরের সব সম্পদ তোমাকে উপহার দিতে। তুমি এমন এক যুবক কাফেলার কাছে যাচ্ছো, যারা রাশিয়ার ঘুমিয়ে পড়া মুসলিম চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। এ সামান্য উপহারগুলো গ্রহণ করো আর এ টাকাগুলো মুজাহিদদের দিও। আর তাদের বলো, তারা যেন আমার হেদায়েতের ও মাগফিরাতের জন্য দু'আ করে। আর হ্যাঁ, আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, ক'দিনের মধ্যেই আমি শায়রাবাদ যাবো। যদি তোমার মামা মামী জেল থেকে ছাড়া পান, তবে তাদের এখানে এনে দরিয়া পার করে আফগানিস্তান পাঠিয়ে দেবো।

আমু দরিয়া পার হওয়ার পর আমি আহমদ গুলখানের বাড়ীতে এক সপ্তাহ ছিলাম। গুলখানও নিজ কন্যার মতোই আমাকে যত্ন করলেন। তিনিই আমাকে কমান্ডার যবানগুল খানের ক্যাম্পে পৌঁছে দিলেন। এরপর দু'সপ্তাহ আগে তাদের সহায়তায় এখানে পৌঁছলাম। পথে পথে আফগানিস্তানের যেখানেই অবস্থান করেছি, বয়স্করা আমাকে মেয়ের মতো মমতা আর যুবক-তরুণরা বোনের মতো স্নেহ-মসীহ দৃষ্টিতে নজর নীচু করে নিয়েছে।

আলী ও আব্দুর রহমান সব ঘটনা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলো, বিষাদে ভরে উঠলো তাদের হৃদয়মন–যখন জানতে পারলো যে, যুবায়দার মামা-মামীর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছে। আব্দুর রহমান তো মা-বাবার করুণ অবস্থার কথা শুনে কেঁদেই ফেললো।

আলী তড়িৎ নিজেকে সামলিয়ে আব্দুর রহমানকে সান্ত্বনা দিয়ে বললোঃ ভাই, জিহাদের ময়দানে এ ধরনের কঠোর অনুভূতির শিকার প্রতিদিনই মুজাহিদরা হয়ে থাকে,

আরো কঠিন খরব শুনতে হয়, সবুর করো ....ধৈর্য্য ধরো। মা-বাবা এবং ফুফার জন্য দু'আ করো। আল্লাহ যেন তাদের কঠিন পরীক্ষায় সফল করে উত্তম পুরুস্কারে ভূষিত করেন।

এরপর বেশ ক'দিন কেটে গেলো। যুবায়দা আলীর ক্যাম্পের মেহমানখানায় দিন যাপন করতে লাগলো। পরিস্থিতি বিবেচনা করে আলী একদিন যুবায়দা ও আব্দুর রহমানের বিয়ে পর্ব সম্পাদন করালো। এ অনাড়ম্বর বিয়ে অনুষ্ঠানে নেতৃস্থানীয় বহু মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের পর যুবাইদা ও আব্দুর রহমানের আবাসনের বিষয়টি সামনে এসে গেলো। তাৎক্ষণিকভাবে যুবাইদাকে পাকিস্তানে পাঠানো সম্ভব ছিলো না। আলী একটু ভেবে-চিন্তে ঠিক করলো, ক্যাম্পের অদূরে কোন গ্রামের বাড়ীতে যুবাইদার জন্য সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থা করবে। হেডকোয়ার্টারে চীফ কমান্ডারের সাথে যোগযোগ করলে, চীফ বললেনঃ 'আপাতত নিকটবর্তী কোন গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করো। মাত্র এদের বিয়ে হয়েছে। আব্দুর রহমানের সংস্পর্শে থাকুক, পরে সুবিধামতো সময়ে পকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া যাবে।'

'পাকিস্তানে ঘাঁপটি মেরে থাকা কেজিবি যদি জানতে পারে, তাহলে রুশ সরকার পাক সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে এদের রাশিয়া ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।' আলী চীফ কমান্ডারের কাছে এ আশংকা ব্যক্ত করলো।

চীফ কমান্ডার বললো, তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। সময় মতো আমি পাক সরকারের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে নেবো। কোন আশংকা দেখা দিলে তক্ষুণি আমি যুবাইদাকে আফগানিস্তান ফিরিয়ে আনবো। এছাড়া বিকল্প একটা ব্যবস্থার কথাও আমি ভাবছি।

আলী কমান্ডারকে বললেন, বিকল্প ব্যবস্থাটার কথা জানতে পারি কি?

চীফ কমান্ডার বললো, যুবায়দা ও আব্দুর রহমান যদি হেডকোয়ার্টারে আসতে রাজী হয়, তাহলে কাছেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবো। আব্দুর রহমান ও যুবায়দা মিলে রুশ ভাষায় ইসলামী লিটারেচার তৈরীর কাজ তদারকী করবে, আর আমাদের রেডিও বহিঃসম্প্রচারে রুশ ভাষায় রাশিয়ান মেয়েদের জন্য উপযোগী অনুষ্ঠান-কথিকা প্রচার করবে। চীফ কমান্ডারের এ প্রস্তাবে আলী বললো, উত্তম ধারণা, চমৎকার পরিকল্পনা আপনার।

চীফ বললেনঃ ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, আমিও ভাবছি। তবে অন্ততঃ তিন চার মাস তোমার ক্যাম্পের ধারে কাছেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

আলী ক্যাম্পের কাছেই পাহাড়ের পাদদেশে বাংকার করে ওখানে যুবাইদা-আব্দুর রহমানকে থাকতে বললো। জায়গাটি চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করা হলো।

ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হলো। নিরাপত্তা ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক যুবাইদার ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হলো।

মুজাহিদ ও রুশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেনেভা চুক্তি হলো। রাশিয়া যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিলো এবং আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলো।

ইতোমধ্যে রাশিয়া সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করেছে। পলায়নপর হানাদার বাহিনীর উপর মুজাহিদরা কয়েকটি সফল অপারেশন করে প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করলো। কিন্তু চীফ কমান্ডারের অনুরোধে পলায়নপর রুশ সৈন্যদের উপর মুজাহিদরা আর কোন হামলা না করার সিদ্ধান্ত নিলো।

তখন জুন মাস। রাত ন'টা। কাবুল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো থেকে ওয়ারলেস এলো। কাবুল ব্যুরো চীফ বললো;

এই মাত্র আমি জানতে পারলাম, রাশিয়া থেকে দশজন শীর্ষ কেজিবি অফিসার কাবুল এসেছে। ভারত থেকে প্রায় কুড়িজনের মতো 'র'এর সিনিয়র অফিসার এসেছে এবং ইসরাইলের ডেপুটি গোয়েন্দা প্রধানও কাবুল পৌঁছছে। অনুরূপ আরো কয়েকটি কম্যুনিষ্ট দেশের বড় বড় গোয়েন্দা অফিসাররা এখন কাবুলে সমবেত হয়েছে। ওদের তৎপরতা লক্ষ্য করছি। নতুন কোন খবর পেলে তখনি জানাবো।

আলী ও আব্দুর রহমান বিস্মিত হলো। যখন রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করেছে, সে সময় ভয়ংকর সব গোয়েন্দা প্রধানদের কাবুল সমবেত হওয়ার রহস্য কি?

আব্দুর রহমান ভাবছিলোঃ রাশিয়া হয়তো নতুন করে আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণের পায়তারা করছে। নতুন কৌশল বের করার জন্যই হয়তো এরা কাবুল এসেছে।

কিন্তু আলী ভাবছিলোঃ গোয়েন্দা প্রধানরা সৈন্য প্রত্যাহারের পাশাপাশি আফগানিস্তানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিকল্পনা করছে কিংবা মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে বিভেদ-ভাঙ্গন সৃষ্টি করে আত্মঘাতি যুদ্ধে জড়াতে চাইছে। অথবা ভারত আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণের সুযোগ খুঁজছে।

ষড়যন্ত্র যাই হোক, আমরা বিজয় নস্যাত হতে কখনও দেবো না। ভারত যদি সৈন্য প্রেরণ করে, তবে ওদের এমন শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব যে, কিয়ামত পর্যন্ত ওদের আগত প্রজন্ম আগ্রাসনের পরিণতি স্মরণ রাখবে। দৃঢ়প্রত্যয়ের স্বরে আব্দুর রহমান বললো।

দু'দিন পর আবার কাবুল থেকে ওয়ারলেস ম্যসেজ এলোঃ গোয়েন্দা প্রধানদের মিটিংয়ে ড. নজিবুল্লাহ নিজেও উপস্থিত ছিলো। 'র' প্রধান, কেজিবির ডেপুটি ডিরেক্টর ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট বলয়ের শীর্ষ গোয়েন্দা মিটিং-এর সিদ্ধান্ত কি হয়েছে, তা বিস্তারিত এখনও জানতে পারিনি। শুধু এতটুকু জানতে পেরেছি, ওরা ভয়াবহ অপারেশনের পরিকল্পনা করছে।

আলী চীফ কমান্ডারের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললো। চীফ বললেন, এরা হয়তো ভারতের সৈন্য নামাতে চাইছে, না হয় মুজাহিদ লিডারদের হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটছে। চীফ কমান্ডার আলীকে আশ্বস্ত করেন বললেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই আলী! দশ বছর আল্লাহ আমাদের শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সাহায্য করেছেন। আগামীতেও করবেন ইনশাআল্লাহ। দেখবে, শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র ভন্ডুল হয়ে যাবে।

আলীর আঞ্চলিক প্রাদেশিকও রাজধানীর রুশক্যাম্প আক্রমণের ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু চীফ কমান্ডার তাতে সায় দিলো না। বললোঃ আলী! ওদের যেতে দাও, পালানোর পথে আক্রমণ করার দরকার নেই। বরং যে সব মুজাহিদ শুধু গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছে, ওদের তুমি আর্টিলারী ট্রেনিং দিতে শুরু করো। ক্যাম্পে যেসব আফগান সরকারী আর্মী অফিসার আছে, ওদেরকে বুঝিয়ে ট্রেনিং-এ লাগিয়ে দাও। আর সরকারী সেনা ছাউনীগুলোর কমান্ডারদের পয়গাম পাঠাও, ওরা যেন মুজাহিদদের বিজয় মেনে নেয়। তাতে রক্তপাত হ্রাস পাবে এবং সহজেই শহরগুলোতে মুজাহিদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সর্বোপরি উর্দ্ধতন মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ কি সিদ্ধান্ত নেন তার অপেক্ষা করো। ভাবাবেগে কিছু করা এ মুহূর্তে ঠিক হবে না। চীফ কমান্ডারের পরামর্শ আলীর খুব পছন্দ হলো। আলী কমান্ডারের নির্দেশ বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করলো। ক্যাম্পে অবস্থানরত সকল মুজাহিদকে আর্টিলারী ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করলো। আলীর ক্যাম্পে আটক নজিবুল্লাহ সরকারের চার আর্মি অফিসার-কর্ণেল আফজল খান, ক্যাপ্টেন জামাল মুহাম্মদ ও মেজর উমর খানকে দায়িত্ব দিলো, মুজাহিদদের নিয়মিত সামরিক কোর্সের টেনিং দিতে।

আলী নজিবুল্লাহর অনুগত সেনা ছাউনীগুলোতে পয়গাম পাঠালো, তোমরা যদি মুজাহিদদের বিজয় মেনে নিয়ে আমাদের সহযোগিতা করো, তবে তোমাদের বর্তমান পদ-মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার পরও মুজাহিদ সরকারে তোমাদের আরো সম্মান ও পদোন্নতি দেয়া হবে।

১৫ আগস্ট কাবুল থেকে খবর এলো যে, গত জুন মাসে র, কেজিবি, মোসাদ ও খাদ গোয়েন্দা প্রধানদের যে বৈঠক হয়েছিলো, অনুরূপ আরো ক'টি বৈঠক গত ১২ আগস্ট কাবুলে হয়েছে। জানা গেছে, গত জুনের বৈঠকে যে ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়েছে, তার নাম দেয়া হয়েছে 'জেড অপারেশন।' নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম, পরিকল্পিত 'জেড অপারেশনে'র সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

আলী ভেবে পাচ্ছিলো না, জেড অপারেশনের কী অর্থ হতে পারে? আলী পাশে বসা মুহাম্মদুল ইসলাম ও আব্দুর রহমানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো।

আব্দুর রহমান বললো, 'জেড' অর্থ জুলফিকার হতে পারে। কেজিবি সৃষ্ট জুলফিকার নামের একটি দুস্কৃতিকারী দল পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। কেজিবি, র ও খাদ-এর সহায়তায় এরা অপকান্ডে লিপ্ত। সম্ভবতঃ পাকিস্তানে কোন ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞ পরিকল্পনা ওরা 'জেড অপারেশনের' নামে জুলফিকার নামক দুস্কৃতিকারী দলের হাতে ন্যস্ত করেছে।

মুহাম্মদুল ইসলাম বললোঃ 'জেড' ইংরেজী বর্ণমালার সর্বশেষ অক্ষর। হতে পারে যে, 'জেড' দিয়ে ওরা সর্বশেষ অপারেশনের কথা বুঝাচ্ছে অথবা এমনও হতে পারে যে, 'জেড' দিয়ে ওরা সর্বশেষ টার্গেটকে চিহ্নিত করেছে।

আলী বললো, এ জেড অর্থ জিয়াউল হক হতে পারে কি? আব্দুর রাহমান বললো, আপাতদৃষ্টিতে এ অর্থই বেশী মিলে। পার্শ্ববর্তী একটি দেশ গত কিছুদিন যাবত অব্যাহতভাবে জিয়াউল হককে শিক্ষা দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। আর এ লক্ষ্যে তারা 'জুলফিকারকে' ব্যবহার করতে পারে। অতীতে বেশ কয়েকবার এই সন্ত্রাসী গোপন দলটি জিয়াউল হককে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

আলীঃ এটা একটা ভয়ানক আশংকা। আমাদের উচিৎ দ্রুত চীফ কমান্ডারকে এ ব্যাপারে অবহিত করা। আব্দুর রহমানও তাকিদ নিয়ে বললো, হ্যাঁ, মোটেই বিলম্ব করা ঠিক হবে না।

১৭ আগষ্ট। সন্ধে সাড়ে সাতটা। স্নিগ্ধ সমীরণ বইছে। আকাশে অসংখ্য তারা মিটি মিটি জ্বলছে। এই মাত্র একাদশী চাঁদ পূর্বাকাশে উঁকি দিয়েছে। আলী ও দরবেশ খান পাহাড়ের চূড়ায় বসে গল্প করছে। অদূরেই শত্রু চেকপোস্ট। হঠাৎ করে শত্রু নিরাপত্তা চৌকি থেকে ফাঁকা ফায়ারের শব্দ ভেসে এলো। একটু পরই দেখা গেলো, চতুর্দিক আলোকিত করে রঙ্গিন গোলার আলোর ঝলকানীতে আকাশ ছেয়ে গেছে। আলী আশংকা করছিলো, শত্রু পক্ষ হয়তো আমাদের উপর বড় ধরনের কোন আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু আলী বুঝতে পারছিলো না, হামলার আগে ওরা এমন ধুমধাম শুরু করলো কেন?

দরবেশ খান বললেন, এটা নিশ্চয়ই ওদের কোন কূটচাল, আফগান সরকারী বাহিনীর ধুমধামের সাথে আক্রমণ করার সময় এটা নয়। অবশ্যই এর মধ্যে অন্য কোন রহস্য আছে। আমাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ।

সববেত সবাই একেক ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছিলো। এরই মধ্যে আব্দুর রহমানকে আসতে দেখা গেলো। তার সাথে কয়েকজন আরব মুজাহিদ। আফগান

জিহাদে বিভিন্ন আরব দেশের বহু সংখ্যক মুজাহিদ অংশ নিয়েছে। আলীর সুনাম শুনে বহু আরব মুজাহিদ তার সান্নিধ্যে থেকে জিহাদ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। আলী তাদের জন্য ক্যাম্পের পাশেই স্বতন্ত্র একটি ঘাঁটি তৈরী করিয়ে দেয়। আরবীদের গ্রুপ কমান্ডার ছিলো মিশরী এক যুবক, নাম আবু হামেদ। ইরানী, তুর্কী, শ্রীলংকান, আরাকানী, ফিলিস্তিনী, হিন্দুস্তানী, কাশ্মীরী, ফিলিপিনী, কুর্দিসহ অন্যান্য দেশের মুজাহিদদেরও আরবদের সাথে থাকার ব্যবস্থা করেছিলো। বিদেশী মুজাহিদদের ঐ ঘাঁটিটির নাম ছিল 'ইমাম শামেল ঘাঁটি'।

গত এক মাস ধরে আব্দুর রহমান সন্ধার আগেই বাসায় চলে যেতো। সন্ধ্যার পর আব্দুর রহমানকে ফিরে আসতে দেখে আলী চিন্তান্বিত হলো।

আব্দুর রহমানও আবু হামেদসহ আগন্তুক অন্যান্য মুজাহিদ আলীর কাছে এসে নীরবে দাঁড়িয়ে গেলো। কেউ সালাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। আলী তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সবার চেহারায় গভীর উদ্বেগের ছাপ। এদের অবস্থা দেখে আলী ও সাথীরা পেরেশান হলো। উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করলো, আব্দুর রহমান, খবর কি?

আব্দুর রহমান তখনও চুপ। আলী প্রতিউত্তরে কিছু বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তার কণ্ঠে কোন কথা বেরুল না।

আবু হামেদ! কি ব্যাপার, কেউ কিছুই বলছো না কেন, বলো কি হয়েছে? আলী গভীর উৎকণ্ঠা জড়িত কণ্ঠে বললো।

আলীর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবেও কেউ কথা বললো না। তারা সবাই বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু অত্যধিক শোকাতুর হওয়ার ফলে কারো কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছিলো না।

আলী চীৎকার দিয়ে বললো, কী ব্যাপার? তোমরা কেউ কথা বলছো না কেন?

আলীর চীৎকারের পরও কারো মুখে কথা ফুটলো না। সবার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। আব্দুর রহমান আলীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। অন্যান্যরাও শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলো।

আলী ও তার সাথীরা এখনো কিছু আঁচ করতে পারেনি। আলী আব্দুর রহমানকে অনুরোধ করে বললো, ভাই আব্দুর রহমান! বলো, কি হয়েছে? শুধু একা একাই কাঁদবে না আমাদের বলবে কি হয়েছে। যুবায়দার কিছু হয়নি তো? আব্দুর রহমান ধরা গলায় অস্পষ্ট আওয়াজে বললো, না ওর কিছু হয়নি।

আলী ঃ তাহলে হয়েছেটা কি বলো!

আব্দুর রহমান ঃ শত্রুরা আমাদের সবচেয়ে বড় সুহৃদকে শহীদ করেছে।

আলী ভাবলো, রুশ বাহিনী হয়তো কোন মুজাহিদ নেতাকে খুন করেছে।

আলী জিজ্ঞেস করলোঃ রুশবাহিনী কি কোন মুজাহিদ নেতাকে শহীদ করেছে?

আব্দুর রহমান বললো ঃ হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় নেতাকেই শহীদ করেছে।

কোন সে নেতা? বলো, আলীর প্রশ্ন।

আব্দুর রহমানঃ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক-এর বিমানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। জিয়াউল হকের সাথে আরো কয়েকজন পাকিস্তানী জেনারেলও নিহত হয়েছেন। দেখতে পাচ্ছো, রুশবাহিনী জিয়ার মৃত্যুতে উল্লাস করে ফাঁকা ফায়ার ও রঙ্গিন গোলা নিক্ষেপ করছে।

খবরটি ছিলো মুজাহিদদের জন্য বজ্রাঘাতের মতো। জিয়াউল হক-এর মৃত্যুর সংবাদে সবাই মুষড়ে পড়লো। সবার চোখে অশ্রু। সবাই শোকে পাথর হয়ে গেলো। অনেক্ষণ পর্যন্ত নীরবে অশ্রুপাত করলো মুজাহিদরা। কান্নার জোয়ার কিছুটা স্তিমিত হলে আলী পাহাড় চূঁড়া থেকে নেমে নিজ কক্ষে চলে গেলো।

এক কান দু'কান হয়ে জিয়াউল হক এর মৃত্যু সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে সারা ক্যাম্পে ছড়িয়ে গেলো। মুজাহিদরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে পড়লো। এক দু' করে কিছুক্ষণের মধ্যে আলীর কক্ষের সামনে কয়েকশ মুজাহিদ সমবেত হলো। কক্ষের ভিতরে আলী, আব্দুর রহমান, দরবেশ খান, আবু হামেদ বসে আছো, সবাই নীরব। কারো মুখে কথা নেই। নীরবে কারো কারো গন্ডদ্বয় বেয়ে শুধু অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আর বাইরে তখন হাজার মুজাহিদের সমবেত হু হু ক্রন্দনরোল। কোন কোন মুজাহিদ তো উচ্চস্বরে চিৎকার করে কাঁদছে।

এমন শোকাতুর দৃশ্য হয়তো পৃথিবী কমই প্রত্যক্ষ করেছে। যে দৃঢ়চেতা সাহসী মুজাহিদরা নিজেদের মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে চোখের সামনে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করতে দেখেছে, তদুপরি তাদের মন এতোটা ভেঙ্গে পড়েনি, আজ ভিন দেশের একজন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুতে তাদের মাঝে শোকের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। জিয়াউল হকের মৃত্যুতে শেরদিল আফগান বীর মুজাহিদদের কঠিন মজবুত অন্তরগুলো দুঃখে-শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। শুধু আলীর ক্যাম্প নয়, সারা আফগানিস্তানের মুজাহিদদের মাঝে জিয়াউল হকের মৃত্যু গভীর শোকের মাতম সৃষ্টি করেছে। মুজাহিদ নেতারা আফগান জিহাদের ভবিষ্যত সাফল্যের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, তারা জানতেন, জিয়ার মৃত্যু মানে মুজাহিদদের যাবতীয় সহযোগিতার দ্বারা ব্যবস্থা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া, আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বাধাগুলো আরো প্রকট রূপে দেখা দেওয়া।

এক বৃদ্ধ মুজাহিদ আলীর কক্ষে প্রবেশ করে আলীকে সম্বোধন করে বললেন, কমান্ডার সাহেব, জিয়াউল হক সাহেবের মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা, তা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু বাইরে সাধারণ মুজাহিদদের অবস্থা খুবই করুণ। ওরা দায়িত্ব জ্ঞান ভুলে গিয়ে যেমনটা করছে, আপনাকে এ সময় তাদের মত কাতর হলে

চলবে না। ওদের সান্ত্বনা দিয়ে শামলাতে না পারলে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পাছে এই সুযোগে শত্রুরা না আবার আক্রমণ করে বসে।

ফয়েজ বাবা! আমি কিংকর্তব্য বিমুঢ়। আমি ওদের কি বলে শান্তনা দেবো। ওদের মন ভরে কাঁদতে দিন। দুঃখ যন্ত্রণা শোকেও ওরা কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলো। ওদের কাঁদতে দিন, কাঁদুক! এই বলে আলী দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ঢুকরে কেঁদে উঠলো।

"হায় আল্লাহ! জীবনে কখনও এমন দেখিনি। দশ বছর ধরে আফগানিস্তানে জিহাদ চলছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলতে দেখেছি, নিজ হাতে ছিন্ন ভিন্ন লাশের পাহাড় আপসারণ করেছি, তাদের কবর দিয়েছি। শত শত মানুষ মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখেছি। আফগানদের রক্তের বন্যা বয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু শেরদিল আফগানদের তো কখনও এভাবে কাঁদতে দেখিনি'। বৃদ্ধ মুজাহিদ ফয়েজ স্বগতোক্তি করে এ কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

চীফ কমান্ডার ওয়ারলেসে আলীকে কল করলেন। ওয়ারলেস সেটের কাছে যে মুজাহিদ বসা ছিলো সে রিসিভ করে আলীকে বললো, কমান্ডার সাহেব! চীফ কমান্ডার আপনার সাথে কথা বললেন।

আলী চীফ কমান্ডারের পয়গাম শোনার জন্য রিসিভার তুললো।

চীফ কমান্ডার বললেনঃ 'তোমার কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা যাচ্ছে, জিয়ার মৃত্যু সংবাদ তোমাদের ক্যাম্পেও পৌঁছে গেছে। এ জন্যই আমি তোমাকে ওয়ারলেস করলাম। সংবাদটা শুনে আমি এতই বিমুঢ় হয়ে পড়েছি যে, জীবনে কখনও আমি এমন শোকাতুর হয়নি। জিয়ার মৃত্যুতে আমার সকল প্লান-প্রোগ্রাম এলোমেলো হয়ে গেলো। আমার এখানেও পুরো ক্যাম্পে শোকের মাতম নেমেছে। সবাইকে ডেকে সমবেত করে ঘন্টাব্যাপী আমি তাদের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছি। তবুও এখন অনেকের মন ভারাক্রান্ত। সকল মুজাহিদক্যাম্পে একই অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান থেকে এই মাত্র খবর পেলাম, ওখানকার অবস্থাও অনুরূপ। উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। একটা প্রকট আশংকা বিরাজ করছে আশ্রয় শিবিরগুলোর নিরাপত্তার ব্যাপারে।

আমি আশা করি, তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি শামাল দিতে পারবে। হিম্মত হারালে চলবে না। ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। তুমি সাহস হারিয়ে ফেললে মুজাহিদরা বিভ্রান্ত হবে, তাতে করে দুশমনদের পরিকল্পনাই সফল হবে। ধৈর্য ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দুশমনদের যাবতীয় কূটচাল আমাদের ছিন্ন করতেই হবে। তোমার তো অবশ্যই স্মরণ আছে, ওহুদ যুদ্ধে শয়তানী চক্র যখন নবীজী (সাঃ) এর শাহাদাতের গুজব মুসলমান শিবিরে ছড়িয়ে দিলো, তখন অনেক সাহাবী বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই জিহাদের বিরতি টানার ইচ্ছে করছিলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে এ মুহূর্তটি খুবই অপসন্দনীয় হয়েছিলো।

জিয়া আমাদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু, সহযোগী ছিলেন। আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জিহাদ করছি। যে আল্লাহ জিয়াকে আমাদের সহযোগী বানিয়েছিলেন, তিনি এখনও আছেন এবং চিরদিন থাকবেন। যে আল্লাহ জিয়াকে আমাদের সুহৃদ বানিয়েছিলেন, তিনিই আবার অনুরূপ কাউকে আমাদের সহযোগী বানিয়ে দিবেন। কাজেই হতাশ হবার কিছু নেই। নিজেকে দৃঢ় করে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং ক্যাম্পের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করো। এদিকে গভীর মনোযোগ দাও, যাতে অভ্যন্তরীণ কোন বিশৃঙখলা সৃষ্টি না হয়। ক্যাম্পে কুরআন খানী শুরু করে দাও।

শুকরিয়া, অন্যান্য ক্যাম্পেও আমাকে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। আগামী কাল জিয়ার জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য আমি ইসলামাবাদ যাচ্ছি। ফিরে এসে কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।

চীফ কমান্ডারের সাথে কথা বলে আলীর মন অনেকটা হালকা ও দৃঢ় হলো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে শতশত মুজাহিদ অপেক্ষা করছিলো। আলীর মনে হলো যে, ক্যাম্পের কোথাও দ্বায়িত্বে কোন মুজাহিদ নেই। ক্যাম্প অরক্ষিত সবাই এখানে এসে গেছে। সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে আলী হাক দিলো। আলীর আওয়াজ শুনে মুজাহিদদের অনেকেই চিৎকার করে কান্না শুরু করলো। পরিস্থিতি এমনই দুঃসহ বেদনা কাতর ছিলো যে, আলী কিছুই বলতে পারছিলো না। অবস্থা বেগতিক দেখে মুহাম্মদুল ইসলাম কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিলো। কুরআনের বাণী মুজাহিদদের মধ্যে অনেকটা স্থিরতা এনে দেয়। তিলাওয়াত শেষ হলে আলী জলদগম্ভীর ভাষায় ভাষণ শুরু করলোঃ

‘প্রিয় বীর মুজাহিদ সাথীরা!

পরিস্থিতির আকস্মিকতায় আমি বাকরুদ্ধ। জানি না কোত্থেকে কথা শুরু করবো। জিয়াউল হক আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। শতাব্দীতে এমন দু’ একজন সাহসী পুরুষের জন্ম হয়। জিয়া তাঁর প্রজ্ঞা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা, সততা, ধর্মনিষ্ঠা ও সাহসিকতার দ্বারা শত বাধা প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। ফলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রাশিয়াকে আমাদের মতো সহায় সম্বলহীন মানুষেরা চরমভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হচ্ছি। কম্যুনিস্ট উত্থানের পর প্রায় শতাব্দিকালের মধ্যে আমাদের হাতেই প্রথম ওদের চরম পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে হলো।

জিয়াউল হক রুশ-ভারতের হুমকী-আক্রমণের পরোয়া না করে আমাদের সব ধরনের সাহায্য করেছেন। তিনি আমাদের শুধু সামরিক সহযোগিতাই করেননি, আন্তর্জাতিক অঙ্গণে দক্ষ কূটনৈতিক চালে রাশিয়ার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মুসলিম ও আরব বিশ্বকে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। যার ফলে সারা মুসলিম বিশ্বের সবখানেই আমাদের প্রতি সাহায্য, সহযোগিতা, সমর্থন, সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বন্ধুগণ! রাশিয়া ও নজিবুল্লার শেষ টার্গেট সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পেরেছিলাম। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি দুশমনরা ওদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সফল হবে, তা ভাবতে পারিনি।

বন্ধুগণ! আমি নির্দ্ধিধায় বলতে পারি, শহীদ জিয়াউল হকের মতো মর্দে মুমিন প্রেসিডেন্ট এ শতাব্দিতে দু' একজন জন্মেছে বইকি। জিয়া উপমহাদেশের দ্বিতীয় আওরঙ্গজেব, আফগানিস্তানের জন্য শিহাবুদ্দীন ঘোরীর প্রতীক ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মতো আশির্বাদ হয়ে এসেছিলেন। আমি আজ আপনাদের জানাচ্ছি যে, এ মর্দে মুমিন শুধু আমাদের সহযোগিতা করেই ক্ষ্যান্ত থাকেননি, স্বশরীরে বহুবার আফগানিস্তানের একাধিক অভিযানে শরীক হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

দু' বছর আগে আমি যখন খোস্ত বিজয় অভিযান নিয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলাম হঠাৎ একদিন সেখানে জিয়া উপস্থিত হয়ে আমাকে প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনা ও কৌশল নির্ধারণে অপূর্ব সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি নির্দেশনাই ছিলো ফলপ্রসূ ও বাস্তবসম্মত। হঠাৎ একদিন আমি চীফ কমান্ডারের ম্যাসেজ পেলাম। তিনি জানালেন, তোমার ওখানে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আসছেন। রাস্তায় পর্যাপ্ত পাহারার জন্য জায়গায় জায়গায় মুজাহিদ নিয়োজিত করো। পাহাড়ের উপর ক্যাম্প অফিসে তুমি ছাড়া আর কোন মুজাহিদকে থাকতে দিবে না। কেউ যেন জানতে না পারে যে, তোমার এখানে কোন বিশেষ ব্যক্তি আসছেন।

আমি ভাবলাম, হয়তো কোন মুজহিদ নেতা আসবেন! আমি সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে পাহাড়ের উপর বসে একটি দূরবীন দিয়ে আশ-পাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। অনেক দূরে দেখা গেলো, ঘোড়ায় আরোহন করে কয়েকজন লোক এদিকে আসছে। দেখতে দেখতে তারা আমাদের ক্যাম্পের চেকপোষ্ট পর্যন্ত এসে গেলো। ঘোড়া থেকে নেমে আগন্তুক সকলে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলো।

আমি পাহাড় থেকে নেমে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলাম। দূর থেকে সবাইকে আফগানী মনে হচ্ছিলো। কিন্তু আগত বিশেষ ব্যক্তি যখন আমার সাথে মুসাফাহ করলেন, বিষ্ময়াবিভূত হলাম, আরে ইনি যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক! পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শত্রুর মুখোমুখি ভয়ংকর এ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে হাজির হবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি!

জিয়া নিজ সন্তানের মতো আমার সার্বিক অবস্থার খোঁজখবর নিলেন, জিহাদে আমার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আলোচনায় আমি যখন তার কাছে জিহাদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা পেশ করলাম, তিনি খুবই প্রীত হলেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন। যাবার আগে তিনি আমাকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে বললেন, আমাকে যদি অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে না হতো

তাহলে তোমার যাবতীয় কার্যক্রম বিস্তারিত শুনতে পারতাম। দু'আ করি, আলাহ তোমাকে কামিয়াব করুন। কমান্ডার আলী! 'জীবনের কোন মুহূর্তেই হিম্মত হারাবে না। বিজয় ওই ব্যক্তির পদচুম্বন করে, যে আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয় এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে কোন প্রতিবন্ধকতার তোয়াক্কা করেনা।'

জিয়ার কথাগুলো আজো আমার কানে ঝংকৃত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দির বর্তমান মুসলিম বিশ্বে জিয়ার মতো আরো দু' চারজন প্রেসিডেন্ট থাকলে বিশ্বের মজলুম মুসলমানদের অবস্থা এতো করুণ হতো না।

এ পর্যন্ত বলে আলী বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো। তার মুখ থেকে আর কথা বেরুলো না। দু' হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললো। আবারো মুজাহিদরা উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে দিলো।'

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য এবার আব্দুর রহমান দাঁড়িয়ে বললোঃ 'বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। শক্ররা ষড়যন্ত্র করে জিয়াউল হককে হত্যা করেছে, যাতে আমাদের দুর্বল করতে পারে। তোমরা এভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে দুশমনদের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে যাবে আর আমরা বিজয়ের দ্বার প্রান্তে এসে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হবো।

দেখতে পাচ্ছো, দুশমনরা আনন্দে মেতে উঠেছে আর আমরা এখনও শোকে কেঁদে মরছি। জিয়াউল হক জীবনের চূড়ান্ত নজরানা জিহাদের পথে নিবেদন করে আপন মঞ্জিলে পৌঁছে গেছেন। জিয়ার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার দাবী হচ্ছে, জীবনবাজী রেখে কাবুল বিজয়কে ত্বরান্বিত করা। এরপর অন্যান্য মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। বন্ধুগণ! আমাদের শক্রপক্ষ খুবই দুর্বল মনোবলের অধিকারী। ওরা যোগ্যতা, সাহসের দ্বারা আমাদের সাথে না পেরে আমাদের বন্ধুকে অত্যন্ত ঘৃণ্য প্রক্রিয়ায় হত্যা করেছে। এখন আমাদের কর্তব্য হবে শহীদ জিয়াউল হকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে শক্রদের সকল দুরভিসন্ধি নস্যাত করে দেয়া।

আব্দুর রহমানের পর দরবেশ খান দাঁড়িয়ে বললেনঃ বন্ধুগণ! আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ করছিঃ প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়ার খুনের প্রতিশোধ নেয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আগামী প্রজন্ম অব্যশই আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। এ খুনের বদলা আমাদের নিতেই হবে।'

এ সময় এক মুজাহিদ দাঁড়িয়ে বললোঃ 'কমান্ডার সাহেব! দুশমনরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করে উল্লাস করছে। ওদের প্রতিটি ফাঁকা আওয়াজ আর রঙ্গিন গোলা আমাদের কলিজা বিদীর্ণ করছে। আমাদের অনুমতি দিন, আমরা দুশমনদের আজ রাতেই উল্লাসের মজা মিটিয়ে দিই। এতে করে আমাদের দুঃখ হালকা হবে। মুজাহিদের কথার সমর্থনে সমবেত মুজাহিদরা উচ্চকণ্ঠে নারায়ে তকবীর দিয়ে সারা ক্যাম্প কাঁপিয়ে তুল্লো।'

আলী বললোঃ বন্ধুরা! আমি তোমাদের দাবী সমর্থন করি, কিন্তু আমাদের ভাবতে একটু সময় দাও। আপাততঃ সবাই নিজ নিজ ছাউনীতে দায়িত্বে ফিরে যাও। আমি

তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আজ রাতে হামলা না হলেও আগামী কাল ঠিকই দেখবে দুশমনদের আমরা রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে ছাড়বো।

ক্যাম্পের সকল বিভাগীয় প্রধান, গ্রুপ কমান্ডার ও গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় মুজাহিদদের জরুরী এক সভায় ডাকা হলো। ভাবগম্ভীর পরিবেশে বৈঠক বসলো। বৈঠকে বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত হলো, আগামী কাল শত্রুপক্ষের উপর হামলা হবে এবং আশে-পাশের অন্যান্য ক্যাম্পকেও আক্রমণে শরীক হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

পরদিন সূর্যাস্তের পরপরই দু'হাজার চৌকস মুজাহিদের একটি সুদক্ষ বাহিনী তৈরী হলো। তারা শত্রু ছাউনীর তিন দিক থেকে এক সাথে আক্রমণ করলো। মাত্র একদিক শত্রুবাহিনীর পালায়নের জন্য খোলা রাখলো।

মুজাহিদরা এতো ক্ষীপ্রগতি ও অতর্কিতে হামলা করেছিলো যে, শত্রুবাহিনী হামলা মোকাবেলা করার কথা ভাবতেও পারেনি। ওরা দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করে রাত বারোটার দিকে ক্যাম্প ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। প্রহরায় যারা ছিলো ওদের পক্ষ থেকেও আসা জবাবী গোলা নিক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেলো। মুজহিদরা আরো কিছুক্ষণ গোলা নিক্ষেপ করে হামলায় বিরতি টেনে অতি সতর্কাবস্থায় সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। ছাউনীর পাশে গিয়ে আলী বললো, 'বেলা উঠার আগে কোন মুজহিদ শত্রু ছাউনীতে প্রবেশ করবে না। হয়তো শত্রুবাহিনী কোন কূটচাল চালতে পারে। 'বোকার মতো এতে ফেঁসে যাওয়া ঠিক হবে না। সকাল বেলা মুজাহিদরা যখন শত্রু ছাউনীতে প্রবেশ করলো, দেখতে পেলো, চতুর্দিকে শত্রু সৈন্যেদের রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। তবে প্রায় দু'শোর মতো শত্রু সৈন্য কংক্রীটের তৈরী ব্যাংকারে লুকিয়ে ছিলো, ওরা মুজাহিদদের দেখামাত্র হাতিয়ার ফেলে সারেন্ডার করলো।

শত্রুবাহিনীর পুতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হলো এবং শতাধিক আহত হলো।

মুজাহিদ সমর্থক ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার কয়েকজন সরকারী সেনা অফিসার নিয়ে আলীর সামনে এসে বললেন, আপনাদের পক্ষ থেকে হামলার খবর শুনে এরা অনেক কাজ করেছে।

তারা আপনাদের আক্রমণ শুরু হবার পর সরকারী বাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। রাত বারোটার সময় আমরা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আফগান অফিসার, রুশ জেনারেল ও কর্মকর্তাকে বললাম, অবস্থা বেশী ভালো দেখা যাচ্ছে না, আপনারা নিরাপদ স্থানে চলে যান, আমরা মোকাবেলায় কোন ত্রুটি করবো না। এভাবে শীর্ষ কমান্ডারদের সদর দফতর থেকে সরিয়ে দেয়ার পর অধঃস্তন রুশ অফিসাররা ভীত হয়ে পালাতে শুরু করে।

ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার আরো বললো, 'জিয়াউল হক-এর শাহাদাতের খবর পেয়ে নজিবুল্লাহ্ সরকারের সেনাবাহিনী ও রুশ সৈন্যরা আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে। রাতব্যাপী

শহরের সবখানে মদ্যপ-মাতালদের হৈ হুল্লোড়, বেলেল্লাপনা ও নাচ-গান চলে। কমিউনিস্টদের আমি ইতিপূর্বে কখনও এতো আনন্দ উৎসব করতে দেখিনি। জিয়ার মৃত্যুতে মুজাহিদ সমর্থক সিপাহী অফিসারদের চোখে ঘোর অমানিশা নেমে আসে, অনেকে রাতভর দু'আ করেছে, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় কেঁদে রাত কাটিয়েছে। আর কম্যুনিস্টরা জিয়ার মৃত্যুতে বিজয় উৎসব ও মদ মাতলামীর উন্মত্ততায় মেতে ওঠে।'

মুজাহিদদের পরিকল্পনা ছিলো সম্মুখ সমরে পলায়নরত কুচক্রী রুশ বাহিনী চক্রান্তের মাধ্যমে জিয়াকে হত্যার পর যে উল্লাসে মেতেছে এর একটা উপযুক্ত জবার দেয়া। যাতে এরা উপলব্ধি করে, মুজাহিদরা জিয়ার মৃত্যুতে শোকাতুর হলেও হীনবল ও পশ্চাদপদ হয়নি।

অনায়াসলব্ধ ক্যাম্পের পতন তাদেরকে অতিরিক্ত সাফল্য এনে দিলো, হস্তগত হলো বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। আশাতীত-বিজয়ে তাই মুজহিদরা ছিলো আনন্দিত।

এ লড়াইয়ে সামরিক অস্ত্রের পাশাপাশি মুজাহিদদের হাতে কয়েকটি হেলিকপ্টার ও অর্ধশতাধিক তেলভর্তি অয়েল ট্যাংকার ও কয়েক শ' খাদ্য-বোঝাই খাদ্য লরিও দখলে এলো।

রাতের অপারেশনে মুজাহিদরা ছিলো ক্লান্ত। আলী কয়েকজনকে পাহারার দায়িত্ব দিয়ে বাকীদের বিশ্রাম করার নির্দেশ দিলো। ক্লান্ত হলেও আশাতীত সাফল্যে মুজাহিদরা ছিলো উজ্জীবিত। অনেকেই সাগ্রহে ঘুরে ফিরে দেখছিলো রুশ বাহিনীর তৈরী বিশাল বিশাল অস্ত্রাগার ও সামরিক সরঞ্জামাদি। আর অনেকেই ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দিয়েছিলো উন্মুক্ত ময়দানে সুবিধা মতো জায়গায়।

তখন বেলা এগারোটা। হঠাৎ করে ডজনখানিক বোমারু বিমান মুজাহিদদের উপর বোম্বিং শুরু করলো। বোম্বিং তো নয় যেন বোমা বৃষ্টি। সকাল এগারোটা থেকে রাখ পর্যন্ত শত্রু বাহিনী বিরতিহীনভাবে বোম্বিং করলো। অপ্রস্তুত মুজাহিদরা ভয়াবহতার আকস্মিকতায় আত্মরক্ষা না মোকাবেলা করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না। তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে রুশ বাহিনীর পরিত্যাক্ত বাংকারগুলো নিরাপদ ছিলোনা। যার ফলে তাদের পরিস্থিতি মোকাবেলা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বোমা-বৃষ্টির মধ্যেই-বিমান বিধ্বংসী কামান দাগিয়ে হামলা মোকাবেলার চেষ্টা হচ্ছিলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত মুজাহিদরা পাঁচটি বিমান ভূপাতিত করে।

রুশ বাহিনী ওদের পরিত্যাক্ত ছাউনী ছাড়াও আশপাশের গ্রামগুলোতে অগণিত বোমা নিক্ষেপ করে তছনছ করে দেয়ায় নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে নিরাপদ বেসামরিক মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হলো। নিহত হলো সহস্রাধিক নারী, শিশু ও বয়স্ক লোক। ধ্বংসের ব্যাপকতার তুলনায় মুজাহিদদের ক্ষয়ক্ষতি ছিলো কম। তদুপরি শতাধিক মুজাহিদ শহীদ ও শ'ছয়ের মতো আহত হলো। তখন হঠাৎ করে একটি বোমার খন্ডাংশ এসে আলীর গায়ে পড়লো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলো আলী।

সন্ধ্যার পর শত্রু বাহিনীর বোম্বিং ক্ষ্যান্ত হলো বটে, কিন্তু চতুর্দিকে আহত ও স্বজনহারা মানুষের আর্তচীৎকারে কেয়ামত নেমে এলো।

অঝোরধারায় রক্তপাতের কারণে আলীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে লাগলো। শত্রু ছাউনী অপরিকল্পিতভাবে দখলে নেয়ার জন্যে আলীর মনে প্রথম দিকে অনুশোচনা জেগেছিলো। এই অনুশোচনা নিজে আহত হওয়ার ফলে নয়, যন্ত্রণাটা ছিলো বিপুল পরিমাণ নিরপরাধ মানুষের জানমালের ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে। জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি রোধের জন্যে আলী দ্রুত শত্রুক্যাম্প ছেড়ে মুজাহিদ ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলো। বললো, তোমরা দুশমনদের সকল বাংকার ও ক্যাম্প ধ্বংস করে দিয়ে রাতারাতি ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নাও।

আহত আলীকে ক্যাম্পে পৌঁছানোর পথে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে বেঁহুশ হয়ে গেলো। মুজাহিদ ডাক্তারগণ প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে তারা আলীর চেতনা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। টানা দু'দিন আলী বেহুঁশ অবস্থায় কেটে যাওয়ায় ডাক্তাররাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। জিয়ার শাহাদাতের পর আলীর অসুস্থতা এবং দু'দিনের মধ্যে চেতনা ফিরে না পাওয়ায় মুজাহিদদের মধ্যে হতাশার আঁধার নেমে আসে। আহত মুজাহিদরাও নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আলীর জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের জীবনের পরিবর্তে আলীকে সুস্থ করে দেয়ার জন্যে অহর্ণিশি আল্লাহ্‌র দরবারে কাকুতি-মিনতি করে মোনাজাত করছে। ক্যাম্পের সকল মুজাহিদ আলীর জন্যে দু'আ করছে। জুবায়দা আলীর অসুস্থতায় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। রাতভর সে আলীর সুস্থতার জন্যে জায়নামাযে দু'আয় মগ্ন থাকে। আলীর অকৃত্রিম বন্ধু আবদুর রহমানের সামনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার।

আলীর অসুস্থতাজনিত কারণে অথবা যে কোনভাবে আলী দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে আবদুর রহমান সে দায়িত্ব পালন করবে তা আগেই নির্ধারিত ছিলো। তিন দিন যাবত আবদুর রহমান কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছে।

কমান্ডার আবদুর রহমান আলীর শয্যা-পাশে উপবিষ্ট। কাছেই বসা মুহাম্মাদুল ইসলাম, দরবেশখান, আবু হামেদ, ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার। সবার হৃদয় ও মুখে একই অভিব্যক্তি, একই কামনা, 'হে আল্লাহ, আলীকে সুস্থ করে দাও!'

আলীর চেতনা হারানোর চতুর্থ দিন। এমন সময় চীফ কমান্ডার ও খলীল একই সাথে আলীর কক্ষে প্রবেশ করে।

আলীর আহত হওয়ার খবর শুনে চীফ কমান্ডার দ্রুত আলীর অবস্থা দেখার জন্যে ছুটে আসেন। খলীল আলীর জন্যে সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছিলো, কিন্তু আলীর আহত হওয়া ও চার দিন যাবত চেতনাহীনতার খবর শুনে সুসংবাদের কথা খলীল ভুলে গেলো। তার দু'চোখ গড়িয়ে পড়তে লাগলো শোকাশ্রু। চীফ কমান্ডার তার অনুমতি ছাড়া শত্রু ছাউনী দখলের ঝুকিপূর্ণ হামলার জন্যে রাগান্বিত ছিলেন, কিন্তু এখানে এসে পরিস্থিতি ও আলীর অবস্থা দেখে তিনি নিজের ক্ষোভ চেপে রেখে উদ্বেগাকুল মুজাহিদদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। চেয়ে দেখো আমাদের চেয়ে দুশমনদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশী। জিহাদের ময়দানে এমন দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। ময়দানে শত্রুদের কোমর ভেঙ্গে গেছে, এরা আর প্রাদেশিক কর্তৃত্বে ফিরে আসতে পারবে না। এই অভিযানের ফলে আমাদের কাবুল আক্রমণের পথ প্রশস্ত হলো। অচিরেই দেখবে, আমরা কাবুল দখল করে দুশমনদের চিরতরে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবো–ইনশাআল্লাহ।'

পঞ্চম দিন আলী আস্তে আস্তে চোখ মেললো। আলীর পাশে সমবেত মুজাহিদদের অন্তর খুশীতে ভরে উঠলো। আলী পাশে বসা চীফ কমান্ডারকে দেখে খুব ক্ষীণস্বরে বললো, 'মাননীয় কমান্ডার সাহেব, আমি খুব লজ্জিত! আমার জন্যে মুজাহিদদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেলো।'

চীফ কমান্ডার বললেন, 'বেটা আলী! আমি তো তোমাকে অবিস্মরণীয় বিজয়ের মোবারকবাদ জানাতে এসেছি। তোমার এই অভিযানে কাবুল কমিউনিস্ট সরকারের কোমর ভেঙ্গে গেছে। বিজয় সাফল্যের তুলনায় মুজাহিদদের ক্ষয়ক্ষতি বেশী নয়। এখন ওসব কথা থাক। আগে তোমার শরীর সুস্থ হোক।'

অদূরে দাঁড়ানো খলীল আলীকে কথা বলতে দেখে আলীর কাছে অগ্রসর হয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করল, 'ভাইজান, শরীরটা এখন কেমন লাগছে?

'তুমি কখন এলে খলীল! তুমি এসেছো খুব ভালো হয়েছে। তোমাদের দেখার জন্যে আমার মনটা ছটফট করছিলো।' এ কথাটি শেষ করতে না করতেই আবার আলী অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

ঘন্টাখানিক পর আলী আবার চোখ খুললো। অন্যান্য মুজাহিদদেরকে হাতের ইশারায় বাইরে যেতে বললো।

চীফ কমান্ডার, আবদুর রহমান ও খলীল ছাড়া সবাই কক্ষের বাইরে চলে গেলো।

আলী খলীলের হাতটি টেনে নিজের হাতে নিয়ে বললো, 'খলীল, তোমরা কেমন আছো, তাহেরা ও আম্মী কেমন আছে?'

খলীল ঃ ভাইজান! আমি আপনার জন্যে সুসংবাদ নিয়ে এসেছি।

আলী ঃ কি সুসংবাদ?

খলীল ঃ আমি চাচা হয়েছি। ভাবীর একটি সুন্দর ছেলে জন্ম নিয়েছে।

আলী ঃ আল-হামদুলিল্লাহ্ কবে তুমি চাচা হলে? কি নাম রেখেছো তোমার ভাতিজার?

খলীল ঃ হাসান মুহাম্মদ।

আলী ঃ সুন্দর নাম রেখেছো। ফিরে গিয়ে তাহেরাকে আমার মোবারকবাদ ও আম্মীকে আমার সালাম জানিও। চীফ কমান্ডার ও আবদুর রহমান পুত্রসন্তান লাভে আলীকে মোবারকবাদ জানালেন।

এ সময়ে আলীর দু'চোখ বন্ধ হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুলে চীফ কমান্ডারকে ইঙ্গিতে কাছে আসার অনুরোধ করলো।

চীফ কমান্ডার ঝুঁকে আলীর মুখের কাছে মাথা এনে তার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ আলী!

কমান্ডার সাহেব! আপনি শুরু থেকেই আমাকে আপন সন্তানের মত আদর-স্নেহ দিয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে আমি কি দিয়ে যে আপনাকে শুকরিয়া জানাবো জানি না।' বললো আলী।

'বেটা আলী! ধৈর্য হারিও না! আগে তোমার অসুখ ভালো হোক। সব মুজাহিদ তোমার অসুস্থতায় কাতর। তোমার সুস্থতার জন্যে সবাই দু'আ করছে।'

কমান্ডার সাহেব! আমার শেষ মঞ্জিল খুব কাছে এসে গেছে, যে মঞ্জিলের জন্যে আমি অনেকদিন থেকে আশান্বিত হয়ে আছি। আমি দুনিয়ায় আপনাদের মতো মূল্যবান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে ক'বছর কাটাতে পেরেছি বলে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করছি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার অবর্তমানে একমাত্র ছোট্ট ভাই খলীল, বন্ধু আবদুর রহমান, জুবায়দা ও তাহেরা যেন আমার শূন্যতায় কষ্ট না পায়, এদিকে আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। এদের মান-ইজ্জতের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।' এরপর চীফ কমান্ডারকে সামরিক বিষয়ক কয়েকটি গোপন তথ্য জানিয়ে মুহূর্তের জন্যে আলী নিরব হয়ে গেলো!

খানিক্ষণ পর আবদুর রহমানকে বললো, 'বন্ধু! তোমার বোনের কাছে গেলে তাকে আমার পক্ষ থেকে মোবারকবাদ দিও। ওর প্রতি খেয়াল রেখো আর বলো, সে যেনো হাসানকে একজন নিষ্ঠাবান মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে জীবন দিয়ে চেষ্টা করে।'

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাহেরাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি। তবে এতটুকু সান্ত্বনা পাচ্ছি এই বলে যে, ওর কোল জুড়ে 'হাসান' নামের যে সন্তান এসেছে ওকে বুকে নিয়ে সে দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারবে।'

একটু থেমে খলীলের প্রতি ইশারা করে তাকে আরো কাছে আসতে বললো। খলীল বিষন্ন মনে আলীর মাথার কাছে ঝুঁকে বসলো। আলীর কথা পূর্ব থেকেই অস্পষ্ট হয়ে আসছিলো। এখন অস্পষ্টতা আরো বেড়ে গেলো। আওয়াজ খুব ক্ষীণ হয়ে পড়লো।

খলীল কথা বোঝার জন্যে কানের কাছে মাথা নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। আলী খুব কষ্ট করে ক্ষীণ আওয়াজে খলীলের হাতটি বুকে নিয়ে বললো, 'ভাইয়া! তুমি জিহাদে শরীক হওয়ার জন্যে খুব আগ্রহী ছিলে। আমি তোমার উপকারার্থে আগে অনুমতি দেইনি। এখন আমার সময় শেষ। আমার পরে তুমি সক্রিয়ভাবে জিহাদে যোগদান করবে। আমি একান্তভাবে কামনা করি, সব সময়ের জন্য আমার বংশের কেউ না কেউ জিহাদের ময়দানে সক্রিয় থাকুক।'

মনে রেখো ভাইয়া! জিহাদের ময়দানে খুব কঠিন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কখনও হিম্মত হারাবে না, পরম ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবে, দেখবে সাফল্য সব সময়ই তোমার পদচুম্বন করবে।

ছোট্ট ভাই! তোমার ভাবীর প্রতি সুনজর রেখো। আর আবদুর রহমানকে আপন বড় ভাই মনে করে তার নির্দেশ মতো চলবে।'

অনেক কষ্টে কথা কয়টি বলে আলী চোখ মুদলো। পাশে বসা সবাই মনে করছিলো, আবার হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ছে আলী। শরীরটা একটু কেঁপে ঝাকুনি দিলো। নীরব নিঃসাড় হয়ে গেলো তার শরীর। কিছুক্ষণ পর আলীর ঠোঁট কাঁপিয়ে উঠলো। খুব বিধ্বস্ত আওয়াজে আলীর মুখ থেকে শোনা গেলো, 'হে আল্লাহ্! আপনি মুজাহিদদের বিজয় দিন, সাহায্য করুন! আল্লাহু .... আকবর. .... .লা ....ইলাহা .... ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

একটা অপার্থিব নীরব নিস্তব্ধতায় ভরে গেল আলীর কক্ষ। উপস্থিত সবাই যেনো হারিয়ে ফেললো বাহ্যিক চেতনা। একটা অলৌকিক মোহমায়া তাদের আবীষ্ট করে ফেললো। মনোমুগ্ধকর মিষ্টি সৌরভে ভরে গেল কক্ষটি। কিছুক্ষণ মোহাবিষ্ট সময় কাটানোর পর কক্ষে অবস্থানকারী চীফ কমান্ডার ও আবদুর রহমান পরস্পর জিজ্ঞাসু নেত্রে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ততক্ষণে কক্ষের ভিতরের বিস্ময়কর সৌরভ-সুবাস ছড়িয়ে পড়লো কক্ষের বাইরে। কক্ষের বাইরে অপেক্ষমান মুজাহিদরা পরস্পর জিজ্ঞেস করছিলো, এ আশ্চর্য সুঘ্রাণ কোত্থেকে আসছে! এ গন্ধ তো দুনিয়ার কোন সুগন্ধির মতো মনে হয় না। এক মুজাহিদ বললো, আমরা বংশপরম্পরায় সুগন্ধি ব্যবসায়ী, পৃথিবীর সব সুগন্ধি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, কিন্তু এমন গন্ধ কখনও শুঁকিনি। আমি নিশ্চিত, এ ঘ্রাণ অপার্থিব।

যে ডাক্তার আলীর চিকিৎসা করছিলেন, তিনি আলীর হাত ধরে পাল্‌স দেখছিলেন। ডাক্তার হাত ছেড়ে দিলেন। বিমর্ষ হয়ে গেলো ডাক্তারের চেহারা। দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরলেন ডাক্তার। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো দর দর করে।

অবস্থা অনুমান করতে পেরে খলীল ও আবদুর রহমানের বুক ভেঙ্গে কান্না বেড়িয়ে আসলো। চীফ কমান্ডার নিজের দুঃখবোধ অনেক কষ্টে চেপে রেখে আবদুর রহমান ও খলীলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বললেন, 'প্রিয় মুজাহিদ বন্ধুরা! তোমরা কেঁদো না,

দেখছো না শহীদদের আত্মা আর অসংখ্য জান্নাতী ফেরেশ্‌তা শহীদ আলীর আত্মাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। ওরা জান্নাতী খুশবু ছড়িয়ে সারা পৃথিবী গুলজার করে আলীর আত্মাকে মহাসমারোহে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এ সময়ে না কেঁদে খুশী মনে আলীকে বিদায় দাও এবং তার অনুসৃত পথে চলার শপথ নাও।'

আলীর শাহাদাতের খবর যখনই কক্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো-দফতর থেকে ক্যাম্প ছাউনি সর্বত্র আহাজারী, কান্নার রোল পড়ে গেলো। যে কান্না শোক থামানোর জন্যে আলী শত্রুক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, আলীর মৃত্যুতে মুজাহিদদের সেই শোক যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পেলো।

কমান্ডার আলীর শাহাদাতে আবদুর রহমান আলীর স্থলাভিষিক্ত হলো। খলীলকে নিযুক্ত করা হলো গোয়েন্দা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে। তাহেরা আলীর বিরহ-ব্যথাতুর মনে শপথ নিলো, হাসানকে তাঁর পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তোলতেই হবে। যুবায়দা ও তাহেরা মহিলা ফ্রন্টে কাজ করতে লাগলো।

আলীর শাহাদাত আফগান জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। যে সূচনার ভিত্তি আলীর মতো দক্ষ ও সাহসী মুজাহিদরাই।

— সমাপ্ত —

মরণজয়ী মুজাহিদ

মল্লিক আহমদ সরওয়ার

প্রকাশক
মুফতী আবদুল হাই
চেয়ারম্যান, জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স
তালতলা, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৯৭
অষ্টম প্রকাশ
জুলাই-২০০৩

কম্পিউটার মেকআপ
কে, এম হারুনূর রশীদ
মোস্তফা কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
কালার সিটি

গ্রাফিক্স
কালার গ্রাফিক

মূল্য ঃ একশত টাকা মাত্র

MARANJOY MUZAHID : BY MALLIK AHMAD SARWAR. PUBLISHED BY MUFTI ABDUL HAI, CHAIRMAN JAGO MUZAHID PUBLICATION, KHILGAON, DHAKA. 1ST EDITION : NOVEMBER 1997, EIGHT EDITION : JULY 2003

PRICE : TAKA 100.00 ONLY

জাগো মুজাহিদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা